

বাংলা একাডেমি  
দান্ত্যাদীশের  
মোক্ষে অঞ্চলি  
গ্রন্থমালা

# শরীয়তপুর







বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

শরীয়তপুর

প্রধান সম্পাদক  
শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক  
মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক  
আমিনুর রহমান সুলতান



বাংলা একাডেমি ঢাকা



প্রধান সমন্বয়কারী  
তপন বাগচী

সংগ্রাহক  
রীনা রানী দাস  
আবুল বাশার  
নজরুল ইসলাম পলাশ

বাংলা একাডেমি  
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা  
শরীয়তপুর

প্রথম প্রকাশ  
পৌষ ১৪২০/ ডিসেম্বর ২০১৩

বাএ ৫৩১৬

প্রকাশক  
মো. আলতাফ হোসেন  
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি  
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক  
সমীর কুমার সরকার  
ব্যবস্থাপক  
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ  
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য  
দুইশত পঁচাশ টাকা

---

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : SHARIATPUR (Present State of Folklore in Shariatpur District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication: *Lokojo Sonskriritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published: December 2013. Price: Tk. 275.00 only. US\$: 10.00

**ISBN-984-07-5325-8**

## প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জনপ্রিয় থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপূর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল লোকসাহিত্য সংকলন। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধরণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা প্রণয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডাভেস, ফিল্যাভস্ট নরডিক ইনসিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহাশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনসিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্রাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনসিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিল্যাভের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক যষ্টারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম লোকসাহিত্য সংকলন পরিবর্তন করে ফোকলোর সংকলন নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে

কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্ৰহ, সংৰক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্ৰন্থাদি প্ৰকাশিত হয়েছে তাৰ একটি দ্বিভাষিক গ্ৰন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংৰেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰা হয়। এছাড়া মৈয়েমনসিংহ গীতিকা যেহেতু আমাদেৱ ফোকলোৱ গবেষণাৰ ক্ষেত্রে একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দ্ৰীয়া অঞ্চল প্ৰকাশ কৰা হয়। এৰ লক্ষ্য ছিল মৈয়েমনসিংহ গীতিকা-ৰ পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ-ধৰনেৰ বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজেৰ মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোৱেৰ সামগ্ৰিক চিত্ৰ পৰিশৃৃষ্ট হয়নি। সে-কাজ কৰাৰ মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আৰ্থিক সঙ্গতি এবং প্ৰশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁৰা ছিলেন তাৰা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পৰিশ্ৰমেৰ সঙ্গে কাজ কৰাৰ ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সৰ্বসাম্প্ৰতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাৎক্ষিক বিষয়ে তালো ধাৰণা না থাকায় বাংলাদেশেৰ ফোকলোৱেৰ সামগ্ৰিক চিত্ৰ যথাযথভাৱে উদ্ঘাটিত হয়নি। প্ৰসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছৰ আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্ৰন্থমালা-এৰ অধীনে ফোকলোৱ অংশ ইংৰেজি ও বাংলা ভাষায় প্ৰকাশ কৰা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশেৰ ফোকলোৱেৰ ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেৰ ধৰন এবং উপাদানসমূহেৰ প্ৰবহমানতাৰ ফলে নিয়ত যে পৱিত্ৰত্ব ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপৰ্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালক (empirical) গবেষণার পৰিচয় খুব একটা লক্ষ্য কৰা যায় না।

ফোকলোৱ সমাজ পৱিত্ৰনেৰ (social change) সঙ্গে সঙ্গে পৱিত্ৰিত, বিবৰ্তিত ও রূপান্তৰিত হয়। কেনো কোনো উপাদানেৰ কাৰ্য্যকাৱিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোৱ হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোৱ উপাদানেৰ সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পৱিত্ৰনেৰ সঙ্গে তাৰ কী ধৰনেৰ রূপান্তৰ ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা কৰা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোৱ গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোৱেৰ সামাজিক উপযোগিতার একটি প্ৰধান দিক হলো এৰ পৱিত্ৰেশনা (performance)। ফোকলোৱ হিসেবে চিহ্নিত হওয়াৰ জন্য সমাজে এৰ পাৰফৱৰমেন্স থাকা চাই। ফোকলোৱবিদ্যাৰ এ-কালেৰ প্ৰথ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্ৰফেসৱ রজাৱ ডি আব্ৰাহামস (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, “Folklore is folklore only when performed”. অৰ্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোৱ উপাদানেৰ এখন আৱ পৱিত্ৰেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কাৰ্য্যকাৱিতা (social function and utility) নেই তা আৱ ফোকলোৱ নয়।

ফোকলোৱ চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্ৰ গ্ৰন্থসমূহেৰ মধ্যে শিল্পিত সংযোগেৰ (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বৰ্তমান যুগ সংযোগেৰ (age of communication) যুগ ! দেশেৰ বিভিন্ন

হানে স্থানীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্ব ও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জনপ্রান্তের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি জনপ্রেরো তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমষ্ট্যকারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের ত্বক্য পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুশ্ল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

### লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাদান সংগ্রহ ও পাত্রসমূহ প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

**স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই  
কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।**

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমষ্ট্যকারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

**কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্য যা করতে হবে**

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থপাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাদান সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যবারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাদান অবশ্যই মৌলিক ও বিশৃঙ্খল হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালীন প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরহ আধিকারিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় ঢাকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্বৃত্তি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

**ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।
২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুরুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংকৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছন্দ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংকৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

**খ. লোকজ সংকৃতির তথ্য-উপাদন সম্পর্কিত**

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
  - ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
২. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গন্ডীরাগান, সারিগান, বাটুলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

### ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

**প্রত্নতিপর্ব :** ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা।

- ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
- খ. ডেক্স-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
- গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
- ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
- ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
- চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডফ্লে অকুস্থলে পৌছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
- ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

- জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্দেশ্য, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ।
- ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজুয়াল নেবেন ।
১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ ।
  ২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন ।
  ৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন ।
  ৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন ।
  ৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন ।
- ঝ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুজ্জিতভাবে নেবেন । প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন । গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে । ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন । গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন ।
- ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কর্ম । তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে । এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে “From the perspective of living community and to be specific, functionally”, ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রামের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উত্তাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active

tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্রেন্সিভ এখনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ-ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্যের তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমষ্টয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

- ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমষ্টয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।
- ড. প্রত্যেক সদস্য যজ্ঞপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।
- ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমষ্টয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাস্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরস্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমষ্টয়কারী এবং সংগ্রহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) হ্রাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্তলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুর্জ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানন্দারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কর্তৃবাজারের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমষ্টয়ক ও সংগ্রহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমষ্টয়ক

ও সংগ্রাহকেরা । ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমস্যক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন । এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সময়স্থানীয় ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয় ।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

## লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি নির্দেশিকা

**সংজ্ঞা :** Folklore : Artistic communication in small groups— Dan-Ben-Amos

**ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় :** Folklore is folklore only when performed— Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয় । জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইয়ালি, নাগারচিত, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারীপুরুষের হার ॥ তরঙ্গ ও প্রবাণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাষ্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতাযাত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, ধেয়া, গুরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুকুরিণী, মেলা, ওরশ, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চতীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি । (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন ।

**জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস :** ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন । গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়) । সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিছু, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, ঝুপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিৎ (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেছলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোণা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন

(বহু জেলা), আলকাপগান, গট্টীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাক্ষণবাড়িয়া), মুশিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (বিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুসিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকন্ত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাঙ্গো, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা), ঘণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাক্ষণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিছা (নেত্রকোণা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাক্ষণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মহুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোণা), মানিক পির (সাতক্ষীরা), ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুরুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহাযুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বটমেলা (মহিষাবান, বঙগড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বঙগড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাওরা, যশোর), নকশিপিঠা (যয়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌক্ষিগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শীখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোণা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুসিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শীখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অন্তর্স্থ সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফলী বড়ুয়া, রমেশ শীল (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবাব, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবেরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আগ্নেয়গিরি রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোণা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

**লোকসাহিত্য :** মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণি (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাসাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোণা), হানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (বিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাঙ্গারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

**করণক্রিয়া (folk ritual) :** মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুনিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

**লোকক্রিড়া :** কানামাছি, দাঢ়িয়াবান্দা, গোল্লাচুট, হাড়ডু, বউছি, মৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘূড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

**লোকচিত্রকলা :** গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলাং, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢ.বি.), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোণা)।

**শোভাযাত্রা :** সিন্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

**লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি :** বিভিন্ন জেলা।

**লোকজ খেলনা :** বিভিন্ন জেলা।

**লোকচিকিৎসা :** ওবা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

**গৃহসাধনা/তত্ত্বাধনা/ (mystic cult) :** দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

**মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ :** যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

**৩. উপাদানের বিন্যাস :** একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

**৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)**

**৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)**

**৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

**মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :**

১. লোকসাহিত্য, কিছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছন্দে)।
২. ধার্মা, প্রবাদ, প্রবচন ও শলুক।
৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি,

পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবেরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিকিৎসালা (লক্ষ্মীর সরা, শবের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংক্ষার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচারের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরশ, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটলা, চাঁপিমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তত্ত্ব ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চাঁপিশা, অঙ্গোষ্ঠিক্রিয়া।

### মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় ধাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমস্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

### প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঘ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, গ্র. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

### বিভায় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকাঙ্গ/কাহিনি/কিস্মা (folk tale), রূপকথা/উপকথা খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোকবিভাতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুরুসাহিত্য ও পুরি পাঠ।

### তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশশিকা, হাতপাথা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

### চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

### পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ইদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী ম্মান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরশ ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুণ্ডবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অনুপ্রাণন, ১৬. খন্দা বা মুসলমানি, ১৭. সাধকঙ্কণ, ১৮. সিমঙ্গোল্লাসন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শজ্জধবনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুম্মাতের শির্নি, ২৫. ছড়ি (ঘটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বঙ্গুদের উৎসব।

**ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)**

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

**সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)**

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাতড়ু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাঁগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাঢ়িয়াবাঙ্গা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

**অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)**

১. মিঞ্চি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

**নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)**

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

**দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)**

**একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)**

**যাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য**

১. পিঠা, শিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

**অয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংক্ষার (folk superstition)**

**চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)**

১. মাছ ধরার উইন্য/বাইর/জাথা/চাঁই/যুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমস্যকারীরা মিলিতভাবে তাঁদের সংকলন কাজ শেষ করে পাঞ্জুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমস্য সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমস্যকারীদের কাছ থেকে সময়মতো

পাঞ্জলিপি আদায় করার জন্য তাঁকে যে নিষ্ঠা, অভিনববেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাঁর জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমূহ ৬৪-খানি পাঞ্জলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতেপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুজ্জ্বালায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পূর্ণ করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান প্রচাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমূহ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। ‘লোকসাহিত্য’ বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান শরীয়তপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে শরীয়তপুরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre-ভিত্তিক সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান ধান  
মহাপরিচালক

## সূচিপত্র

### জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

২৩-৯০

- ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা ২৩
- খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৭
- গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৮
- ঘ. জনবসতির পরিচয় ৩০
- ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল ৩০
- চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩২
- ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ৩৪
- জ. গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও স্থানের পরিচয় ৪০
- ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি ৫৯
- ঞ. মুক্তিযুদ্ধ ৭৩
- ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭৭

### লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

৯১-১১৪

- ক. লোকগল্প/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা ৯১
- খ. কিংবদন্তি ৯৪
- গ. লোকছড়া ১০০
- ঘ. ভাটকবিতা ১০৬

### বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

১১৫-১৩৮

#### লোকশিল্প

- ১. মৃৎশিল্প ১১৫
- ২. কামারের কাজ ১১৯
- ৩. নকশা ও আলমনা ১২১
- ৪. দারুশিল্প ১২২
- ৫. নকশিকাঁথা ১২৩
- ৬. কারু-শিল্প ১২৩
- ৭. নৌশিল্প ১২৭
- ৮. কাঁসা-পিতল শিল্প ১৩০
- ৯. বর্ণশিল্প ১৩৫

### লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments)

১৩৯-১৪০

<b>লোকসংগীত (Folk song)</b>	<b>১৪১-২১৮</b>
১. মুর্শিদি গান ১৪১	
২. জারিগান ১৪৮	
৩. কীর্তন ১৬৭	
৪. সারিগান ১৬৯	
৫. মারফতি গান ১৭৮	
৬. ভাটিয়ালি ১৮৪	
৭. মেয়েলি গীত ১৮৪	
৮. বিয়ের গীত ১৯০	
৯. পল্লিগীতি ২০৭	
<b>লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments)</b>	<b>২১৫-২১৬</b>
১. করতাল ২১৫	
২. মণ্ডিরা ২১৫	
৩. মৃদঙ্গ ২১৫	
৪. কাসর ২১৫	
৫. একতারা ২১৬	
৬. আড়বাঁশি ২১৬	
৭. ঢোল ২১৬	
৮. নাল ২১৬	
৯. ঢাক ২১৬	
১০. খমক ২১৬	
<b>লোকউৎসব (folk festival)</b>	<b>২১৭-২২০</b>
১. বৈশাখী উৎসব ২১৭	
২. নবাহ্ন ২১৭	
৩. পৌষ সংক্রান্তি ২১৭	
৪. চৈত্র সংক্রান্তি ২১৭	
৫. হালখাতা ২১৮	
৬. সৈদ উৎসব ২১৮	
৭. ওরশ ২১৮	
<b>লোকাচার (ritual)</b>	<b>২২১-২২৫</b>
১. হালখাতা ২২১	
২. সাধভক্ষণ ২২১	
৩. করণক্রিয়া ২২২	
৪. মিলাদ ২২২	

৫. অশ্বীচ ২২৩	
৬. ত্রত-পার্বণ ২২৩	
৭. মনসা পূজা ২২৩	
৮. অনাথের মেলা ২২৫	
<b>লোকমেলা (folkfair)</b>	<b>২২৬-২২৯</b>
১. বৈশাখী মেলা ২২৬	
২. দিগম্বরী মেলা ২২৭	
৩. সুরেশ্বরী মেলা ২২৮	
৪. দশোহরা মেলা ২২৮	
৫. রামঠাকুরের মেলা ২২৯	
<b>লোকখাদ্য (folk food)</b>	<b>২৩০-২৩৪</b>
১. কাজির ভাত ২৩০	
২. পিঠা ২৩০	
৩. নাড়ু ২৩০	
৪. মোয়া ২৩১	
৫. খেজুর গুড় ২৩১	
৬. মিষ্টি-শিশি ২৩২	
<b>লোকনাট্য (folk theatre)</b>	<b>২৩৫-২৬৪</b>
১. আমান-দুলালের পালা ২৩৬	
<b>লোকক্রীড়া (folk games)</b>	<b>২৬৫-২৭০</b>
১. হা-ডু-ডু ২৬৫	
২. লাঠিখেলা ২৬৫	
৩. বৌছি/বউছি ২৬৫	
৪. পাঁচ কইঝা (পাঁচগুটি) ২৬৬	
৫. একা দোকা ২৬৭	
৬. কানা-মাছি ২৬৭	
৭. গুলিখেলা ২৬৭	
৮. লাটিম খেলা ২৬৮	
৯. পুতুল খেলা ২৬৮	
১০. ঘুড়ি ওড়ানো ২৬৮	
১১. শান্তালতা খেলা ২৬৮	
১২. ইচিং বিচিং ২৬৯	
১৪. চোর পুলিশ ২৬৯	

১৫. পলাঞ্চি ২৭০	
১৬. ঘামবিচি খোটা'র খেলা ২৭০	
<b>লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)</b>	<b>২৭১-২৮২</b>
১. তাঁতি ২৭১	
২. নরসুন্দর ২৭৩	
৩. পাদুকাসুন্দর/মুচি ২৭৫	
৪. খেয়াসুন্দর/পাটলী ২৭৬	
৫. অঙ্গনসুন্দর/ঝাড়ুদার ২৭৮	
৬. পুরোহিত ২৭৯	
৭. সভাসুন্দর/ধোপা ২৮০	
<b>লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তজ্জমন্ত্র (chant)</b>	<b>২৮৩-২৮৬</b>
<b>ধাঁধা (riddle)</b>	<b>২৮৭-২৯২</b>
<b>প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings &amp; proverb)</b>	<b>২৯০-৩০০</b>
<b>লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংক্ষার (folk superstition)</b>	<b>৩০১-৩০২</b>
<b>লোকপ্রযুক্তি (folk technology)</b>	<b>৩০৩-৩২৬</b>
১. কৃষি প্রযুক্তি ৩০৩	
২. পাটজাত প্রযুক্তি ৩০৮	
<b>লোকভাষা (Folk Language)</b>	<b>৩২৭-৩৪২</b>

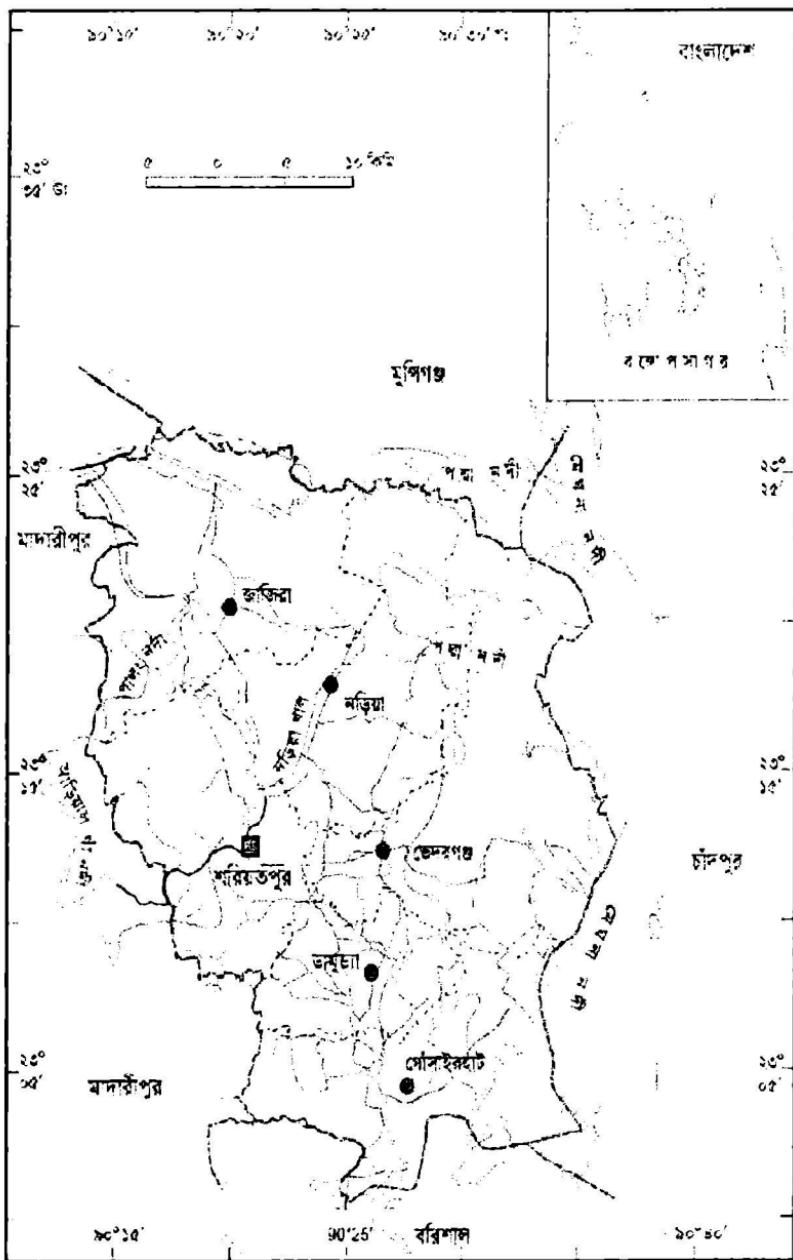
## জেলা পরিচিতি

### ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

বিক্রমপুর পরগনার দক্ষিণাঞ্চল এবং চন্দ্রদীপ রাজ্যের উত্তরাঞ্চল ইদিলপুর পরগনার অংশবিশেষ নিয়ে আজকের শরীয়তপুর জেলা গঠিত। এর ৬টি থানা ছিল ফরিদপুর জেলাকে আঞ্চলিক উচ্চারণে ‘ফইরাদপুর’ বা ‘ফরিয়াদপুর’ বলা হয়। বিচার পাওয়া ও খাজনা দেয়ার স্থান অর্থাৎ ফরিয়াদ জানানোর স্থান বলে ‘ফরিদপুর’ শব্দটি সৃষ্টি হতে পারে। ‘ভারতকোষ’-এ বলা হয়েছে যে ফরিদ খাঁ নামক এক ফকিরের নামানুসারে এই স্থানের নাম ফরিদপুর হয়েছে। ইতিহাসবিদ আনন্দনাথ রায় বলেছেন, ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ার অনুযায়ী ফতেহ আলীর নামানুসারে এই জেলার নাম ছিল ফতেহাবাদ। তিনি এই জলজঙ্গলপূর্ণ এলাকাকে মানুষের বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। অয়েদশ শতকের শুরুর দিকে আজমির শরিফের হযরত মহিনুদিন চিশতির অনুসারী সাধক শাহ ফরিদউদ্দিন বা শেখ ফরিদউদ্দিন এই স্থানে তাঁর আস্তানা স্থাপন করেন। বর্তমান কালেক্টরেট ভবনের পাশেই সেই আস্তানা। তাঁর নামানুসারে ফতেহাবাদের নাম পরিবর্তন করে ফরিদপুর রাখা হয়।<sup>১</sup> মাদারীপুরকে স্থানীয় উচ্চারণে ঘান্দারীপুর বলা হয়। ঘান্দারগাছের আধিক্য থেকে এই নামকরণ হতে পারে। বদরউদ্দিন শাহ মাদারের নামানুসারে স্থানের নাম মাদারীপুর হয়েছে বলেও মনে করা হয়। ‘বাংলা বিশ্বকোষ’ মতে, ‘মাদার ফকির নামক জনেক দরবেশের নামানুসারে ইহার নাম মাদারীপুর হইয়াছে।’<sup>২</sup>

মাদারীপুর জেলা একসময় ছিল চন্দ্রদীপ রাজ্যের ও বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। তারপর এটি ফতেহাবাদ বা ফরিদপুরের অন্তর্গত হয়। মাদারীপুর জেলার অধিবাসী ফরায়েজি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হাজী শরীয়তউল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০) নামানুসারে ‘শরীয়তপুর’ নামে নতুন একটি মহকুমা গঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ নভেম্বর। নবগঠিত মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয় পালং, জাজিরা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট ও ডামুড়া থানা। সদর দফতর স্থাপিত হয় পালং সদরে। আর মাদারীপুর সদর, রাজের, কালকিনি ও শিবচর থানা থেকে যায় মাদারীপুর মহকুমায়। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে দেশের সকল মহকুমা জেলায় উন্নীত হলে ১৯৮৩ সালের ৭ মার্চ শরীয়তপুর জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। জেলা হিসেবে শরীয়তপুরে অগ্রযাত্রা শুরু হয় ১৯৮৪ সালের ১মার্চ।

শরীয়তপুর নামে কোনো স্থান না থাকলেও প্রথমে মহকুমা ও পরে জেলার নাম হয় শরীয়তপুর। জেলাসদরের পূর্বতন নাম পালং। এটি খুবই প্রাচীন জনপদ। ১৮১১ সালে ফরিদপুরে স্বরাজসংস্পর্শ রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে পালং থানা গঠিত হয়। তখন বাকেরগঞ্জ জেলার গৌরনদী থানা, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানা ও মানিকগঞ্জ



শঙ্গীয়তপুর জেলার যানচিত্র

মহকুমা ফরিদপুরের অঙ্গর্গত ছিল। ১৮৭৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত ‘ক্যালকাটা গেজেট’ থেকে মাদারীপুর মহকুমার থানা হিসেবে মাদারীপুর, পালং, ডামুড়া, গোসাইরহাট ও শিবচর থানার নাম পাওয়া যায়।<sup>১</sup> এই থানাগুলোর মুস্ফিফি ছিল চিকন্দিতে। আর সকল থানায় সাবরেজিস্টারের কার্যালয়ও ছিল। ১৮৮১ সালের ৯ মার্চ কলিকাতা গেজেটে পালং থানার সীমানা নির্ধারণ করা হয়।<sup>২</sup> অর্থাৎ এর আগে থেকেই এটি থানা হিসেবে চালু ছিল। ‘পালং’কে আঞ্চলিক উচ্চারণে পালং বলা হয়। তাই ধারণা করা হয় যে, ‘পালং’ নামের পশ্চাতে ‘পালং’ শব্দের যোগ রয়েছে—পালং। আবার মগ আদিবাসীদের ভাষায় গ্রামকে পালং বলা হয়। মগদের আগমনের গ্রাম হিসেবে এর নাম পালং হতে পারে। পালং এখন আর প্রশাসনিক থানা নয়। এটি শরীয়তপুর সদর থানা নামে পরিচিত। অথচ পালং হচ্ছে এই জেলার প্রাচীন থানা। ‘বারভুইয়ার চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সময় এই অঞ্চলের উন্নতি শুরু হয়।’<sup>৩</sup> পালং থানায় তখন যে সকল গ্রাম গেজেটভুক্ত ছিল তা হলো—

নড়িয়া, কলুকাটা, খেরপটী, লোনসিং, চাকদহ, মুলফৎগঞ্জ, মানাখান, সিরপল, যোগপাট্টা, চান্দতাওরী, সাতপার, ভূমখাড়া, জালীয়াহাটী, ফতেজপুর, নগর, দেওজুরী উপসী, মসুরা, আকসা, চান্দনী, আচুড়া, ভূড়ুড়া, ডিঙ্গামানিক, কোয়ারাগ, মাঙা, কাঠকুলী, আলকাদ, চান্দা, কেদারপুর, কাপাসপাড়া, বিখারি, ভড়া, দিনারা, বোকাইনগর, বাধীয়া, দুলখখণ্ড, মগর, আটীপাড়া, ধামারণ, চামট, গোনমাইজ, কুড়াশী, দাশরতা, পালঙ্গ, তুলাসার, বিলাসখান, বাটিনগোহী, সাভুপুরা, ধামসী। গঙ্গামার, কোমরপুর, জানসার, ডেমসার, শউলা, আবুরা, সুজন্দল, চিকন্দি, সুন্দিসার, দশকান, বিনোদপুর, আড়িগা, পাটানিধি, শুরিপাড়া, লতাবাগ, দাঢ়খোলা, বড় নিদানপুর, ঘাশীখোলা, পশ্চিমপার, বাহেরচর, আউলিয়াপুর, জাফ্রাবাদ, বড় পাচন গোবিন্দপুর, খোয়াজপুর, মাধু, শূন্যঘোষ, রামভদ্রপুর, মায়দপুর, নিলকুণ্ডি, কাকদি, ধানুকা, হৃগলী, বালীচারা, ছয়-ঘরিয়া, মাট্রিসার, কাপ্তনপাড়া লাকারতা, গইড়া, দিনারা, পাইয়াতলী, পশ্চিমসার। নলতা, হোগলা, ঘড়ীসার, আমতলী, পাচলেজা, গুলমাইজ, বাটুগাঁহি, সিতুপুরা, মহিষকান্দী, সিঙ্গাচূড়া, কামটোলা ভেদেরগঞ্জ, সামন্তসার, নলমুড়ি, দুরয়ার, মাকসাহার, মির্জাপুর, পুটীজুরী, ছয়গাঁ, দেভোগ, সাজনপুর, পাপরাইল, চন্দনকর, সোণামুখী, ঝন্দুকর, চরচাটগণ, মানুয়া, আগকসা; সিড়া, ভাসানচর, দাদপুর, চররসনন্দী, চরলক্ষ্মী, নারায়ণ, দালুই, ডামড়া, কনকসার, দক্ষিণপাড়া, নামুলজন্দী, সিংহগাড়িয়া, মূলনাপাড়া, পইকাটী। বিশাকড়া, চলঅঙ্গা, কাহা, গোবাড়ি, দাদপুর, লক্ষ্মীপুর, স্বানঘাটা, চরপাড়া, চরমালগা, ধানকাটী, ভুলুয়া, চরপঞ্চা, দিকশুল, কান্দাপাড়া, টিগোলিয়া, কিয়পদা, ছাপকাটী, দাসের জঙ্গল, মহেশখালী, হাটুরিয়া, গজারিয়া, ফাগনসা, কালুঁগা, রামচন্দ্রপুর, নাগেরপাড়া, বাঁশগাড়ী, রাণীসার, বানেদ়গুরি, কাঞ্চাৰচয়, তাৰকলিয়া, বিলটীয়া, সিংগারডা, চৰতলনা, কলারগাঁ, মালনাপাড়া, বিকায়কাটী, এড়িকাটী, টেঙ্গো। বেজনী সার, পাতলা, মসুরগা, পত্তি, বুড়ীর হাট, গোসাইরহাট, তিলে, পিয়কাটী, কাশাভোগ মধ্যপাড়া। এতক্ষণ

রাজনগর, জপসা, পোড়াগাছা প্রভৃতি নদীগর্ভস্থ স্থানগুলি পুনরায় উন্নিত হইয়া চড়াতে পরিণত হইয়াছে। চর জাজিরার অস্তর্গত এইরূপ প্রায় ৫০৬০ খানা গ্রামের পরিচয় প্রাণ হওয়া যায়।<sup>১</sup>

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, নড়িয়া, ডামুড়া (ডামাড়া), ভেদরগঞ্জ (ভেদেরগঞ্জ), গোসাইরহাট ও জাজিরা তখনও থানার মর্যাদা পায় নি।

১৮৭১ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে কীর্তিনাশার দক্ষিণ তীরে মূলফৎগঞ্জ থানাধীন ৪৫টি গ্রাম ঢাকা জেলা থেকে খারিজ হয়ে বাকেরগঞ্জ জেলাধীন মাদারীপুর মহকুমার ভেতরে নেওয়া হয়। দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে গোকুলগঞ্জ নামক স্থানে প্রথম থানা হয়। পদ্মার ভাঙ্গে গোকুলগঞ্জ বিলীন হলে এই থানা মূলফৎগঞ্জে নেওয়া হয়। কিন্তু মূলফৎগঞ্জেও নদীভাঙ্গনের শিকার হলে থানা চলে যায় পোড়াগাছ গ্রামে। তবে থানার নাম অপরিবর্তিত থাকে।

১৮৭৪ সালের আগেই গঠিত হয় ডামুড়া থানা। পঞ্চদশ শতকেই এই জনপদের উত্থান। তখন এখানে বয়ে যাওয়া জলস্ন্তোষ ভারতের দামোদর নদীর স্নেহে তুলনা করা হতো। তাই আঞ্চলিক উচ্চারণে দামোদর> দামোদরিয়া > ডামুড়া > ডামুড়া নাম ধারণ করেছে। ১৮৭৪ সালের কলিকাতা গেজেটে ডামুড়া থানার নাম থাকলেও তার শতবর্ষ পরে প্রকাশিত ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ার মাদারীপুর মহকুমার ৯টি থানার মধ্যে শরীয়তপুরের নড়িয়া, পালং, জাজিরা, গোসাইরজাট ও ভেদরগঞ্জ থানার নাম থাকলেও ডামুড়া থানার নাম নেই। পূর্বতন ভেদরগঞ্জ ও গোসাইরহাট থানার কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে এটি গঠিত।<sup>১</sup> কিন্তু পুলিশফাঁড়ি ছিল এখানে শতবর্ষ আগে থেকেই।

১৮৭৪ সালের আগে গোসাইরহাট থানা গঠিত হলেও এর সীমানা নির্ধারিত হয় ১৯০৮ সালের ৩ মে।<sup>২</sup> এটি ছিল ইদিলপুর পরগনার একটি গ্রাম। বাকেরগঞ্জের হিজলা ও মূলাদী থানা ইদিলপুর পরগনার অস্তর্গত ছিল। ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে এক সাধু অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ গোসাইর নামানুসারে একটি হাটের নাম হয় গোসাইরহাট। পরে এখানে থানা স্থাপিত হয়। ইদিলপুর নামে একটি ইউনিয়ন রয়েছে এই থানার মধ্যে। বাংলার বারুভূইয়াদের অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদরায় ও কেদারায় ছিলেন ইদিলপুরের জমিদার। ‘আদিল’ বা ‘ন্যায়বিচার’ শব্দ থেকে স্থান হিসেবে ‘ইদিলপুর’, আঞ্চলিক ভাষায় ‘ইন্দিলপুর’ নামের জন্ম।

১৯০৮ সালের ৩ মে ‘ভেদেরগঞ্জ’ থানার সীমানা নির্ধারণের গেজেট প্রকাশিত হয়।<sup>৩</sup> এর অনেক আগে থেকেই এই স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভদ্রলোকের বাসোপযোগী অঞ্চল বিধায় ভদ্রগঞ্জ> ভদ্রেরগঞ্জ> ভেদেরগঞ্জ নাম হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। সরকারি অনেক প্রতিবেদনে ভেদেরগঞ্জ নাম পাওয়া যায়। বেদেরগঞ্জ শব্দটির ইংরেজি উচ্চারণে ভেদেরগঞ্জ (Vederganj) লেখা হয়। এই এলকায় একসময় বেদের বহর আসত। সেই বিবেচনায় বেদের বহরের কারণে বেদেরগঞ্জ থেকেই অর্থাৎ বেদেরগঞ্জ> ভেদেরগঞ্জ নাম হতে পারে বলে ভাষাতাত্ত্বিক

ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে কর্দম বা কাদাকে ‘ভেদের’ বলা হয়। তাই কাদামাটির গঁজ হিসেবে ভেদেরগঁজ হতে পারে।<sup>১০</sup>

১৯৩০ সালে নড়িয়া থানা গঠিত হয়। এই নামে একটি বিশাল মৌজা রয়েছে। নদীবিধৌত এলাকা বলে প্রতিবছর এর আয়তন স্থানান্তরিত হয়ে পড়ত। অর্থাৎ এর অবস্থান নড়ে যেত বা নইয়া যেত। আঘৰলিক উচ্চারণে নইয়া থেকে মান-উচ্চারণে নইয়া <নৈরিয়া <নড়িয়া নামকরণ হতে পারে বলে ধারণা করা যায়।

১৯৭৩ সালে প্রকাশিত ‘বাংলা বিশ্বকোষ’ গ্রন্থে মাদারীপুরে যে নঁটি থানার উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে জাজিরার নাম রয়েছে।<sup>১১</sup> ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ জাজিরা উপজেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরশ্রেষ্ঠ মুসি আবদুর রউফের মাতা মোসামাএ মকিনুল্লেসার মাধ্যমে এর উন্মোধন করা হয়। জাজিরা মূলত পদ্মানন্দীর একটি চর। আরবি ভাষায় দীপকে বলা হয় জাজিরা। দীপ আর চরকে সমার্থক ভেবে ভূমি জরিপের সময় হয়তো এই জনপদকে জাজিরা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

### ৪. ভৌগোলিক অবস্থান

শরীয়তপুর জেলা ঢাকা বিভাগের অঙ্গর্গত। এর উত্তরে পদ্মানন্দী ও মুকীগঁজ জেলা, পূর্বে মেঘনানন্দী ও চাঁদপুর জেলা, পশ্চিমে মাদারীপুর জেলা ও দক্ষিণে বরিশাল জেলা। শরীয়তপুর জেলার আয়তন ১১ হাজার ২ দশমিক পঁয়তালিশ বর্গকিলোমিটার। এর ভৌগোলিক অবস্থান হলো উত্তর অক্ষাংশ ২৩.০১° থেকে ২৩.২৭° এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৯০.১৩° থেকে ৯০.৩৬°। জেলার ৬০টি উপজেলা ও একটি থানা রয়েছে। ৬টি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান<sup>১২</sup> নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো-

ক্রমিক	উপজেলা	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	উত্তর অক্ষাংশ	পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
০১	শরীয়তপুর	১৭৫.০৮	২৩.০৮° - ২৩.১৮°	৯০.১৪° - ৯০.২৩°
০২	জাজিরা	২৩৯.৬০	২৩.১৬° - ২৩.২৭°	৯০.১৩° - ৯০.২৬°
০৩	নড়িয়া	২১৮.৭০	২৩.১৪° - ২৩.২৫°	৯০.১৮° - ৯০.৩০°
০৪	ভেদেরগঁজ	২৪৬.২০	২৩.০৮° - ২৩.২৪°	৯০.২৩° - ৯০.৩৬°
০৫	ডামুড়া	৯১.০০	২৩.০৬° - ২৩.১২°	৯০.২০° - ৯০.৩০°
০৬	গোসাইরহাট	১৩৩.১০	২৩.০১° - ২৩.১০০	৯০.২০° - ৯০.৩৪০

১৯৫০ সালের আগে এ-অঞ্চলের মানুষ গয়নার নৌকায় পাশের জেলা চাঁদপুর, ঢাকা বা নারায়ণগঁজে যাতায়াত করত। নৌকায় করে বরিশালে গিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য করত। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে গয়নার নৌকার স্থান দখল করলো লক্ষ্য ও স্টিমার। ভোজেশ্বর, সুরেশ্বর ও পট্টিতে স্টিমারঘাট ছিল। ১৯৯১ সালের দিকে পট্টিতে নতুন করে স্টিমার ভিড়ত। বর্তমানে ঐ স্থানে আর স্টিমার ভিড়তে পারছে না। ১৯৯২ সালের আগে শরীয়তপুর জেলায় মাত্র ৩ কিলোমিটার সড়ক পাকা ছিল। ২০০৬ সাল থেকে প্রত্যেক উপজেলা, ইউনিয়ন এমনকি প্রায় অধিকাংশ গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য জেলায় যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌপথ। একসময় কাঁচারাস্তায় বালার চর থেকে

৩৫ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আঙ্গারিয়া গিয়ে সেখান থেকে লক্ষে মহকুমা শহর মাদারীপুর যাওয়া যেত। জেলা সদর ফরিদপুর যেতে কমপক্ষে ২দিন সময় লাগত।

জেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শরীয়তপুরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বর্ষাকালে নৌকাই ছিল প্রধান বাহন। বর্ষাকালে শরীয়তপুর, ওয়াপদাঘাট, আঙ্গারিয়া, ভোজেশ্বর, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, লাউখোলা, ডামুড়া, সুরেশ্বর, পাটি প্রভৃতি স্থান থেকে লক্ষে চড়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা যায়। শুক মৌসুমে শুধু সুরেশ্বর, ওয়াপদাঘাট, লাউখোলা ও পট্টিতে লক্ষণ ভেড়ে।

বর্ষাকালে মূল বাহন নৌকা। এখন ট্রালার চালু হওয়ায় যাতায়াত কিছুটা সহজতর হয়েছে। শুক মৌসুমে অবশ্য কাঁচা রাস্তা দিয়েও রিঙ্গা চলাচল করতে পারে। সব ক'টি থানার সঙ্গেই এখন পাকা রাস্তায় যাতায়াত করা যায়। মাদারীপুর থেকে শরীয়তপুর হয়ে সুরেশ্বর পর্যন্ত বাস চলাচল করে। সেখান থেকে লক্ষে ঢাকা বা চাঁদপুর যাওয়া যায়। একসময় শরীয়তপুরের জনসাধারণের রাজধানীতে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল লঞ্চ। সুরেশ্বর, ওয়াপদাঘাট, লাউখোলা ও পটি থেকে লক্ষে উঠে ঢাকায় পৌছেন। বর্তমানে শরীয়তপুর থেকে বাসযোগে মঙ্গলমাঝিরঘাট ও মাওয়াঘাট থেকে ঢাকায় সহজে যাতায়াত করা হয়।

### গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশের জেলা হিসেবে এটি নবীন। ১৯৮৪ সালে এর গঠন হলেও জনপদ হিসেবে এর প্রাচীনতা অস্বীকার করার উপায় নেই। আদিকালে এটি ছিল ‘বঙ্গ’ (Vanga) রাজ্যের অধীন। ‘বঙ্গ’ রাজ্য বিস্তৃত ছিল পদ্মানদীর দক্ষিণ পাশের অঞ্চলে। ইংরেজি উচ্চারণ লক্ষ করলে ফরিদপুর জেলার ‘ভাঙ্গ’ থানার নামটি ‘বঙ্গ’ শব্দের অপদ্রংশ বলে মেনে নেওয়া যায়।

এই অঞ্চলের ৪৬ শতকের আগের ইতিহাস জানা যায়নি। ৪৬ শতকে এই অঞ্চল ছিল শুঙ্গ রাজবংশের অধীনে। ৬ষ্ঠ শতকে ধর্মাদিত্য নামক এক রাজার শাসনে ছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রাণ তাত্ত্বাসন থেকে শাসনকর্তা হিসেবে রাজা গোপালের নামও জানা যায়। শুঙ্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর সমাচার দেব নামক একজন স্বাধীন রাজা এ-অঞ্চল শাসন করেন (৬১৫-৬২০)। ৭ম শতকে বঙ্গ অঞ্চল থাকে রাজা হর্ষবর্ণনের অধীনে। তাঁর মৃত্যুর (৬৪৭) পরে বঙ্গ রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখনকার শাসকের নাম যথাযথভাবে জানা যায়নি। তবে এটি পরে ‘খাদগাস’ রাজতন্ত্রের অধীনে (৬৫০-৭০০) ছিল। ১০ম ও ১১শ শতকে বৌদ্ধ রাজাদের অধীনে যায়। এর পর বর্মণ, পাল ও সেন বংশের শাসন চলে। ১২০৬ সাল পর্যন্ত রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন ১২০৬ থেকে ১২২২ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা হারান। ঐ সময় দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শাসক দেব রাজবংশের প্রতিনিধি দশরথ দেবের এই অঞ্চলের দায়িত্ব ভার প্রহণ করেন। দশরথ দেব-ই এই অঞ্চলের শেষ হিন্দু রাজা।

এরপর চতুর্দশ শতক থেকে ১৫৭৫ সাল পর্যন্ত মুসলিমদের শাসন চলে। ১৩৩০ সালে মুহম্মদ বিন তুগলক পূর্ববঙ্গ দখল করে লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নামে তিনটি প্রদেশে ভাগ করেন। সোনারগাঁও-এর গভর্নর ছিলেন তাতার বাহরাম খান। ১৩৩৮ সালে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁরই অন্তর্বাহী ফখরুন্দিন শাহ ক্ষমতা দখল করেন এবং মুবারক শাহ উপাধি নিয়ে দশ বছর শাসন করেন। ১৩৫১ সালে সামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং পরে তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ এবং তাঁর পুত্র আজম শাহ এই অঞ্চল শাসন করেন। পরে রাজা খান এই অঞ্চল দখল করেন। ১৪৪৫ সালের দিকে ইলিয়াস শাহের বংশধর মাহমুদ শাহ (প্রথম) বঙ্গ একীভূত করে ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। এই সময় ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ অঞ্চল নিয়ে জালালাবাদ এবং ফতেহবাদ প্রদেশ গঠন করা হয়। ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত এ-এলাকা শাসন করেন হোসেন শাহ। তিনি প্রথমে ফতেহবাদের ক্ষমতা দখল করেন এবং সেখানে তার প্রথম মুদ্রা ছাপানো হয়। লখনৌতি প্রদেশের শাসক জালালউদ্দিন ফতেহশাহের নামনুসারে এই ফতেহবাদ পরে ফরিদপুর নামে রূপান্তরিত হয়। মুঘলদের আমলে (১৫৭৬-১৭৫৭) স্মাট আকবরের নির্দেশে ১৫৭৪ সালে মুরাদ খান নামে এক সেনাপতি ফতেহবাদ (ফরিদপুর) ও বাকেরগঞ্জ দখল করেন। মুরাদ খান এরপর ফরিদপুরেই থেকে যান এবং ছয় বছর পরে মারা যান।

শরীয়তপুর-এর নড়িয়া খানার কেদারপুর নামক স্থানে আগে বারো ভূইয়াদের দু'জন ভূইয়া চাঁদরায় ও কেদাররায় এ-অঞ্চলের শাসক ছিলেন। কেদাররায় মানসিংহের সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধে শহিদ হন।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনের পরে ১৭৬৫ সালে এ-অঞ্চল ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে। ১৭৯৩ সাল থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর পর এই অঞ্চলসহ বৃহত্তর ঢাকা, বাকেরগঞ্জ এলাকা কিছু অংশ ঢাকা-জালালপুর নামে নতুন জেলাভুক্ত হয়। ১৮০৭ সালে ঢাকা-জালালপুরের জেলা সদর ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮১৫ সালে ফরিদপুর জেলা একজন সহকারী কালেক্টরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ জেলারপে আত্মপ্রকাশ করে।

শরীয়তপুর অঞ্চল বিক্রমপুর থেকে ১৮৬৯ সালে বাকেরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৩ সালে এটি ফরিদপুর জেলাভুক্ত মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত হয়। ১৯১০ থেকে ১৯৩৫ সালের দিকে এ-অঞ্চলের বহু বিপুলী ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিট্রিশবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। শাস্তি সেন, সন্তোষ ব্যানার্জী, লোনসিং গ্রামে জন্মগ্রহণকারী বিপুলী পুলিনবিহারী দাস এঁদের অন্যতম। বায়ানৱ ভাষা-আন্দোলন, উন্সতরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতাযুদ্ধে এই অঞ্চলের মানুষ ব্যাপক অবদান রাখে।

প্রশাসনিক সুবিধার্থে মাদারীপুরের পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক মহকুমা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯১২ সাল থেকে। কিন্তু সেই উদ্যোগ এক পর্যায়ে এসে থেমে যায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে মাদারীপুরের পূর্বাঞ্চল নিয়ে একটি নতুন মহকুমা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। মাদারীপুর মহকুমার ক্রতি সন্তান, বিশিষ্ট সমাজ-সংস্কারক, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা, ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তউল্লাহর

নামানুসারে গঠিত ‘শরীয়তপুর’ মহকুমা গঠিত হয়। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে দেশের সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হলে শরীয়তপুর মহকুমাও জেলার মর্যাদা লাভ করে।

### ৪. জনবসতির পরিচয়

১৯০৮ সালে প্রকাশিত ‘ফরিদপুরের ইতিহাস’ গ্রন্থে আনন্দনাথ রায় বলেছেন, ‘এই (ফরিদপুর) জেলা হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খ্রিস্টিয়ান এই চারি জাতির বাসস্থান।’<sup>১০</sup> তিনি লোকসংখ্যার যে হিসাব দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

ক্রম	জাতি	লোকসংখ্যা		
		পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১	হিন্দু	৩৬০০১২	৩৭২৫৪৩	৭৩৩৫৫৫
২	ব্রাহ্ম	৪০	৪৩	৮৩
৩	মুসলমান	৬০৭৬৮৮	৫৯১৬৬৩	১১৯৯৩৫১
৪	খ্রিস্টান	-	-	৩৬৫৭
৫	জৈন	-	-	৫
৬	বৌদ্ধ	-	-	১০
মোট				১৯৩৬৬৬১

বৃহত্তর ফরিদপুরে এই ১৯ লাখ ৩৬ হাজার ৬ শত ৬১ জনের মধ্যে ইতিহাসবিদ আনন্দনাথ রায় ব্রাহ্মদের একটি পৃথক জাতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে এই জেলায় ব্রাহ্ম ও জৈন সম্প্রদায়ের কেউ নেই। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, কায়স্ত, বৈদ্য, শুণ্ড, নমঘংসুন্দ, কাঁসারি, নাপিত, গোপ বা গয়লা, সেকরা, সাহা, কলু, বেহারা, তেলি, মুচি, শাঁখারী, বণিক, কৈবর্ত, মালী প্রভৃতি শ্রেণির লোক রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে জোলা ও নিকারি শ্রেণি থাকলেও পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে বৈষম্য নেই।

১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী শরীয়তপুর জেলার লেখাসংখ্যা ৮ লাখ ৪৬ হাজার ৯ শত ৩২ জন। ২০০১ সালের হিসাব<sup>১১</sup> অনুযায়ী লোকসংখ্যা –

জাতি	লোকসংখ্যা
মুসলমান	১০৪১৫৮৮
হিন্দু	৪০৪৯১
বৌদ্ধ	৬০
খ্রিস্টান	২৮
অন্যান্য ধর্ম ও আদিবাসী	১৫৭
মোট	১০৮২৩০০

অন্যান্য ধর্ম ও আদিবাসীদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

### ৫. নদ-নদী ও ধান-বিল

শরীয়তপুর জেলাসদর পালংনদীর তীরে অবস্থিত। শরীয়তপুর জেলার উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে কীর্তিনাশা ও পূর্বে মেঘনানদী প্রবাহিত। এ-জেলার উল্লেখযোগ্য নদীর মধ্যে

রয়েছে পদ্মা, মেঘনা, কীর্তিনাশা, দায়ুদিয়া, আড়িয়ালখা, পালং, নয়াভাঙ্গানী, মরাগঙ্গা, ফাইসাতলার দোন, কালিগঙ্গা, লেদাম প্রভৃতি। এ-সকল নদীর শাখানদীও রয়েছে।

**পদ্মা:** জেলার উত্তর দিয়ে প্রবাহিত পদ্মানদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পদ্মানদী বর্ষায় কানায়-কানায় ভরে উঠলেও সারাবছরই নাব্য থাকে। প্রমত্তা পদ্মার ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় শরীয়তপুর জেলার মানচিত্র অনেকটা ছোট করে ফেলেছে। জাজিরা উপজেলার নাওড়োবা, বিলাসপুর, কুওরেচর, খেজুরতলা, পালেরচর; নড়িয়া উপজেলার নওপাড়া, চরআত্তা, সুরেশ্বর, চওপুর, ওয়াপদা; ভেদরগঞ্জ উপজেলার কাচিকাটা, চরসেনসাস, দুলারচর এলাকার শাতার্থিক গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার, কেদারপুর, চরআত্তা, নওপাড়া, মোজারের চর এবং রাজনগর ইউনিয়নের উপর দিয়ে পদ্মা নদী প্রবাহিত হয়েছে। এছাড়া এ-উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত কীর্তিনাশা নদী পদ্মা নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়া ঘড়িসার ইউনিয়ন ও ডিঙামানিক ইউনিয়নের উপর দিয়ে পদ্মা নদীর একটি শাখা নদী প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমানে পদ্মা নদীর পানি এ-অঞ্চলের কৃষি কাজ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। এছাড়া এ-অঞ্চলের মানুষের মৎস্য চাহিদার বিরাট একটা অংশ এ-নদী থেকে পূরণ করা হয়।

**আড়িয়ালখা:** পদ্মার প্রধান শাখানদ আড়িয়ালখা প্রবাহপথের শুরুতে ফরিদপুর শহরের পূর্বপাশে ভুবনেশ্বরনদ নামে পরিচিত। ভুবনেশ্বর নামে ষোল মাইল এগিয়ে আবার পদ্মার সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানে ভুবনেশ্বরের অস্তিত্ব নেই। ভুবনেশ্বর থেকেই আড়িয়ালখা নদের জন্ম। এই নদ শরীয়তপুর জেলার পশ্চিমসীমা দিয়ে আর মাদারীপুর জেলার পূর্বসীমা দিয়ে প্রবাহিত। কালকিনি চরের পূর্ব পাশ দিয়ে এটি ফুলতলার নদীর সঙ্গে মিশেছে। এর দুটি শাখানদী হচ্ছে নীলখি খাল আর কাচিকাটা খাল।

**মেঘনা:** পূর্ব ভারতের পাহাড় থেকে উত্তৃত মেঘনা নদী সিলেট অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে চাঁদপুরের কাছে পদ্মানদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে শরীয়তপুর জেলার পূর্বপাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

**কীর্তিনাশা:** এটি পদ্মার একটি শাখানদী। জেলার পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে যাওয়া কীর্তিনাশা নদীর স্নোতে এক সময় জেলার ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা অর্থাৎ রাজা রাজবন্ধু এবং চাঁদরায়-কেদাররায়ের নাম প্রকার কীর্তি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার কারণে অর্থাৎ নাশ হওয়ার কারণে এ-নদীর নামকরণ করা হয়েছে কীর্তিনাশা। এই নদী সম্পর্কে আনন্দনাথ রায় লিখেছেন, ‘একমাত্র কীর্তিনাশার প্রাদুর্ভাবে সেই রমণীয় স্থান এখন শূশানে পরিগত হইয়াছে, অধিকাংশ বিল-বিল কীর্তিনাশার গর্ভস্থ হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও আবার নদীস্নোতে সংমিশ্রিত বালুকারাশিতে নিমজ্জিত হওয়াতে শস্যেৎপন্নের পক্ষে যথেষ্ট অস্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। নদীগর্ভে অধিকাংশ স্থান বিলীন হওয়ায়, তৎস্থানীয় লোকেরা অত্যল্প পরিসর স্থানে একত্র সমাবিষ্ট হইয়া বাস করিতেছে।’<sup>১৫</sup> এটি পদ্মা থেকে বের হয়ে শরীয়তপুর জেলা ভেদ করে মেঘনায় গিয়ে মিশেছে।

**নয়াভাঙ্গানী:** কালীনগরের কাছে আড়িয়ালখাঁ নদ থেকে সৃষ্টি হয়ে শরীয়তপুর জেলার ইদিলপুর ও শ্রীরামপুরের ভেতর দিয়ে শরীয়তপুরের পূর্বে ঘেঘনা নদীর সঙ্গে মিশেছে।

**ফাইসাতলার দোন:** এটি আড়িয়ালখাঁ নদের শাখা। পাঞ্জাসিয়া পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৬০ কিলোমিটার। বর্ষার সময় ৬০ থেকে ৮০ গজ প্রশস্ত থাকত। এই নদী এখন আর নাই।

**লেদাম:** এটি কীর্তিনাশার শাখা নদী। বুড়িরহাটের পাশ দিয়ে এটি প্রবাহিত ছিল। লেদামনদীর পাড়েই বুড়িরহাট গড়ে উঠে। এখন আর নদীর অস্তিত্ব নেই। পুরোটাই এখন মাঠ আর বসতি।

**পালং:** পদ্মা থেকে সৃষ্টি এই নদীর পাড়ে পালং বন্দর গড়ে উঠে বলে এটি পালং নদী নামে পরিচিত। পালং বন্দরই এখন শরীয়তপুর জেলা সদর। পালং নদী এখন বিলুপ্ত।

**দামুদিয়া:** ডামুড্যার উল্লেখযোগ্য নদী দামুদিয়া। এই নদীর নাম থেকেই ডামুড্যার নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। স্থানীয়ভাবে একে দামোদও নদীও বলা হয়। এটি পদ্মানদীর শাখা। ডামুড্যা থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরে এই নদী পদ্মার সঙ্গে যুক্ত। এই নদীর মাধ্যমে রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। বর্তমানে এই নদীর পানি দ্বারা কৃষিকাজ করা হয়। এই নদীতে অনেক মাছ পাওয়া যায়।

**ভয়রা:** পদ্মার শাখানদী সুরেশ্বর থেকে বের হয়ে কার্তিকপুরের পাশ দিয়ে পত্রি পর্যন্ত প্রবাহিত।

এছড়া সথিপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত খালটি একসময় সথিপুরের গাঙ নামে পরিচিতি ছিল। অর্থাৎ এটিও একসময় নদী ছিল। এখন ভয়রা, দামুদিয়া, মরাগঙ্গা আর কালিগঙ্গা নদীর অস্তিত্বে খুঁজে পাওয়া যায় না।

### চ. শুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জেলা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। পঞ্চদশ শতকেই শরীয়তপুরের ধানুকা গ্রামে সংস্কৃত টোল স্থাপিত হয়। এই টোল চালু ছিল আঠারো শতক পর্যন্ত। এর মর্যাদা ছিল এখনকার যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান। এই টোল সম্পর্কে প্রত্তত্ত্ববিদ ড. একেএম শাহনাওয়াজ বলেছেন, ‘মধ্যযুগে সংস্কৃত শিক্ষালয় টোল অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দুর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনসাবাড়ির অবস্থান সে সময়ে শরীয়তপুরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সন্ধান দিচ্ছে। মধ্যযুগের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সংযোজিত হয়েছে একটি নতুন দৃশ্যপট।’<sup>১৬</sup> এসময় এই এলাকায় আরো অনেক টোল ও পাঠ্যশালা ছিল বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু সেই ধারা বিলুপ্ত হয়ে পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে ১৯৬৯ ডামুড্যায় স্থাপিত হয় পূর্বমাদারীপুর মহাবিদ্যালয়। এটি এই জেলার প্রথম মহাবিদ্যালয়।

এর আগে এই জেলার মানুষ ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। বর্তমানে এ-জেলায় শিক্ষার হার ৩৮.৯৫%। জেলায় ১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি সরকারি ও ১৩টি বেসরকারি মহাবিদ্যালয়, ১০৮টি উচ্চবিদ্যালয়, ৪৮টি মাদ্রাসা ও ৬১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জেড.এইচ.সি.কদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভেদরগঞ্জের কার্তিকপুরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠাতা জয়নুল হক সিকদার।

### মহাবিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা	মহাবিদ্যালয়ের নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাতা	পর্যায়
১৯৬৮	পূর্বমাদারীপুর ম্যাটক মহাবিদ্যালয়	ডামুড়া	সেলিম মিয়া	ম্যাটক
১৯৭২	নড়িয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়	নড়িয়া	শওকত আলী	ম্যাটক
১৯৭৮	শরীয়তপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়	পালং	এলাকাবাসী	ম্যাটকোন্টর
১৯৮৪	এমএ রেজা ম্যাটক মহাবিদ্যালয়	ভেদরগঞ্জ	এমএ রেজা	ম্যাটক
১৯৮৪	জাজিরা ম্যাটক মহাবিদ্যালয়	জাজিরা	এলাকাবাসী	ম্যাটক
১৯৮৪	শামসুর রহমান মহাবিদ্যালয়	গোসাইরহাট	শামসুর রহমান প্রমুখ	ম্যাটক
১৯৮৯	ভোজেশ্বর উপসী মহাবিদ্যালয়	উপসী	ড. কেএ জলিল, আলী আহমদ খান প্রমুখ	ম্যাটক
১৯৮৯	ড. মোসলেহ উদ্দিন খান মহাবিদ্যালয়	জয়নগর, জাজিরা	ড. মোসলেহ উদ্দিন খান	ম্যাটক
১৯৮৯	টিএম গিয়াসউদ্দিন মহাবিদ্যালয়	পান্তিসার	টিএম গিয়াসউদ্দিন	উচ্চমাধ্যমিক
১৯৮৯	হাজী শরীয়তউল্লাহ মহাবিদ্যালয়	সরিপুর	কামাল বেগাবী প্রমুখ	ম্যাটক
১৯৯৩	হাবিবউল্লাহ মহাবিদ্যালয়	সরিপুর	ডা. মোসলেহউদ্দিন	উচ্চমাধ্যমিক
১৯৮৪	সরকারি গোলাম হায়দার খান মহাবিদ্যালয়	পালং	শফিকুর রহমান কিরণ	উচ্চমাধ্যমিক
১৯৯৫	শহীদ সিরাজ শিকদার মহাবিদ্যালয়	দিগর, মহিষখালী	নূরল হক শিকদার	উচ্চমাধ্যমিক
১৯৯৯	বিকে নগর বঙবন্ধু মহাবিদ্যালয়	বড়কৃষ্ণনগর, জাজিরা	মাস্টার মজিবর রহমান	উচ্চমাধ্যমিক
২০০৩	বিএম আইডিয়াল মহাবিদ্যালয়	মহম্মদপুর, শরীয়তপুর	হেয়ারেতউল্লাহ আওরঙ্গ	উচ্চমাধ্যমিক
২০০৫	শরীয়তপুর প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়	বুড়িরহাট	সরকার	ডিপ্লোমা

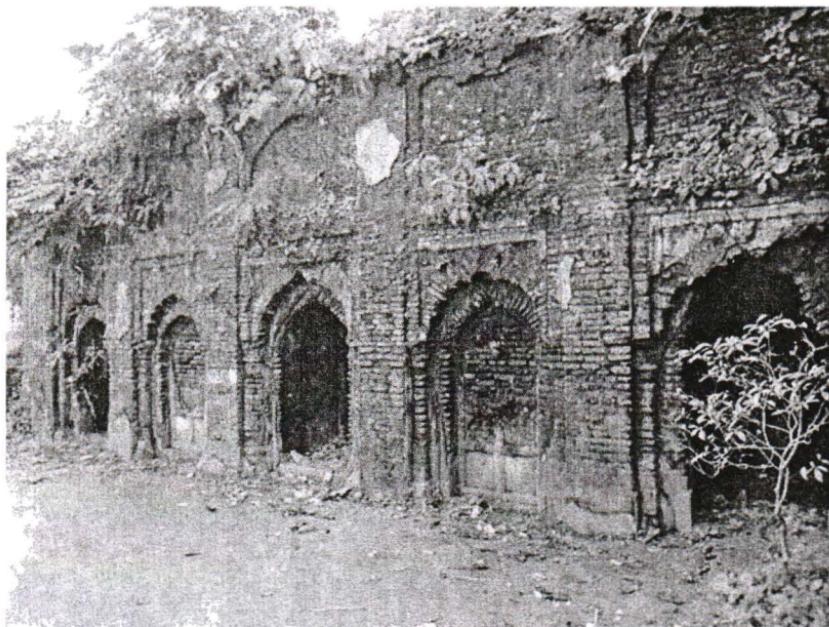
উচ্চবিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শরীয়তপুর সদর উপজেলায় ২০টি, গোসাইরহাট উপজেলায় ১২টি, ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ২৪টি, নড়িয়া উপজেলায় ২৩টি, ডামুড়া উপজেলায় ১৩টি ও জাজিরা উপজেলায় ১৬টির অবস্থান। দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার মধ্যে শরীয়তপুর সদর উপজেলায় ১০টি, গোসাইরহাট উপজেলায় ৯টি, ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ৮টি, নড়িয়া উপজেলায় ৪টি, ডামুড়া উপজেলায় ৭টি ও জাজিরা উপজেলায় ১০টির অবস্থান।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় হলো: পালং তুলাসার গুরুদাস উচ্চবিদ্যালয়, পালং, আমজাদিয়া একাডেমী, পালং; বিলাসপুর কুন্দুস বেপারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পালং; আবু তালেব মাস্টার জুনিয়র হাই স্কুল, রাজগঞ্জ; বেড়া চিকন্দি উচ্চবিদ্যালয়, কোয়ারপুর; শৌলপাড়া মনরথার কান্দি উচ্চবিদ্যালয়, শৌলপাড়া; তুলাতলা উচ্চবিদ্যালয়, আঙ্গরিয়া; চিতলিয়া সমিতির হাট উচ্চবিদ্যালয়, মজুমদার কান্দি; মাহমুদপুর মডার্ন উচ্চবিদ্যালয়, চন্দ্রপুর; আঙ্গরিয়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, আঙ্গরিয়া; গংগানগর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, গংয়ঘর; সুবচনী উচ্চবিদ্যালয়, সুবচনীহাট; রায়পুর আবন্দুল খালেক তালুকদার উচ্চবিদ্যালয়, চন্দ্রপুর; বিনোদপুর পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়, বিনোদপুর; আঙ্গরিয়া উচ্চবিদ্যালয়, আঙ্গরিয়া; চন্দ্রপুর এ.এইচ.পি উচ্চবিদ্যালয়, চন্দ্রপুর; বুড়িরহাট উচ্চবিদ্যালয়, বুড়িরহাট; ডোমসার জগতচন্দ্র ইনসিটিউশন, কোয়ারপুর; রূদ্রকর নীলমণি উচ্চবিদ্যালয়, রূদ্রকর; চিকন্দি শরফ আলী উচ্চবিদ্যালয়, চিকন্দি; পালং উচ্চবিদ্যালয়, শরীয়তপুর, কনেশ্বর এসসি এডওয়ার্ড ইনসিটিউশন (১৯১৩), ডামুড়া; কেউরভাঙ্গা আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কনেশ্বর, ডামুড়া।

### ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

শরীয়তপুর জেলার অজন্ত পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে। অনেক কীর্তি নাশ করেছে কীর্তিনাশা নদী আর অনেক কীর্তি কালের ধূলোয় হারিয়ে গেছে। এখনো যেসব কীর্তি শরীয়তপুরের গৌরব বৃদ্ধি করে চলছে তার নমুনা এখানে উদ্ধার করা হলো।

**ধানুকার মনসাবাড়ি:** প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন শরীয়তপুরের ধানুকার ময়ূর ভট্টের মনসাবাড়ি। এ-বাড়ির বেশির ভাগ সম্পদই বেহাত হয়ে গেছে। শুধু দালানগুলো এলাকার প্রভাবশালীদের ভাঙ্গার হাত থেকে এখনো রক্ষা করে রেখেছেন বাড়ির বর্তমান পুরুষ শ্যামাচরণ চক্রবর্তী। তিনি তিনু ঠাকুর নামে পরিচিত। শরীয়তপুর জেলা পুলিশ স্পারের কার্যালয়ের পিছন দিকটাই হচ্ছে ধানুকা গ্রাম। পুলিশ সুপার কার্যালয়ের আধা কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে মূল শহরের ভেতরেই অবস্থিত মনসাবাড়ি। মূল রাস্তা থেকে বাড়িটির প্রবেশ মুখে একটি বড়ো পুকুর রয়েছে। পুকুরের পশ্চিম পাড় থেকে শুরু হয়েছে মূল বাড়ির সীমানা। মন্দিরবাড়ির পশ্চিম সীমার মাঝামাঝি পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলো প্যাটার্নের দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারত। এটিই এক সময় মনসা মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হতো। উত্তরের প্রান্তসীমায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে অপেক্ষাকৃত বড়ো একটি ইমারত রয়েছে। এটিও দোচালা ছাদ বিশিষ্ট। একটি দুর্গা মন্দির হিসেবে



মনসবারাড়ির প্রাচীন টোল

চিহ্নিত। দুর্গা মন্দিরের দিকে মুখ করে একটু ভিন্ন ডিজাইনের একটি ভবন রয়েছে। ভবনটি দ্বিতীয় তলাটি বর্তমানে ধ্বংস প্রাণ। এর ওপরে ওঠার জন্য ইটের তৈরি সিডিটির কিছু অংশ এখনো টিকে আছে। এই ভবনটিই ছিল নহবত খানা। মন্দিরবাড়ির সাজানো চতুরের ধার ঘেবে একটু পশ্চিম দিকে রয়েছে কালী মন্দির। কালী মন্দিরটিও একটি দোতলা ইমারত। দোতলার অনেকটা এবং নিচতলার কিছু অংশ ধ্বনে গেছে। মন্দিরবাড়ির দক্ষিণে নহবত খানার পিছন থেকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত ধ্বংস প্রায় একটি বিশাল ভবন রয়েছে। বহু কক্ষাবিশিষ্ট এই ভবনটি ছিল দোতলা।

বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমের একাংশে দোতলার কাঠামোটি টিকে আছে। মনসবারাড়ির এই ভবনটিকেই শিক্ষায়তন বা টোল হিসেবে ব্যবহার করা হতো। টোলের সঙ্গেই আচার্যদের বসতবাড়িটি ছিল। বর্তমানে তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করার উপায় নেই। ঐতিহাসিক বর্ণনায় ময়ুর ভট্টের বৎসরার কনৌজ থেকে বর্তমান শরীয়তপুরের ধানুকায় এসে বসবাস শুরু করেন। বৎসরায় লক্ষণ মিশ্রকে ময়ুর ভট্টের পরবর্তী পুরুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর বর্ণনা মতে, সেন রাজা বিজয় সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্যামল সেন কোটালীপাড়া জয় করেন। কোটালীপাড়া জয় করে বিক্রমপুরে ফেরার পথে কোটালীপাড়ায় বসবাসরত খ্যাতিমান ত্রাঙ্কণ পশ্চিম যশোধর মিশ্র কে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এই সময় বিক্রমপুরে একটি শকুনী মারা পড়ে। সংক্ষার মতে অঞ্চলের ছায়া নামে রাজে। রাজা পুরোহিতদের ডেকে ‘শকুনী যজ্ঞে’র আয়োজন করেন। সে অনুষ্ঠানে যশোধর মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। মিশ্র অনুষ্ঠানের ক্রটির কথা উল্লেখ করলেন।



দিগন্বরী দিঘির পাড়ে পূজার আয়োজন, পাশে দাঁড়িয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন আবুল বাশার তার মতে মন্ত্রের বলে শকুনীকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। যা এখানকার পণ্ডিতদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে রাজার অনুরোধে যশোধর যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ সফল হয়। সন্তুষ্ট হয়ে রাজা পণ্ডিত যশোধরকে প্রচুর ধনসম্পদ দেন এবং বসবাসের জন্য একখন্দ জায়গা দান করেন। কিন্তু বিক্রমপুরে খাঁটি ব্রাক্ষণ নেই। বিধায় মিশ্র এখানে বসবাস করতে কুণ্ঠিত হন। পরে রাজা যশোধরের তালিকা অনুযায়ী কনোজ থেকে ব্রাক্ষণ আনানোর ব্যবস্থা করেন। এই ব্রাক্ষণদেরই বংশধর লক্ষণ মিশ্র। বিক্রমপুর নদী ভাঙন দেখা দিলে লক্ষণ মিশ্র বিক্রমপুর ত্যাগ করেন এবং দক্ষিণ বিক্রমপুর বলে খ্যাত ধানুকা এসে বসতি শুরু করেন। ময়ুর ভট্ট, লক্ষণ মিশ্র প্রমুখের সময় থেকে মনসাবাড়ির ইমরাতগুলো নির্মাণ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বর্তমানে মনসাবাড়ির সীমানায় সর্বমোট পাঁচটি ইমরাত রয়েছে। এর কোনো কোনোটি দারুণভাবে বিধ্বস্ত আবার কোন কোনটি কালের আঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সদস্তে। স্থানীয় জনশ্রুতি ও বাড়ির শেষ অবশিষ্ট নাগরিকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তবন গুলোর একটি কালিমন্দির, একটি দুর্গামন্দির, একটি মনসামন্দির, একটি নহবতখানা ও একটি আবাসিক গৃহ বা শিক্ষায়তন (টোল) হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ইমরাতগুলোর নির্মাণকাল সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও এর নির্মাণ শৈলী দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো সুলতানি বা মোঘল যুগের অর্থাৎ চতুর্থ বা তার পরবর্তী সময়ে তৈরির নির্দর্শন। এর নির্মাণশৈলী এমন যে, পেছনের দিক থেকেও

কক্ষে প্রবেশে জন্য খিলানকৃত বেশ ক'টি দরজা রয়েছে। মধ্যমুগে বহুল ব্যবহৃত পাতলা ইটের সঙ্গে চুন সুরকীর গাথুনী ও পলেস্ট্রায় ইমারতটি নির্মিত হয়েছে। চুনের সঙ্গে অথবা চুনের বিকল্পে বিনুক চূর্ণও ব্যবহৃত হয়েছে বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়। ইমারত গুলোর নির্মাণ শৈলীতে মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট।

ময়ূর ভট্ট আর মনসা বাড়ির শেষ পুরুষ শ্যামাচরণ চক্রবর্তী (তিনু ঠাকুর) একজন পণ্ডিত ও খ্যাতনামা হস্তরেখাবিদ। তিনি জানালেন, প্রায় সাত একর সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মনসাবাড়ির সম্পদগুলো এখন আর তার দখলে নেই। বেশির ভাগই বেহাত হয়ে গেছে বিভিন্ন উপায়ে। মাঝে মাঝে কিছু প্রভাবশালী লোকজন চাপ সৃষ্টি করত এই প্রাচীন ঐতিহ্য শোভিত দালানগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য। হাজার চাপের মধ্যেও আগে তিনি টিকিয়ে রেখেছেন পূর্ব পুরুষদের মধ্যযুগীয় এই নির্দশন। তিনু ঠাকুরের বড় ছেলে স্কুলশিক্ষক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী জানান, অনেক সাংবাদিক, পর্যটক ও গবেষক এসে এই বাড়ির ঐতিহ্য সম্পর্কে তথ্য নিয়ে গেছেন। কিন্তু এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য সরকার-সহ কেউ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই সম্পদকে সংরক্ষণ করা গেলে ধানুকার এই মনসাবাড়ি শরীয়তপুরের মধ্যে একটি অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।<sup>১৭</sup>

দিগন্বরী দিবি: চতুর্থ শতাব্দীতে মহিসারের শ্রীশ্রী দিগন্বরী মাতা ঠাকুররাণীর বাড়ি মন্দিরটি ছিল বলে ধারণা করা যায়। মহারাজ আদি শূর সর্ব প্রথম সুষ্ঠুভাবে বৃহৎ যজ্ঞানন্ধন ও বৈদিক ধর্ম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৪২ সালে কান্যকুজ থেকে পাঁচজন শুন্দ-সাত্ত্বিক ত্রাক্ষণ এনে বিক্রমপুর অন্তর্গত রামপাল এক বৃহৎ বৈদিক যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞ শেষে তিনি ঐ পাঁচজন ত্রাক্ষণকে পাঁচগাঁও (পঞ্চসার গ্রাম: যেমন-মাট্রিসার, পণ্ডিতসার, ঘডিসার, ডোমসার ও সামন্তসার) বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ওই পঞ্চসার গ্রামের মধ্যে মাট্রি-সার তথা মহিসার ছিল অন্যতম। এলাকাবাসীর বিশ্বাস মহিসারের ঐ ত্রাক্ষণ পরিবারেই দিগন্বরী মায়ের আবির্ভাব হয়েছে। ঘোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমপুরাধিপতি বাংলার বারো ভূইয়ার অন্যতম চাঁদরায় ও কেদার রায়ের আমলে তাঁদেরই কুলপুরোহিত ও গোসাই শ্রীভূটাচার্য বীরাচার্য দিগন্বরী মায়ের বাড়িতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। চাঁদ-কেদাররায় মনোরম সাজে সজ্জিত নানা পনসি নৌকায় মায়ের বাড়িতে এসে শুরুদেবের সথে দেখা করতেন এবং আশীর্বাদ লাভ করতেন। সে মসময় পূর্ণ বাংলার দু'টি পীঠস্থান অধিক সুখ্যাত ছিল। একটি 'মহিসার দিগন্বরী মাতা ঠাকুরাণীর বাড়ি (মন্দির) এবং অপরটি চাঁচুরতলা ঠাইরুণ (ঠাকুরণ) বাড়ি'। বাংলা ১৩৩৩ সনের ১৫ শ্রাবণ পঞ্চার কড়াল থাসে চাঁচুর তলার ঠাইরুণ বাড়িটি পঞ্চা গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু মহিসার দিগন্বরী মায়ের মন্দিরটি এখনও অগণিত মানুষের সাহস, বল ও পরিত্তির অধিয় ধারা বহন করে চলেছে।

শ্রীশ্রী দিগন্বরী মাতা ঠাকুরাণীর আবির্ভাবের আগে এই পবিত্র ভূমিটি কী অবস্থায় ছিল তা অস্পষ্ট। বহু অলৌকিক ঘটনা ও কিংবদন্তীর সাক্ষী স্বরূপ বট-অশ্বথ বৃক্ষযুগল ঘিরেই শ্রীশ্রী দিগন্বরী মাতা স্বরূপে পূর্বাপর অভিহিত হয়ে সেকাল থেকে মহিসার গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের হিন্দু জনসাধারণের সরাসরি পরিচালনায় শ্রীশ্রী দিগন্বরী মাতা ঠাকুরাণীর পূজা, শ্রীশ্রী শিব পূজা, শ্রীশ্রী কালী পূজা হরি পূজাসহ বৈদিক শাস্ত্-

বিধিমতে বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে। যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক পরিচালনার জন্য একটি নিয়মিত ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি রয়েছে। পরিচালনা কমিটির বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন শ্রী ননীগোপাল দেবনাথ এবং সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র চন্দ্র রায়। অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র রায় একটানা ২৬ বছর যাবৎ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনসহ যাবতীয় পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব পালন করছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি বৈদিক রীতিতে পরিচালিত হলেও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের সুশীল জনতার সম্মুতির মাঝে বৈশাখী মেলাসহ যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সম্পাদিত হয়। মাঝসারের মেলা-ই শরীয়তপুর জেলার সবচেয়ে বড় বৈশাখী মেলা।

**মণ্ডার শিবলিঙ্গ:** উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ হিসেবে পরিচিত



মণ্ডার শিবলিঙ্গ

ভোজেশ্বর ইউনিয়নের মণ্ডার গ্রামে দেখতে যাওয়া যায়। নড়িয়া থেকে দূরত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার। গ্রাম মণ্ডার, পো: ভোজেশ্বর, থানা নড়িয়া। এটি কালোপাথরের তৈরি।

**কার্তিকপুর জমিদারবাড়ি:** ডিঙ্গামানিক ইউনিয়ন গিয়ে কার্তিকপুর জমিদারবাড়ি যাওয়া যায়। নড়িয়া থেকে এর দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। গ্রাম ডিঙ্গামানিক, ইউনিয়ন ডিঙ্গামানিক, থানা নড়িয়া। প্রথ্যাত জমিদার মুসিচৌধুরী পরিবারের বাসস্থান। এককালীন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী এই পরিবারের সন্তান। এই বাড়ির ভগ্নাবেশ এখনো রয়েছে। প্রাচীন দালান, প্রবেশ দ্বার, পেছন দিক দিয়ে পালানোর সুড়ঙ্গপথ এখনো রয়েছে।

**মানসিংহের দুর্গ:** ফতেজঙ্গপুর ইউনিয়নে: শ্রীনগর এলাকায় গিয়ে মোঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহের দুর্গ দেখতে যাওয়া যায়। নড়িয়া থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৬ কিলোমিটার। গ্রাম ফতেজঙ্গপুর, ইউনিয়ন ফতেজঙ্গপুর, থানা নড়িয়া।

**ফতেজঙ্গপুর:** প্রাচীন নাম শ্রীনগর। মুঘল সেনাপতি রাজমানসিংহ যখন বিক্রমপুর আক্রমণ করেন তাখন তাঁর সহযোগী যোদ্ধাগণ এখানকার রাজা কেদাররায়ের কাছে পরাজিত হয়ে শ্রীনগরে আশ্রয় নেন। মানসিংহ তাদের উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী পাঠালে প্রচও যুদ্ধ হয়। কেদাররায় এ-যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন। জয়চিহ্নস্বরূপ মানসিংহ শ্রীনগরের নাম পরিবর্তন করে ফতেজঙ্গপুর রাখেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মদনমোহন বিদ্যাভূষণের জন্ম এই গ্রামে। এখানে নাককাটা বাসুদেবের প্রস্তরমূর্তি আছে।

**রামসাধুর আশ্রম:** নড়িয়ার ডিঙ্গামানিক গ্রামে রামসাধুর আশ্রম রয়েছে। গোলকচন্দ্র সার্বভৌম ও কালিকশোর স্থৃতিরত্ন মহাশয়ের বাসস্থান এই গ্রামে। রামঠাকুরের আশ্রমের শাখা চাঁদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে সুদৃশ্য মঠ, সমাধিসৌধ ও বিশাল মন্দির রয়েছে। প্রতিবছর এখানে মেলা বসে।

**রুদ্রকর মঠ:** শরীয়তপুর সদর উপজেলার রুদ্রকর ইউনিয়নে অবস্থিত। দেড়শত বছরের পুরনো এই মঠটি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোক আসেন।

**গাজী-কালুর আন্তর্বালা:** নড়িয়া উপজেলো সদর থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে পৌরসভার মধ্যেই বাশতলা এলাকায় মূলফৎগঞ্জ বাজারের কাছাকাছি গাজী-কালুর আন্তর্বালা বলে কথিত একটি জায়গা রয়েছে।

**হযরত মজিদ শাহ (রহ.) এর মাজার:** নড়িয়া উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নে এ-বিখ্যাত মাজারটি বা অবস্থিত। এখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়।<sup>১৪</sup>

**জান শরিফ বা সুরেশ্বরী হজুরের দরগাহ:** শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার ইউনিয়নের সুরেশ্বর নামক এলাকায় বিখ্যাত এ-দরগা অবস্থিত।

**চিশ্তীনগর দরবার শরিফ:** নড়িয়া উপজেলার পশ্চিমসার গ্রামে অবস্থিত। নড়িয়া থেকে ডিঙ্গামানিক ইউপি ১০ কিলোমিটার নড়িয়া- ঘরিসার সড়ক আবদুল পাগলার মোড় ৯ কিলোমিটার। মোড় থেকে দক্ষিণ দিকে ইউনিয়ন পরিষদ ১ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান।

**আবদুল পাগলের দরবার শরিফ:** ঘড়িসার বাজারের আগে পাগলার মোড়ে নেমেই আবদুল পাগলের দরবার শরিফ। নড়িয়া থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরত্ব। গ্রাম বাহির কুশিয়া, পো. ঘড়িসার, থানা নড়িয়া।

**জয়মিয়া হজুরের দরবার শরিফ:** নড়িয়া থেকে জয়মিয়া হজুরের দরবার শরিফ এর দূরত্ব প্রায় ১৫ কিলোমিটার। গ্রাম তেলীপাড়া, পো: গোলার বাজার, ইউনিয়ন চামটা, থানা নড়িয়া।<sup>১৫</sup>

### জ. শুক্রতপূর্ণ অঞ্চল ও হামের পরিচয়

শরীয়তপুর জেলার অনেকে বিখ্যাত অঞ্চল, হান ও গ্রাম রয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি, পান্তি ও সমাজসেবায় এই সব সেকালে খুবই গৌরব বহন করত। এইসব গ্রামের প্রায় শতবর্ষ আগের পরিচিত পাওয়া যায় নড়িয়ার জপসা গ্রামের অধিবাসী অনন্দনাথ রায়ের 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে। সেখান থেকে মূল তথ্য গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রামের পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল।

**কার্তিকপুর:** শরীয়তপুরের পুব দিকে মেঘনানদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। বারভুইয়াদের দমনের উদ্দেশে ফতে মহম্মদ নামে একজন সৈনিক এই গ্রামে আসেন। তিনি মানসিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবলপ্রতাপ কেদাররায় মানসিংহ বাহিনির হাতে শহিদ হলে, তাঁর বিশাল জমিদারি ভাগ হয়ে যায়। মূল বিক্রমপুর দখল পান বৈদ্য রঘুনন্দন দাশচৌধুরী; একাংশ কার্তিকপুর পেলেন শেখ কালু; অপরাংশ ইদিলপুর কায়স্ত রঘুনন্দন গুহ চৌধুরীর হস্তগত হইল। শেখ কালুর সঙ্গে আত্মায়তা করে ফতে মহম্মদ কার্তিকপুর বাস করতে থাকেন।



কার্তিকপুর জমিদারবাড়ির প্রবেশপথে প্রধান সমষ্টিকাৰী

ঘটনাচক্রে ফতে মহম্মদের ছেলের সঙ্গে রঘুনন্দন দাশচৌধুরীর বাড়ির এক মেয়ের বিয়ে হয়। তখন চৌধুরীরা জামাতাকে ৩৬ খানা গ্রাম লিখে দেন। এইভাবে ফতে মোহম্মদের ছেলে জমিদার হন। এই মেয়ের ঘরে যে ছেলে হয় তার নাম রাখা হয় মাইনদিন। তিনি মুসিং চৌধুরী পদবি ধারণ করেন। মাইনদিন দুই নাবালক ছেলে রেখে

মারা যান। তাঁহার দুই পুত্র নেমুন্দি ও ইমামদী। পুত্ররা অপ্রাপ্তবায়স্ক বিধায় জামিদারি ন্যস্ত হয় একই গ্রামের রঘুনন্দন সেনের হাতে। মুসী ইমামদীনের তিন পুত্র, মনিবন্দী, ওয়াহিনদী ও ফৈজঙ্গী। ফৈজঙ্গীর পুত্র ফেরউদীন (দানুমিএও) হিন্দুধর্ম অনুরক্ত ছিলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও হিন্দুর ন্যায় মহোৎসবাদি কাজ করলে পুণ্য হয় বলে তিনি ধারণা করতেন। তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, দুর্ভাগ্যক্রমে মোসলমানগৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। ওয়াহিনদীর পুত্র করিমদী চৌধুরী, ফেরউদীনের কন্যা ওমরজান বিবিকে বিয়ে করেন। করিমদীর পুত্র নাজিমদীন চৌধুরী, শালিখাঁর মুসী তাজিমদীনের উপদেশে এই সকল হিন্দুয়ানি কাজ থেকে বিরত থাকেন। করিমদী চৌধুরীর স্বের যাত্রা গানের দল ছিল। কার্তিকপুর নিবাসী গোপীকান্ত চক্রবর্তী এই দলের গান লিখতেন। নাজিমদীন চৌধুরীর সময়ে কার্তিকপুরের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি ১২৮৪ সালে কার্তিকপুর থেকে ঘড়িসার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও ১২৭৩ সালে ইংরাজি মাইনের ক্ষুল প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকার নবাব আবদুল গণি সাহেবের পুত্র নবাব অহসানউল্লাহ সঙ্গে নাজিমদীন চৌধুরীর এক মেয়ের বিয়ে হয়। তাঁর গভেই জন্ম নেন নবাব আহসানউল্লা। মুসী ইমামউদীন একবার নবদ্বীপে গিয়ে নিজের গ্রামের নাম বললে সেখানকার এক পশ্চিত জানতে চাইলেন ওটি বিক্রমপুর কার্তিকপুর কিনা এবং সেই গ্রামে রঘু বিদ্যাবাগীশ বাস করেন কিনা। এই কথা শুনে তিনি নিজ গ্রামের রঘু বিদ্যাবাগীশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দেশে ফিরে তাঁকে ডেকে এনে সম্মান জানান। মুসী চৌধুরীর বংশ এখানেও সম্মানিত। পরগনার নাম কার্তিকপুর হলেও কার্তিকপুর নামে কোন গ্রাম নেই। মুসী চৌধুরীদের বাসস্থান হোগলাই কার্তিকপুর বলিয়া খ্যাত। কার্তিকপুরে একটি বাজার রয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, জমিদার মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী, রায়বাহদুর রাইমোহন সেন ও শ্রীমতুকুমার দাসগুপ্ত, শিল্পপতি-শিক্ষামুরাগী জয়নুল হক শিকদার ও প্রাক্তন এমপি এম.এ. রেজা এখানে জন্মগ্রহণকরেন।

**হোগলা:** এটিও ভদ্রপ্রধান গ্রাম। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের বাস ছিল। বৈদ্য বংশের দুর্গাপ্রাসাদ দাশ জনহিতকর কাজ করেছেন। তাঁর ছেলে দীনবন্ধু রায় বিখ্যাত লোক। গোবিন্দচন্দ্র দাশ মুসেফকোর্টের উকিল। সেন ও সরকার পরিবার সাধারণের পরিচিত। কবিরাজ মহেন্দ্রচন্দ্র সেন সুশিক্ষিত ও রজনীকান্ত সেন একজন লেখক। রঘু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য বংশের লোক। এই গ্রামের গোলকচন্দ্র সর্বভৌম প্রধান নৈয়ায়িক পশ্চিত।

**মগর:** প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার অতুল প্রসাদ সেনের পৈতৃক নিবাস।

**রাজনগর:** বৈদ্যপ্রধান স্থান। কীর্তিনাশ নদীতে নিমজ্জিত রাজা রাজবল্লভের বাসস্থান এখানে ছিল। ‘ফরিদপুরের ইতিহাস’ গ্রন্থের লেখক আনন্দনাথ রায়, ‘ঢাকার ইতিহাস’ গ্রন্থের রচয়িতা যতীন্দ্রনাথ রায় ও ঢাকার বিশিষ্ট উকিল রাজনীকান্ত গুপ্ত এদের জন্মস্থান। এখানকার অভয়া ও শিবলিঙ্গবিখ্যাত।

**রাহাপাড়া ও শালদহ:** পালং থানার অন্তর্গত রাহাপাড়া ও শালদহ গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্ত বাস করিয়া থাকেন। রাহাপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার বিখ্যাত ছিল। একসময় জলাভূমি ছিল। শালদহনিবাসী গোকুলচন্দ্র দে একজন সম্পন্ন লোক ছিলেন।

**চাকদহ:** কার্তিকপুরের প্রাচীন জমিদারির বংশধরগণ এই তিন গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ কীর্তিধর বসু রাজা লক্ষণ মাণিক্যের নিমজ্ঞন রক্ষা না করায় সমাজচ্ছ্যাত হন। কীর্তিধরের বংশীয় কৃষ্ণগোবিন্দ রায়চৌধুরী কার্তিকপুর সুজাবাদের মালিক ছিলেন। সদর রাজস্ব আদায় না করায় কারারাঙ্গন হন। পরে প্রচুর খাদ্যগ্রহণের কৃতিত্বের জন্য মুক্তি পান এবং পুরস্কারস্বরূপ কার্তিকপুরের অঙ্গর্গত চাকদহ, ভূমিখাড়া, তেলিপাড়া, বারৈজসল, মাইসার, পাচাঁও, সুরেশ্বর এই সাতখানি মৌজা নিক্ষেপ লাভ করেন। কৃষ্ণগোবিন্দ রায়চৌধুরী, চাঁদরায় ও কেদাররায়ের অধীনে কার্তিকপুরের ভূম্যধিকারী ছিলেন। কেদার রায়ের পতনের পর, মানসিংহ তাঁর সেনাপতি শেখ কালুকে এই স্থান দান করেন। সে-সময়ে কৃষ্ণগোবিন্দকে মাত্র এই সাতখানি গ্রাম দান করে বাকিগুলো শেখ কালুকে প্রদান করা হয়। এঁদের বাড়িতে প্রাচীন দালান ও পিতলের লক্ষ্মীগোবিন্দ বিহু এবং বিশাল দিঘি ছিল। বাড়ির চারদিকে পরিখা ছিল। চাকদহের ঠাকুরতা উপাধির ত্রাক্ষণরা বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশের রেবতীকান্ত ঠাকুরতা বি-এল, মুসেফ ছিলেন। বিশিষ্ট গ্রন্থকার বিপিনবিহারী ঘটকের বাড়ি ছিল দক্ষিণপাড়া।

**নলতা:** নলতা গ্রামে একটি বৌদ্ধমূর্তি ছিল।

**মাহমুদপুর:** এই গ্রামে বৈদ্য চৌধুরীগণ বাস করতেন। এই বংশের বসন্তকুমার চৌধুরী কবিরঞ্জন কলকাতায় কবিরাজ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

**পশ্চিমসার:** এই গ্রামে বহু পিণ্ডি বাড়ির বাস। শিবচন্দ্র দাস বিখ্যাত ছিলেন। শরৎচন্দ্র দাশ, বি-এল ফরিদপুর জজকোটের শীর্ষস্থানীয় উকিল ছিলেন। ‘সার’ শব্দ যোগ থাকায় এই স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলে অনুমান করা যায়।

**ঘড়িসার:** এই গ্রাম প্রসিদ্ধ হাট ছিল। এখানে বহু ব্যবসায়ী লোকের বাস। এই গ্রামের পাশে বারুণী ও অশোকাষ্টমীর সময়ে বহু লোক স্নান করে ব্রহ্মপুত্র-স্নানের পুণ্য লাভ করত। কমলাপুর ও বগিধালীর স্নান নামে তা খ্যাত ছিল। স্নানের সময়ে এখানে মেলা মিলিয়া থাকে। এই স্থানেও বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলে ধারণা করা যায়।

**মূলফৎগঞ্জ:** মূলফৎগঞ্জে একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। একটি মদ্রাসা, একটি পাঠশালা ও শাখা পোস্টফিস ছিল। এখানকার মদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলবী মহম্মদ ফাজেল হাফেজ সাহেব আরবি ও ফারসি ভাষায় অতিশয় বিদ্঵ান ছিলেন। সমগ্র কোরান তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। এখন এই স্থান নদীগভৰ্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

**গোড়াগাছা:** ইংরেজ অধিকারের প্রথম সময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে গোকুলগঞ্জ নামক স্থানে প্রথম থানা স্থাপিত হয়। পরে প্রাচীন পদ্মার ভাঙ্গনে এই গ্রাম ধসে গেলে থানা মূলফৎগঞ্জে নেওয়া হয়। পরে মূলফৎগঞ্জ ভাঙ্গনের শিকার হলে থানা স্থানান্তরিত হয় পোড়াগাছা গ্রামে। তবে থানার নাম মূলফৎগঞ্জ বলবৎ থাকে। এই গ্রামের কবিরাজ রামলোচন সেন কবীন্দ্র, বৈদ্যবংশীয় পিণ্ডি ছিলেন।

**কেদারপুর:** ইতিহাসখ্যাত কেদাররায় একটি বিশাল বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নামেই এই গ্রামের নাম হয়। বাড়িটি তিনি পুরোপুরি নির্মাণ করে যেতে পারেন নাই।

বাড়ির চারপাশে যে পরিখা খনন করেছিলেন তার ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। একে কেদাররায়ের বাড়ির বেড় বলে। এক সময়ে এই গ্রামে গোবিন্দ সাহা নামে এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে মহাসমারোহে ঝুলন্যাত্তা হতো।

**ধামারণ:** এই গ্রামের দেওয়ান উপাধিধারী তালুকদার মহেশচন্দ্র সেন বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কার্তিকপুরের মুঢ়ী চৌধুরীগণের দেওয়ানি কাজ করে যথেষ্ট সম্পত্তির মালিক হন। এই বাড়িতে আষ্টধাতুর কালিমূর্তি ছিল। তাঁর কার্তিকপুরের বাড়ি নদীগার্ডে বিলীন হলে তিনি ধামারণ গ্রামে চলে আসেন। এই গ্রামে একটি সূর্যমূর্তি ছিল। প্রতিবছর এখানে মেলা বসত।

**শ্রীনগর >ফতেজঙ্গপুর:** গ্রামের প্রাচীন নাম শ্রীনগর। সন্ত্রাট আকবরের শানসকালে এখানে একজন ফৌজদার বাস করতেন। ১৬০২ সালে রাজা মানসিংহের সহকারী কিলমক্ বিক্রমপুর শেষ আক্রমণের সময়ে কেদাররায়ের কাছে পরাম্পরা হয়ে এই শ্রীনগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মানসিংহ তাঁকে উদ্বারের জন্য এই গ্রামে আসেন। এই যুদ্ধে মানসিংহের সেনাধ্যক্ষ ফতে মোহাম্মদের হাতে কেদাররায় আহত হন ও পরে মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধের স্মৃতিস্থলপ মানসিংহ শ্রীনগরের বদলে এই স্থানকে ফতেজঙ্গপুর নাম দেন। একশত বছর আগে এই গ্রামের পুকুর থেকে ধাতুনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। অঞ্চলিক শতাব্দীর মাঝামাঝি এই এলাকা ছিল রাজা রাজবল্লভের জমিদারির অঙ্গর্গত। রাজবল্লভের সহযোগিতায় চন্দ্রশেখর জ্যোতির্বিদ প্রথম এই স্থানে বাস করতে আসেন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে চন্দ্রশেখর এখানকার জঙ্গল পরিক্ষার করে বাসোপযোগী করেন। এক সময়ে এই জ্যোতির্বিদদের পঞ্জিকার গণনানুসারেই বঙ্গের দিনক্ষণ নির্ধারণ ও ধর্মাচার পালন করা হত। বঙ্গের পঞ্জিকা বিক্রমপুরের পঞ্জিকা অর্থাৎ ফতেজঙ্গপুরের পঞ্জিকার সময় ধরেই গণনা করা হত। চন্দ্রশেখরের অগাধ পাণ্ডিত্যে মুঠু হয়ে রাজবল্লভ তাঁকে এই গ্রাম দান করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মদনমোহন বিদ্যাভূষণের জন্মস্থান শ্রীনগরের নাম ফতেজঙ্গপুর হলেও, এর একাংশ নগর নামে পরিচিত। ঢাকার জজকোর্টের একসময়ের খ্যাতিমান উকিল রজনীকান্ত গুপ্ত এই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জ্যোতির্বিদদের বাড়িতে প্রাচীন দালান ও বিগ্রহ ছিল। এখানে নাককাটা বাসুদেবের প্রস্তর মূর্তি আছে।

**কানুরগাঁও > সিরঙ্গল:** শ্রীনগরে কতিপয় সৈনিক বাস করত। এর কাছাকাছি কানুরগাঁওতে সেনানিবাস ও কেল্লা স্থাপন করেন বাদশাহ সেলিম জাহাঙ্গীর। বাদশাহ সেলিমের নামানুসারে এর নাম হয় সেলিমনগর। আধিলিক উচ্চারণে তা সিরঙ্গলে পরিণত হয়েছে। সিরঙ্গলের বাগবাড়ি নামক স্থানে ওই কেল্লা ছিল। কানুরগাঁয়ে বহু পণ্ডিত বাস করতেন। কানুরগাঁয়ের বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চ চতুর্বৰ্তী, তৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র সার্বভৌম, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ, হরিদাস বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতে নাম উল্লেখযোগ্য। কানুরগাঁও রাজ্যশাসনীর কুশারী এবং বটব্যাল শ্রোত্রিয় ও কয়েক ঘর কুলীনবংশজ বাস করতেন। বারেন্দ্রশ্রেণীর রায়পরিবার কানুরগাঁওর অঙ্গর্গত বকসীবাজার পঞ্জীয়তে বাস করতেন। গৌরসুন্দর রায় ছিলেন ঢাকার শ্রেষ্ঠ মোজ্জার। অনেক জমি ক্রয় করে তালুকদার বলে গণ্য হন। এর ছেলে গোবিন্দচন্দ্র রায় আগ্রায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কবিতা ও গান লিখতেন। ‘নির্মল সলিলে বিহুছে

সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও ।' কিংবা 'কত কাল পরে বল ভারত যে, দুখ সাগর  
সাঁতারি পার হবে ।' প্রভৃতি গান তাঁর রচনা । গোবিন্দচন্দ্রের ছেট ভাই ঢাকা  
জজকোর্টের উকিল আনন্দচন্দ্র রায় দেশজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেন । উপন্যাসিক আবু  
ইসহাকের জন্মস্থান । এর পাশেই সাতপাড় গ্রামে বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ, সমাজকর্মী এবং  
এককালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য ডা. কে এ জলিল জন্মগ্রহণ করেন ।

**মসুরা:** মহামহোপাধ্যায় তারণীচরণ শিরোমণির জন্মস্থান । এখানে উপমহাদেশের  
দ্বিতীয় বৃহত্তম শিবলিঙ্গ মূর্তি পাওয়া গেছে ।

**মূলনা:** জাজিরা উপজেলায় অবস্থিত । শরীয়তপুরে বেগুন, করলা, টমেটো,  
কাকরোল, সীম, ধূন্দল প্রভৃতি শাকসবজি এবং ধনিয়া, কালোজিরা ও মটরসুটি  
উৎপাদনের প্রধান এলাকা । বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও খুলনা থেকে মৌচাষীরা রবি  
মৌসুমে এসে এখানে বাঞ্ছে মৌমাছি পালন ও প্রচুর মধু উৎপাদন করে । এখানে  
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, উপসহকারী কৃষি অফিসার কোয়ার্টার, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও  
পরিবার কল্যাণকেন্দ্র ও একটি হাইস্কুল আছে ।<sup>১০</sup> দেশের প্রধান বন সংরক্ষক বনবিদ  
মো. ইউনুস আলী এখানে জন্মগ্রহণ করেন ।

**শ্রীপুর:** চাঁদরায় ও কেন্দাররায়ের আদি বাসস্থান ।

**লোনসিংহ:** এই গ্রামে অনেক ব্রাক্ষণ বাস করতেন । কয়েক ঘর কায়ত্রি ছিল  
দাসবংশীয় । এই বংশের বহুলোক ডেপুটি কালেষ্টারের চাকরি করতেন বলে তাঁদের  
বাড়িকে ডেপুটি বাড়ি বলা হত । এঁরা আগে কার্তিকপুরের সিংহলমুড়ি গ্রামে বাস  
করতেন । পরে বুন্নগ্রামে বাস আসেন । নদীভাঙ্গের শিকার হয়ে এই গ্রামে আসেন ।  
এই দাসবংশের আদিপুরুষ রামকেশব ঢাকার নবাববাড়ির উকিল ছিলেন । তাঁর দুই  
পুত্র, গঙ্গাহরি ও কালীশঙ্কর । গঙ্গাহরি ঢাকার বিখ্যাত জিমিদার জীবনবাবুর দেওয়ান  
এবং কালীশঙ্কর ঢাকা কালেষ্টেরেটের মীরমুস্তাফাদে কাজ করতেন । গঙ্গাহরির পুত্র  
রামচন্দ্রদাস ও গৌরচন্দ্র দাস । কালীশঙ্করের পুত্র অভয়চন্দ্র দাস ও বঙচন্দ্র দাস ।  
১৮৪১ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে চট্টগ্রামে ডেপুটি কালেষ্টেরের পদে নিযুক্ত হন এবং  
বিশেষ ক্রিত্তে জন্য সেই সময়ে সর্বোচ্চ বেতন ৬০০ টাকার উপরে ১০০ টাকা বেশি  
বেতন পেতেন । তাঁর ভাই গৌরচন্দ্র দাসও ডেপুটি কালেষ্টের হন । রামচন্দ্র দাস তাঁর  
দক্ষতার জন্য 'আলা ডেপুটি' হিসেবে গণ্য হতেন । রামচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র উভয়েই রায়  
বাহাদুর উপাধি লাভ করেন । অভয়চন্দ্র দাস ঢাকার এসিস্ট্যান্ট কশিনার ছিলেন ।  
ঢাকার অনেক সৎকাজে তিনি যুক্ত ছিলেন । তিনি রায়বাহাদুর উপাধি পান । তাঁর মৃত্যুর  
পর ঢাকা নথুক্রুক হলে তাঁর তৈলচিত্র রক্ষিত হয় । লোনসিংহ গ্রামের স্কুল, রাস্তা,  
পোস্টাফিস, দাতব্য ডাঙ্কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর স্মৃতিরক্ষায় ঢাকায় তাঁর নামে  
অভয় দাস লেন নামকরণ করা হয় । অভয়দাসের ছয় ছেলে মধ্যে প্রাণকুমার দাস ও  
ললিতকুমার দাস ডেপুটি কালেষ্টের এবং অক্ষয়কুমার দাস মুসেফে ছিলেন । প্রাণকুমার  
দাসের মেয়ে আমেদিনী ঘোষ কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন । প্রাণকুমারের পুত্র  
লালবিহারী দাসও ডেপুটি কালেষ্টের হন । গৌরচন্দ্র দাসের পাঁচ ছেলের মধ্যে চন্দ্রকুমার  
দাস ও সূর্যকুমার দাস ডেপুটি কালেষ্টের হন । প্রসন্নকুমারের পুত্র রাজবিহারী দাস 'ঢাকা

প্রকাশ' ও 'সারস্বতপত্রে'র সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক ছিলেন। যাত্রা ও কবিগান রচয়িতা ও 'কবিতাকুসুম' প্রস্ত্রপণেতা রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামের লোক ছিলেন। লোনসিংহ স্থানের পাঞ্জিৎ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লোনসিংহ থেকে ১৮৬৯ সালে 'অবলা-বাঙ্কা' নামে সাঙ্গাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই দ্বারকানাথ পরে কাদম্বিনী বসু বিএ-র পাণিশ্রান্ত করেন। তখন এই স্থানে উচ্চইংরেজি বিদ্যালয় ও টেলিফ্রাফ অফিস স্থাপিত হয়। নড়িয়ার ঘটক চৌধুরীগণের গুণানন্দী পরগনা নিলামে ক্রয় করে এরা স্বদেশে আধিপত্য বৃদ্ধি করে। ঘটক করুণাচরণ বিদ্যাসাগর ও দুর্গাচরণ তর্কলঙ্কার প্রভৃতি এই গ্রামের প্রসিদ্ধ লোক। এই গ্রামের কৃষ্ণকান্ত শীল চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক শুনক কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কারের ছেট ছেলের বৎশরণগণ, নড়িয়া ও লোনসিংহ গ্রামে বাস করতেন। এই বৎশে বহু পাঞ্জিৎের জন্ম হয়, বৈদিক কার্যে তাঁরা দক্ষ ছিলেন। এন্দের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ শিরোমণি, গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি উল্লেখযোগ্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত কালাপানি ভোগকারী পুলিনবিহারী দাস, বৈজ্ঞানিক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখে খ্যাতিমান ব্যক্তির জন্ম এই গ্রামে।

**নড়িয়া:** কীর্তিনাশা নদীর ভাঙ্গনে নড়িয়া গ্রামের উত্তর পাশের আট ভাগের সাত ভাগই বিলীন হয়ে যায়। ফলে গ্রামিটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হয়ে পড়ে। উত্তর প্রাঞ্জলেও আলা ফুলবাড়িয়া নামের বন্দরটিও নদীগঙ্গে তলিয়ে গেছে। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজে যে কয়েকটা মেল রয়েছে তার মধ্যে 'নরিয়া মেল' হয়েছে এই গ্রামের নামানুসারে। কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, 'গঙ্গে গঙ্গাধরমেলো নরিয়া নাম বিশ্রান্ত।' এই গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর দুই পুত্র, যদুনাথ পাঞ্জিৎ ও রঘুনাথ বাচস্পতি। বাচস্পতির কল্যাকে রাঢ়বাসী মাধ্যই মেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বিয়ে করেন। বাচস্পতির দৌহিত্রগণ ঘটক ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করে এই গ্রামে বাস করেন। রঘুনাথ বাচস্পতির তিন পুত্র, তাঁদের উপাধি ছিল, ঘটক সার্বভৌম ঘটক শিরোমণি এবং ঘটক চক্ৰবৰ্তী। উপাধি ছাড়ি এন্দের প্রকৃত নাম জানা যায়নি। বাচস্পতির বড়ভাই যদুনাথ পাঞ্জিৎ নড়িয়া থেকে নড়াইল ব্রাহ্মণভাস্তা গ্রামের অধিবাসী হন। সার্বভৌমের পুত্র ঘটকবৰায় বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের পক্ষে মোগল সেনাপতি মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মানসিংহ জয়ী হলে ঘটকবৰায়ের ব্রহ্মত্ব বাজেয়াঙ্গ করেন। পরে রায়ের পৌত্র ইন্দ্রনারায়ণ এই ব্রাহ্মণত্ব উদ্ধার করেন। রায় উপাধি ধারণের করে তিনি ঘটককালি ব্যবসায় ছেড়ে দেন। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণ রাজস্ব বৰ্দ্ধ করে দিলে নবাবসৈন্যরা তাঁদেরকে আক্রমণ করে। রায়গণও নবাবসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। তাঁদের বাড়িঘর লুট হয়ে যায়। তাঁরা অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। এ-ব্যাপারে একটি গ্রাম্য গীত রচিত হয়, তা এমন-

'তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রেয়া

নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কু বনে রইয়া,

ঘটক পলাইলৱে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে ।

দিন নাই ক্ষণ নাই রাত্রি অন্ধকার,

একুশ দিনে সোনার লক্ষ হৈল ছারখার

ঘটক পলাইল রে-ইত্যাদি

.... . . . . তেটেলের পাতে,  
রঘু ঘটক তীর ছারে ডান হাতে বা হাতে  
ঘটক পলাইল রে-ইত্যাদি,

\* \* \*

লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুর লৈয়া ফিরেন বাড়ি বাড়ি  
\* \* \*

গোপালের বালাখানা করল চুরমার ।

ঘটক পলাইল রে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে ।'

নড়িয়া পত্তিপ্রধান গ্রাম । এই গ্রামের যাবতীয় উন্নতি ঘটকচৌধুরী বংশের লোকেরা করেছে । এই গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুসেক রেবতীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিএল ও উকিল হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএল রয়েছেন । শঙ্খচন্দ্র, শিবচন্দ্র, বৈরবচন্দ্র, হরিপ্রসাদ রায়, উকিল রজনীকান্ত রায়ঘটক, যোগেশচন্দ্র রায় ও চিন্তাহরণ রায় প্রমুখ বিখ্যাত লোক এই গ্রামে বাস করতেন । বঙ্গের একজন প্রধান মন্ত্ৰ শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছেটভাই সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিএল এই গ্রামে বাস করতেন । শ্যামাকান্ত পরে সোহং স্বামী নাম নিয়ে সাধক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন । নড়িয়ার ভাঙ্গা অংশ পরে জেগে উঠে বসাকের চর নাম ধারণ করে । এখানেই ছিল আলা ফুলবাড়িয়া গ্রাম । আনন্দনাথ রায় মনে করেছেন, 'নবীপুর নামে যে একটি গ্রাম ছিল, যথায় সর্বপ্রথম ত্রিনাথের মেলা বসে, বসাকের চর মধ্যে কতকটা ঐ নবীপুরের পরন্ত ভূমির অংশ হত্তে পারে ।' সিদ্ধেশ্বৰীতলা ও গোপালদেব প্রত্যক্ষ দেবতা বলে মান্য করা হয় । এই গ্রামে হরিঠাকুরের যাত্রার দল ছিল । তাঁর ছেলে চন্দ্রকান্ত ঠাকুর এই দল চালাতেন । বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির জেলা শাখার সভাপতি শফিউল বাশার স্বপন জন্ম এই গ্রামে ।

**মহিসার:** দক্ষিণ বিক্রমপুরের এককালীন প্রখ্যাত স্থান । চাঁদঁরায়, কেদার রায়ের নির্দেশে এখানে পানীয় জলের জন্য কয়েকটি দিঘি খনন করা হয়েছিল বলে জানা যায় । প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ হতে এখানে এক সঙ্গাহের মেলা হয় । দিগন্ধির সন্ধ্যাসীর মন্দিরও এখানে রয়েছে । সুপুসিন্ধ নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায় রত্নের বাসস্থান । এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের জন্ম এখানে ।

**ভোজেশ্বর:** ভোজেশ্বরও বহুকাল যাবৎ বিখ্যাত ছিল । এই গ্রাম বেদগর্ভ সেনের বংশধরগণের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় । যে অংশ জপসার নীলকণ্ঠ সেনের ভাগে পড়ে তা ছয়পাড়া ও লালারবাগ নামে পরিচিত । ভোজেশ্বরের অপরাংশ রাজনগরের শ্রীকৃষ্ণ সেনের বংশের হাতে পড়ে । রাজবল্লভের বংশধরগণ এই গ্রামে হাট বসায় । এই হাটে বিস্তর কাপড় ও গামছা বিক্রয় হত । ভোজেশ্বরের পালগণ খুবই সম্পদেও অধিকারী ছিলেন । রাজকুমার পাল, হরলাল পাল এবং হীরালাল পাল প্রমুখ এই বংশের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন । নদীভাঙ্গনের শিকার হয়ে এরা মসুরা গ্রামে চলে যান । নতুন বাড়িতে পুরুর কাটা উপলক্ষ্যে তাঁরা কালো পাথরের বাসুদেব মূর্তি নির্মাণ করেন । ভোজেশ্বরের তহবিলদার বংশ বিখ্যাত ছিল । রাজ-পরিবারের অনুগ্রহে তাঁহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তি লাভ হয় । তাই তাঁরা ভুঁঝা নামে পরিচিত হন । বাড়িতে শিবমন্দির ও দূর্মাদালান এবং

জলাশয়ে শান্তিধানে ছিল। এই গ্রামের ঘোপাবৎশে রাধানাথ কীর্তনীয়া খ্যাতিমান গায়ক ছিলেন। তাঁর একটি যাত্রাদলও ছিল। ব্রাহ্মণ সম্প্রদার মধ্যে ভোজেশ্বরের বৈদিক, মসুরার মুখটীগণ বিখ্যাত। এছাড়া মৌলিক উপাধিধারী ব্রাহ্মণও ছিলেন।

**মসুরা:** মসুরা গ্রামে একটি দিঘি রয়েছে। এটিও রাজবংশভূরের কীর্তি বলে ধারণা করা হয়। এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ ও তিলির বাস ছিল। এক সময়ে মসুরার তিলিগণ ধনে-মানে তাঁদের সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তিলিরা সাধারণত বৈষ্ণব হলেও মসুরার পাল উপাধিধারী তিলিরা শাক্ত সম্প্রদায়ভূক্ত। এদের বাড়িতে কালীপূজা ও দুর্গাপূজায় ব্যাপক আয়োজন থাকত। মসুরার মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটী বিএল মুসেফ ছিলেন এবং বরদাকান্ত মুখটী সাহিত্যচর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

**আক্ষা:** ভবানীশঙ্কর ঘোষাল নামে দুই ব্যক্তি আক্ষা ও ভড়গ্রামে বাস করতেন। তাঁদেরকে পৃথক বোঝানোর জন্য ঘোষালের বদলের গ্রামের নাম অভিধা দেওয়া হয়। আক্ষা গ্রামের ঘোষাল বৎশের কালীকান্ত চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর জন্ম ১২২০ সনের আশ্বিন মাসে। কালীকান্ত নিজের চেষ্টায় পারস্যভাবা শিখে সেটেলমেট আফিসে পাঁচ টাকা বেতনে চাকরি পান। পরে প্রথম শ্রেণির দারগা পদে উন্নীত হন। একসময় গোয়েন্দা কর্মকর্তা হন। কালীকান্তের পুত্র তরণীকান্ত চক্রবর্তী সাহিত্যচর্চা করতেন। সেকালে নানান মাসিক পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। কালীকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র মহিম চক্রবর্তী আসামের সহকারী কমিশনার ছিলেন। ভোজেশ্বর নদী সিকন্দ হলে সেখান থেকে এক ঘর বৈদিক এই গ্রামে বাস করতে আসেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণের পরিচয় এই গ্রামে পাওয়া যায়। এই গ্রামে শুন্দরাও বাস করতেন।

**বিঝারি:** এই গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন। এঁদের মধ্যে ঘোষাল ও বাড়ুরীগণ তালুকদার ও প্রাচীন অধিবাসী। কায়স্ত করবৎশ ও তালুকদার। ঘোষালদের আদিম নিবাস ছিল নিকটবর্তী কান্দাপাড়া গ্রাম। সেখানে ডাকাতের উৎপাতে তাঁরা বিঝারিতে চলে আসেন। এই গ্রামের পুরু খনন করার সময় পাথরের মূর্তি ও ইট পাওয়ায় এর প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। এটি রাজনগরের জমিদারির অঙ্গর্গত ছিল। এই জমিদারির একাংশ কিনে ঢাকার কাদের বক্স দারগা কাছারি স্থাপন করলে ঘোষালদের সঙ্গে বিবাদ হয়। দারগা লাঠিয়াল পাঠিয়ে ঘোষালবাড়ি লুঠ করে রামদয়াল ও রামজীবন ঘোষালকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তারা পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। এই গ্রামে হাট, গ্রাম্য রাস্তা ও কালীমূর্তি ছিল। একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল। পরে সেটি উপসী গ্রামে উঠে গেলেও বিঝারি স্কুল নামেই পরিচিত হয়। এই গ্রামে পূর্ববর্সের সুপ্রসিদ্ধ কথক ও সংগীত রচয়িতা কৃষ্ণকান্ত পাঠক মহোদয়ের জন্ম। তাঁর লেখা অনেক ভাবোদীপক গান হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজেই প্রিয় ছিল। দক্ষিণ বিজ্ঞমপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অবিবেশন এই গ্রামে হয়েছে। সুধাংশুশেখের মুখাপাধ্যায় এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোগ্তা। বিঝারিতে বহু সংগীত রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। গান-বাজনার আলোচনাও যথেষ্ট ছিল। চন্দ্রকুমার ঘটক রচিত ‘অষ্টবজ্ঞ মিলন’ ও ‘দিগম্বরী’ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের ডেঙ্গু ও ক্ষতচিকিৎসার জন্য বিখ্যাত ছিল। জপসা গ্রামের প্রধান শিল্পী প্রসন্ন হঙ্গল এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

**লাকার্ডা:** পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বিপুলী সিরাজ শিকদার, শিল্পী শামীম শিকদার, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মশিহুর রহমান শিকদার, নূরুল হক শিকদার, লুৎফুর রহমান শিকদার, খানবাহাদুর খলিলুর রহমান শিকদার এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এ-গ্রামে কমপক্ষে ১৫ জন ডাঙ্গার, ১৫ জন ইঞ্জিনিয়ার, ২৫জন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাসহ প্রায় একশত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী পেশাজীবী রয়েছেন। এখানে বেশ কিছু পুরাতন ইমারত আছে যা অস্ত্র দুইশত বছরে স্মৃতি বহন করে।

**ভড়া:** এই গ্রামের ঘোষাল পরিবার প্রাচীন তালুকদার, তাঁদের নামের শেষে গ্রামের নামানুসারে ভড়া শব্দ ব্যবহৃত হত। ডুমুরিয়া হইতে ঘনশ্যাম ঘোষালের পিতামহ এই স্থানে বসতি গড়েন। এই গ্রামে সোহাগ আন্দী নামে একটি জলাশয়ে পাথরের বাসন্দীর মূর্তি পাওয়া গেছে। খোদাই পুরুর নামে আরেকটি জলাশয় আছে, যার মাছ যে কেউ ধরতে পারত। নাম থেকে ধারণা করা যায় যে কোন দানশীল মুসলমান এটি খনন করেন। ভড়াতে দুইটি প্রাচীন মঠ ছিল। একটি মঠ শুধু বংশীয় ঠাকুর মণ্ডল তাঁর মায়ের শুশানে প্রতিষ্ঠা করেন। ঘোষাল পরিবারে রত্নেশ্বর ভড়া ও ভগবান ভড়া পরিচিত লোক ছিলেন। ‘নির্মাল’ পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিএ, দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য-সমিলনীর প্রথম উদ্যোগকারীগণের অন্যতম। রাজেন্দ্রনারায়ণের কাব্যের নাম ‘স্বপ্ন ও তন্দ্রা’।

**চৰআংঞ্চল:** বিখ্যাত স্থান। এখানাকার অনেক অঞ্চলই আজ প্রমন্ডা পদ্মার গর্ভে বিলীন। খানসাহেব উপাধিতে ভূষিত এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের জাতীয় পরিষদ সদস্য খানসাহেব আবদুল আজিজ মুনশি এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড.এ কে এম ফজলুল হকের জন্মস্থান ও এখানেই।

**দুলুখওঁ:** প্রাচীন অধিবাসীর মধ্যে মুখোপাধ্যায় ও চক্ৰবৰ্তী বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামচরণ মুখোপাধ্যায় এই অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ছেলে রেবতীকান্ত মুখোপাধ্যায় ‘প্রাঞ্জল কৰিতা’ ও ‘একটি ফুল’ নামক পদ্যগ্রন্থ এবং ‘অশ্রুবিন্দু’ নামে উপন্যাস রচনা করেন। নদীতে বিলীন হওয়ার পরে জপসা গ্রামের ক’জন ধনী ও শুধু এই স্থানে বাস করতে আসেন। শুধুরা দুলুখওঁের দিঘিরিপাড় বাস করতেন। এতদৰ্থলে মাত্র এই দিঘির জল ব্যবহারযোগ্য ছিল। রাজবলুভের পুত্র রাজা গঙ্গাদাস, তার পুত্র কালীশক্র; তাঁর কর্মচারী রামমণি দেওয়ান এই দিঘি খনন করেন। দেওয়ান বাড়ির ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে।

**চান্দনী:** এই গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্ত পরিবার ছিল প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ কুশারী মজুমদারগণের বাড়িতে প্রাচীন অট্টালিকা ছিল। তাদের গুরু বেলপুরুরের ভট্টাচার্য বংশের কেউ কেউ এই গ্রামে বাস স্থাপন করেন। পরে তাঁরা বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে ফিরে যান। এই গ্রাম সম্পর্কে আনন্দনাথ রায় লেখেন—‘বিশ্বস্তর সুরের তিন কি চারি পুরুষ পরে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভ্যন্তর হয়। তিনি গাভার ঘোষ বংশীয় পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার বিবাহ দেন। ঘোষ সন্তোষ স্থালয়ে প্রস্তান করিলে, চন্দ্ৰদীপ সমাজস্থ অপৰাপুর সামাজিকেরা তাঁহার সহিত সমাজ সামাজিকতা করিতে সীকৃত হন না। পরমানন্দ অনন্যেপায় হইয়া বনিতাসহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া

পুনর্বার ভূলুয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা লক্ষণমাণিক্য তৎপ্রতিকারমানসে বন্ধপরিকর হন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্ত সমাজে চন্দ্রবীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদাররায় এবং ভূষণার মুকুন্দরায়, এই চারি জন দলপতি ছিলেন। ভূলুয়াধিপতি এই চারি জন দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায়, সকলেই তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রূত হইলেন। রাজা লক্ষণমাণিক্যের বাড়িতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে, এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব দল সহ ভূলুয়াতে আগমন করেন, কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করেন না। এই জন্য রাজগণের আদেশে এই উক্ত সামাজিকগণকে কুলচূত করিয়া, ঘটকগণ তৎক্ষণাত্ একটি শ্বেত রচনা করেন, যথা—

‘বেজগ্রামে স্থিতাঃ সর্বে যে চতুর্ম্মণ্ডলে স্থিতাঃ।

চান্দনী চাকুলী যে চ নাস্তি ত্বেং কুলং বুধা’॥

এই কারণে বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ, চতুর্ম্মণ্ডল, চান্দনী ও চাকুলীবাসী শ্রেষ্ঠ কায়স্তগণ কুলচূত হন, এমন কি এই সকল স্থানে যদি কোন কুলীন আসিয়া বাসও করেন, তবে তাঁহারাও কুলচূত হইয়া থাকেন। (বারভূঞ্চা ১৪৯ ও ২৫০ পৃষ্ঠা)। চান্দনী গ্রামের কতকাংশ কীর্তিনাশার উদরসাং হইয়াছে।’

**উপসী:** মহারাজ রাজবন্ধুভ এই গ্রামে নতুন বাড়ি নির্মাণের আগে চারদিকে পরিখা খনন করেন। প্রচুর ইট আমা হলেও বাড়ি আর বানানো হয় নাই। বহুদনি পড়ে থাকায় তা জঙ্গলে পরিণত হয়। এখানে একসময় বাঘ, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস করত। পরে রাজনগর ধ্বংসের পর, তথাকার প্রসিদ্ধ ক্ষণ্ডেব বিদ্যাবাগীশের বংশধর স্বর্গীয় হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য জমিদার ও চন্দ্রশেখর চাকলাদার প্রভৃতি এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। দেভোগের দেওয়ানবংশীয় রজনীকান্ত মুখটীও এখানে চলে আসেন। এই মুখটী মহাশয় পওতি লোক। ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্র তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের উদ্যোগে বিবারীর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় উপসীতে সংস্থাপিত হয়।

**বাবিল্যা:** রাজনগরের ত্রাঙ্কণ কাশ্যপবংশসমূত, নবকুমার চক্রবর্তী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই গ্রামে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করেন।

**কোটাপাড়া:** কোটাপাড়ার বৈদ্য মজুমদারগণের সোনার দেউল গ্রাম থেকে আসেন। সেখানে একঘর প্রসিদ্ধ কায়স্ত মজুমদার বংশও বাস করতেন। নদীতে সোনার দেউল ধ্বংস হলে বৈদ্য মজুমদারগণ কোটাপাড়াবাসী হন। এই বংশের হরিচন্দ্র মজুমদার কেট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্র প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার ‘কৃষিকার্যের মত’ নামক একখানা গ্রহ প্রায় দেড়শ বছর আগে রচনা করেন। বঙ্গদেশে কৃষি বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ হিসেবে এই গ্রন্থকে মনে করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পুত্র নবীনচন্দ্র সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তৃতীয় পুত্র গিরীশচন্দ্র সেন সাবরেজিস্টার ছিলেন। এই বংশের কালীকিশোর সেন ঢাকার বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। রাজনগরের অনেক কাঁসারী এই গ্রামের অধিবাসী হয়েছেন।

**ডিজামানিক:** গোলক চন্দ্র সার্বভৌম ও কালিকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বাসস্থান। এখানে রামসাধুর আশ্রম বিখ্যাত। বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের শরীয়তপুর জেলা শাখার সভাপতি কানাইলাল তালুকদারের জন্য এই গ্রামে।

**কুরাশী:** এই গ্রাম রাজনগরবাসী দেওয়ান রায় মৃত্যুজ্ঞয়ের কীর্তিধন্য। একটি প্রাচীন মঠ, অনেক শিবলিঙ্গ ও দেবালয় ছিল। কয়েকটি দিঘি ও ছিল। রায় মৃত্যুজ্ঞয়ের অথেই এগুলো নির্মিত। এখন আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। জনক্ষতি রয়েছে যে, দেওয়ান এই স্থানকে কাশী তীরঘামেরমতো করার জন্য কোটি শিব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। একটি শিশবর্মূর্তি হারিয়ে যায়। তাই আর কাশী হইল না, নাম হইল কুরাশী। শিশবচতুর্দশীতে এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়। এই গ্রামের ব্রাহ্মণগণ কুরাশী উপাধি বিশিষ্ট। রাজনগর নদীতে বিলীন হলে রায় মৃত্যুজ্ঞয়ের বৎশধর কালীপ্রসন্ন, তারাপ্রসন্ন ও রাধাবল্লভ প্রমুখ যেখানে বাড়ি করেন, সেই গ্রামই কুরাশী নামে অভিহিত।

**দাসারতা:** দাসারতা গ্রামে একটি বাজার আছে। নোয়াখালীর উকিল পণ্ডিত রাজকুমার সেন এই গ্রামের লোক। বসন্তকুমার সেন বিএ, বিএল 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রথম খণ্ড' রচনা করেন। বাহির হইয়াছে। রাজকুমার সেন মহাশয়ের এক কন্যা কাশীর পণ্ডিতদের কাছ থেকে 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত হন।

**পালং:** পালং সারা বাংলায় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এই স্থানে থানা, রেজেস্ট্রি অফিস, পোস্টাফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, উচ্চ ইংরেজি স্কুল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় (ডাক্তারখানা) ছিল। বহুকাল আগে এই স্থানে কয়েক ঘর চক্রবর্তী ও অধিকারী উপাধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, নবশায়ক ও নিমিশ্বশ্রীর হিন্দুর বাস ছিল। এখানে বৈক্ষণেগণের আখড়ায় ঝুলন্ত্যাত্মা হত। এখানে একটি হাট ও পুলিশ আউটপোস্ট (ফাঁড়ি) ছিল। পরে বহু সম্ভাস্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্ত এই গ্রামের অধিবাসী হন। রাজনগরের মহারাজ রাজবল্লভের বৎশধরগণ ও জ্ঞাতিগণ, স্থানীয় মুখটী, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী উপাধিধারী সম্ভাস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং লরিকুলের ধনী সাহাগণ এই স্থানে বাসস্থাপন করেন। গ্রাম হলেও এতে শতবছর আগেই নগরের মতো রাস্তাঘাট ছিল। এই গ্রামের শ্রীমতী আশালতা দেবী (সেন) সুশিক্ষিতা ও সুকবি ছিলেন। পালং বন্দরের মালিক ছিলেন রাধাবল্লভ সেন। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নাম পালং। এই স্থানে বিস্তর কাঁসারীর কারবার। রাধাগোবিন্দ বণিক এই বন্দরের প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন। লরিকুলের প্রধান ধনী প্যারীমোহন সাহাও এই গ্রামে এসে বাস স্থাপন করেন। বর্তমানে সেই নদী নাই। পালং দ্রুমে ইউনিয়ন, থানা ও জেলা সদরে পরিণত হয়েছে। পালং গ্রাম শরীয়তপুর জেলার কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত।

**বিলাস ধান:** এই গ্রামে অনেক বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করতেন। সাল্লাল ও রায়বৎশ প্রসিদ্ধ। তাঁদের কালীদেবীর মন্দিরে পূজার জন্য নানাস্থান থেকে বহু লোকের সমাগম হত। এই গ্রামের নবকিশোর শীল চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিখ্যাত ছিলেন। চেত্রসংক্রান্তিতে সিদ্ধেশ্বরী কালীর বাড়িতে মেলা বসত। এই গ্রামের অশ্বিনীকুমার আচার্য ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মহিমচন্দ্র রায় ছিলেন বিখ্যাত মানুষ।

**কাগদি:** এই গ্রামের চাটাতিবংশ প্রসিদ্ধ। আনন্দমোহন চাটাতি তালুকদার। অতি প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র মঠ ইঁগামে ছিল।

**ধানুকা:** এই গ্রামটি ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী। পওত ও বিষয়ী বৈদিকবংশ এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী। এঁরা প্রথ্যাত ময়ূর ভট্টের সত্তান নামে পরিচিত। ময়ূর ভট্টের পিতামাতা কনৌজ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তীর্থদর্শনে গিয়ে জগন্নাথদেবের মন্দির দেখতে পুরুতে যান। পথিমধ্যে তাঁদের পুত্রসত্তান হয়। প্রসূতি মাতা এত দুর্বল ছিলেন যে উঠে বসার সামর্থ্য ছিল না। অথচ দস্যুর ভয়ে সঙ্গীরা চলে গেল। তখন পিতা তাঁর সত্তান ফেলে অসুস্থ স্ত্রীকে বহন করে নিয়ে কোনো রকমে পুরীতে পৌছলেন। রাতে স্বপ্ন দেখলেন, শিশুটিকে ফেলে রেখে এসে যে পাপ তাঁরা করেছেন, তার জন্য পুরীর পুরুষোত্তমের দেখা পাবেন না। শিশুটিকে নিয়ে এলে তাঁদের আশা পূর্ণ হতে পারে। ভোরে কাউকে কিছু না বলেই ত্রাক্ষণ তাঁর সত্তানের সন্ধানে বের হন। সেখানে গিয়ে দেখেন একটি ময়ূর সেই স্থান থেকে উড়ে গেল এবং শিশুটি তখনও জীবিত। শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি পুরীতে ফিরে এলেন। ময়ূর শিশুটিকে রক্ষা করেছেন বলে ছেলেটির নাম রাখা হয় ময়ূর। তিনিই পরে ময়ূরভট্ট গ্রামে বিখ্যাত হন। ময়ূর ভট্ট কবি ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে মেয়ের রূপবর্ণনা করতে গিয়ে সকল অঙ্গের বর্ণনা করায় মেয়ে তাঁর বাবাকে অভিশাপ দেন। মেয়ের অভিশাপের বাপের দেহে কুষ্ঠ রোগ হয়। পরে ছাত্রদের সহায়তায় কাশীধামে যান। সেখানে তিনি ‘সূর্যশতক’ রচনা করেন এবং সূর্যদেবের আশীর্বাদে শাপমুক্ত হলেন। এই ময়ূর ভট্টের বংশোন্তব লক্ষণ মিশ্র বঙ্গে আগমন করে ধানুকা গ্রামে বাসস্থাপন করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন শ্রীহট্ট জেলার গ্রেন ভট্ট ধানুকায় আগমন করে এই বৈদিক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কৃষ্ণাত্মের গোত্রীয় বৈদিকগণ সমাজে বিশেষ সম্মান অর্জন করেন। এই বংশের লোকই ধানুকা, জপসা ও কানুরগাঁয় প্রসার লাভ করেছে। এই বংশের বলরাম বাচস্পতি ১৬৭৫ শকাব্দে ছয়টি মন্দির স্থাপন করে পার্বতী ও শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে নিবন্ধ শ্লোকটি নিম্নে উন্মুক্ত করা হইল।

‘শাকে পঞ্চসমুদ্রস্টকরজনীনাথে ধরিত্বাতলে

দুর্গাপাদবলাভিরামবলরামোহং ভবান্যাত্তজ্ঞাঃ।

কৃত্তা ষট্সুরমন্দিরং মণিগৃহে শ্রীপার্বতীসম্পতং

শ্রীকাশীশ্রীরমর্পয়ামি নিতরাং তাতস্য নিঃশ্বেয়সে॥’

অপর মন্দিরের গাত্রে আর একটি শ্লোক পাওয়া যায়। যথা-

‘আজন্মসংবিত্তপঃফলমেতদেব

যণ্মুত্তিশান। স্মরহরোমম মন্দিরেহপি।

বাচে বরং তদপি লোকসুখায় দেব

পাদারবিদ্রবষতিশ্চিরমত্ব ভূয়ৎ॥’

ছয়টি মন্দিরের মধ্যে শ্যামাঠাকুরাণী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীগোবিন্দ, শিব ও অশ্বিকার মন্দির সুদৃশনীয়। শ্যামাঠাকুরাণী প্রত্যক্ষ দেবতা। জনশ্রুতি রয়েছে যে, একবার প্রবল শক্রপক্ষ এই বাড়ি আক্রমণ করলে স্বয়ং দেবী খর্পরাঘাতে আততায়িপক্ষের লোক বিনাশ করেন। বহু লোক এই স্থানে দেবীর আর্চার জন্য সমাগত হয়। বিক্রমপুরের

মালখানগরের বসুবংশের আদিপুরুষ পুকুর খুড়তে গিয়ে প্রস্তরময়ী দেবীমূর্তি পেলে তিনি তা ধানুকার গুরুদেবকে প্রদান করেন। এই মূর্তি স্থাপনের পর হইতে ভট্টাচার্যগণের নানাবিধি উন্নতি হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্ম নিয়েছেন। তার মধ্যে চন্দ্রমণি ন্যায়পদ্ধতিনন্দনের নামহই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মহারাজ রঘুজিৎ সিংহ এই তাঁকে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। বিদুষী জয়ত্তী দেবী এই বংশের কন্যা।

**আমতলী:** ‘আমরকোষের’ টাকাকার পণ্ডিত রঘুনাথ চক্ৰবৰ্তীর জন্ম আমতলীর শালিল্য বংশে। তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে সামন্তসারবাসী হন। নদীভাঙ্গনের কারণে আমতলীগ্রামে এসে বাস করেন। হৰচন্দ্ৰ তর্কপদ্ধতিন ছিলেন একসময়ের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত।

**তুলাসার:** কোটালীপাড়ানিবাসী গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্ৰবৰ্তীর বংশে রমানাথের জন্ম হয়। তৎপৌত্র রামকেশব পণ্ডিত ছিলেন। গুনক কাশীনাথের কল্যাণ যশোদার সঙ্গে বিয়ে হয়। তুলাসার পালংএর পাশের গ্রাম। নদীভাঙ্গনে সরকারি অফিস বিলীন হলে এই গ্রামে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। নড়িয়ার ধনী গুরুদাস সাহা এই গ্রামে এসে বাস করেন। নিজ বাড়ি থেকে পালং বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন নিজের টাকায়। গুরুদাসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে পুত্র শচীনাথ সাহা পিতার নামে একটা ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। যা পালং তুলাসার গুরুদাস উচ্চবিদ্যালয় নামে পরিচিত। তাঁদের বাড়িতে বৃহৎ সরোবর আছে। কার্পাসের আবাদ ও তুলা প্রস্তুত হত বলে গ্রামের নাম তুলাসার হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

**ডোমসার:** ভট্টাচার্যবংশ এই গ্রামের আদিম অধিবাসী তাঁদের বাড়িতে মন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। দানবীর বিখ্যাত বিশ্বেশ্বর দাশ এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বরিশাল জজকোর্টের প্রধান সরকারি উকিল ছিলেন। তাঁর বরিশালের বাসভবনে প্রতিদিন শতাধিক লোক আহার করত। তাঁর মৃত্যুর পরে ভ্রাতুষ্পুত্র অভয়নন্দ দাস এই পদে নিযুক্ত হন। এই বংশীয় গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস কলিকাতা হাইকোর্টের ক্লার্ক ছিলেন। এই গ্রামবাসী কবিরাজ কমিনীকান্ত সেন মহাশয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মধ্যম পুত্রকে শেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার রায়চৌধুরীর নিকট দণ্ডক প্রদান করেন। এই পুত্রিই শেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরী এমএ। পরে এই গ্রামে কুণ্ড পরিবার পালং এলাকার মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম, কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জে প্রভৃতি বন্দরে তাঁদের বড় ব্যবসায় ছিল। চট্টগ্রামে এঁদের বিস্তর জমিদারি ছিল। এই বংশের নিত্যানন্দ কুণ্ড ও উপেন্দ্রলাল কুণ্ড রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। এই বংশের মূলপুরুষ কৃষ্ণদাস কুণ্ড, সনাতন কুণ্ড ও জগচন্দ্ৰ কুণ্ড তিনি সহোদর বাণিজ্য করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন। রাজনগরের নদীভাঙ্গনে তাঁদের বাড়ি বিলীন হলে এই গ্রামে এসে বাস করতেন। ভাগ্যকুলের ধনকুবের গুরুপ্রসাদ ও প্ৰেমচান্দ কুণ্ডুর ভাগিনীয় এই তিনি মহাজন, মাতুল পরিবার থেকে উন্নতির সূত্র লাভ করেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস ও সনাতনের পুত্র নিত্যানন্দ রায় লবণের ব্যবসায়ে ব্যাপক আয় করেন। এই বংশের হরেন্দ্ৰ রায় পিতা জগচন্দ্ৰ কুণ্ডুর নামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাস্যাত্মা উপলক্ষে এ বাড়িতে বিশেষ সমারোহ হত। বিক্ৰমপুরের সর্বপ্রথম এমএ, স্বৰ্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন এই গ্রামে জন্ম নেন। এই বংশের শ্রীনিবারণচন্দ্ৰ সেন বিএ একজন

গ্রাম্যকার। মুজিববাহিনির লিডার, শরীয়তপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য আবুল ফজল মাস্টার, রাজনীতিবিদ আবুল হাসেম তপাদার ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের জেলা কমান্ডার আবদুস সাত্তার খান এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

**কোয়ারপুর:** এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় বাস করতেন। মুসলমানের সংখ্যাও প্রচুর। বৈদ্য সম্প্রদায়ের জন্য গ্রামটি প্রসিদ্ধ। বৈদ্যবংশীয় মাধব সেনের বংশধরগণ গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। ইছাদের পূর্বপুরুষ গোয়ালদের অঙ্গর্গত পাঁচখুপী গ্রাম থেকে এখানে আসেন। কোয়ারপুর নিবাসী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক রতনমণি গুপ্ত মহাশয় রায়সাহেবের উপাধি পান। নিজগ্রামে পুরুর খনন ও ঢাকার রামমোহন লাইন্রের দালান নির্মাণ করে দিয়ে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন। এই বংশের পিতৃত নবকুমার গুপ্ত ঢাকা নবাব স্কুলে পশ্চিত ছিলেন। তাঁর লেখা অনেক পুস্তক স্কুলপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। তাঁর পুত্র কবিরাজ অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী ‘তোষণী’ নামক মাসিক পত্রিকার এবং অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এমএ, ‘বিশ্ববার্তা’ ও ‘শিক্ষা সমাচার’ এই দুই সাঙ্গাহিক পত্রিকার সম্পাদক। এই গ্রামের কবিরাজ রাজকিশোর দাস কবীন্দ্র একজন সংস্কৃতজ্ঞ পশ্চিত ছিলেন। কালকাতা হাইকোর্টের উকিল বৈকুষ্ঠচন্দ্র দাসগুপ্তের জন্ম এই গ্রামে। যখন বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশ দিয়ে পঞ্চ নদী প্রবাহিত হত, তখন কোয়ারপুরের পশ্চিম দিকের কিছু অংশ পঞ্চায় বিলীন হয়। পরে ঐ নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে কীর্তিনাশার উন্নত হলে, পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত চর জাগে।

**ছয়গাঁঠ:** ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান, এত ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বিক্রমপুরের আর কোন গ্রামে বাস করেন না। একসময়ে লেদাম নদী এর প্রাপ্ত দিয়া প্রবাহিত হত। পুরুর কাটতে গেলে প্রাচীন নৌকার কাঠ ও লোহার শিকল পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের আগে বর খান নামে এক মোসলমান এখানে ক্ষমতাশালী ছিলেন। চৌধুরীগণের ছয় আনির বাড়ি তাঁহার বাড়িতে ছিল। তাঁর ছয়টি স্ত্রীর নামে ছয়টি দিঘি খনন করেন। দিঘির পাড়ে ছয়টি পাড়ার প্রতন হয়। এই গ্রামের নাম তাই ছয় গাঁ। এই সকল দীঘি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা বলে কেউ কেউ ঘনে করে তা ঘণ্টদের তৈরি। মগেরা পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে এই স্থানেই বাস করেন। ছয়গাঁয় একটি সুপারীর হাট ছিল বিখ্যাত। ঘোষাল চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র আচার্য শৃন্যঘোষগ্রাম থেকে এসে এই গ্রামে বাস করতে থাকনে। আচার্য চূড়ামণির বংশধর কৃষ্ণ দাস সার্বভৌম প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হরিচরণ বিদ্যালঞ্চার ও বৈয়াকরণ রামহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি এই গ্রামের মানুষ। কয়েকটি টোল ছিল এই গ্রামে। এই গ্রামের বঙ্গচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় একজন প্রধান নৈয়ায়িক। তাঁর পুত্র কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ-বিএল উকিল। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভোলা মহকুমায় খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। বহুলোক তাঁর বাসায় খাবার পেত। এই গ্রামবাসী শ্রীঅম্বৃতলাল মুখোপাধ্যায় বিএ, দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সমিলনীর একজন প্রধান উদ্যোগী। বিক্রমপুর মধ্যে এই স্থানে প্রচুর নারিকেল জন্ম বলে একে নারিকেলী ছয়গাঁও বলা হয়। ব্রিটিশ আমলে এ-গ্রামের বহু হিন্দু নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৩০-৩৪ সালের দিকে সন্ত্রাস দমনের জন্য এখানে একটি ব্রিটিশ ক্যাম্প ছিল যেখানে বহু শিখ সেনা ব্রিটিশ

সরকারের নির্দেশে মোতায়েন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ছয়গাঁও বাংলাবাজার নামে একটি বিশিষ্ট জনপদ গড়ে উঠেছে। ইউনিয়নের সকল কার্যক্রম বর্তমানে বাংলাবাজার হতে পরিচালিত হয়। খানবাহাদুর খলিলুর রহমান শিকদারের বাড়ি এখানেই অবস্থিত।

**দেভোগ:** এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী লোকের অবস্থান ছিল। জপসা গ্রাম নদী সিকন্দ হলে এই গ্রামের জমিদার বংশীয় ভূত্পূর্ব মহাফেজ দীনলাল রায় এবং বরিশালের প্রধান মোকাব ভবানীচরণ রায় এই দেভোগ গ্রামে বাস স্থাপন করে। ভবানীচরণ রায়ের পুত্র এবং তদীয় ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র রায় ও ভাঙ্গার অধিকারচরণ তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত পাষাণময়ী কালীমন্দির রয়েছে। চাঁদ ও কেদাররায়ের জাতি রায় উপাধিধারী কেউ কেউ এই গ্রামে বাস করেন বলে জানা যায়।

**কাশাভোগ:** কৃষ্ণকান্ত পাঠক বিবারি গ্রামে জন্ম নিলেও কাশাভোগ গ্রামে বাস করতেন। তিনি জনপ্রিয় কথক ছিলেন। পাঠক মহাশয়ের বিরচিত ‘ওরে মন বসে ভাব কি? তোমার মরণের বিলম্ব আছে কি’ এই গানটি হিন্দু-ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায় মধ্যে গীত হত। জনশ্রুতি রয়েছে যে, উড়িষ্যায় ভাকাত কালেভা কামাল, এই গান শুনে ভাকাতি ছেড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে। ‘আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়া তাজিবে তবে’ গানটি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অজস্র গান তিনি রচনা করেছেন। ‘আত্মায়তা কুটুম্বিতা টাকা, টাকার জন্য কে না হয় ঠেকা’ এমন বিদ্রূপের গানও তিনি রচনা করেছেন। ১২২৮/২৯ সনে তাঁর জন্ম। প্রায় ৭০ বছর বেঁচেছিলেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত ‘অয়ি রাধে’ এই সংস্কৃত গানটি গেয়েও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বহু শিষ্য-সেবক ছিল। কাশাভোগের রাজকুমার পাঠক ও ভোজেশ্বরবাসী পাঠক কালীশচন্দ্র কৃতিতীর্থ কৃষ্ণকান্তের মূল অনুসারী ছিলেন।

**দিগর মহিসূলী:** অ্যাডভোকেট আবদুর রহমান বকাউল (প্রাক্তন এমএনএ) ও আবিদুর রেজা খান (প্রাক্তন এমএনএ) এবং এম আজিজুল হকের (প্রাক্তন আইজিপি ও ২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা) জন্মভূমি।

**আঙ্গরিয়া, রাজগঞ্জ:** আনন্দনাথ রায় জানিয়েছেন, তেন ডেক্রুক-এর মানচিত্রে এই স্থানদুটির উল্লেখ রয়েছে। ১৫৪১ সালে ডিপারোজের মানচিত্রেও এর দেখা পাওয়া যায়। ব্রহ্মণ্যান রচিত বঙ্গদেশের ভূগোল ও ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, মেঘনা ও পদ্মাৰ মধ্যবর্তী ঢাকার দক্ষিণাংশে এই দুটি বন্দরের অবস্থান। এই দুইটি বন্দর যে বহু প্রাচীন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনগরের রাজাদের হস্তগত হলে আঙ্গরিয়ার বন্দর রাজগঞ্জের হাট নামে পরিচিত হয়। রাজাদের বানানো গঞ্জ বলেই এর নাম রাজগঞ্জ। এই বন্দরে প্রচুর কয়লা বা অঙ্গারের আমদানি হত বলে ‘আঙ্গরিয়া’ নামে পরিচিত হত। এই কয়লা লাগত লৌহ, পিতল, সোনা, তামা প্রভৃতি ধাতুর জন্য। নদীভাঙ্গের শিকার হয়ে হাটটি নীলকুণ্ডী নামক স্থানে চলে গেলেও আঙ্গরিয়া নাম বহাল রয়েছে। নীলকুণ্ডী এখন নীলকান্দি নামে পরিচিত। এই গ্রামে ‘ভুঞ্জা’ পদবিধারী কায়স্ত আর ‘বাগচী’ পদবিধারী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। হৰীশচন্দ্র বাগচী আসাম ডিক্রুগড়ের বিখ্যাত উকিল আর তাঁর ছেলে বিপিন বাগচীও

ওকালতি পেশায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। আঙ্গারিয়ার সংলগ্ন পরাশক্তির বাণের পারে একটি নীলকুঠী ছিল বলে আনন্দনাথ রায় জানিয়েছেন। তবে কুঠির অঙ্গিত খুঁতি পাওয়া না গেলেও নীলকরদের একটি অফিস ছিল বলে জানা যায়। এই স্থানে অনেক ‘বেদে’ বাস করত। কিংবদন্তী, এই খালের দ্বারা বিক্রমপুর ও ইন্দিলপুরের সীমা নির্দেশিত হইয়াছিল। এই গ্রামের কাছে দাদপুর, গোবিন্দপুর, খাজুরতলা প্রভৃতি স্থানে অনেক মুসলমান বাস করেন। শরীয়তপুর পৌরসভার মেয়র বীরমুক্তিযোদ্ধা আবদুর রব মুসি এং আবহাওয়াবিদ সমরেন্দ্র কর্মকারের জন্য আঙ্গারিয়া।

**সাজনপুর:** বহুকাল ধরে এই স্থান জঙ্গলপূর্ণ ছিল। বাদশাহ শাহজানের নামানুসারে সাজনপুর নাম হতে পারে। সেখানে শুরুতে দুই-তিন ঘর মুসলমান করতেন। পরে এটি জনপূর্ণ হয়ে ওঠে। জপসার রাজবংশের অনেকে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এই স্থান যথেষ্ট উঁচুতে অবস্থিত।

**তেলীপাড়া:** এই গ্রামে বহু তেলী বাস করিত বলিয়া উহার নাম হয় তেলীপাড়া। এখন আর তেলীরা নেই। অধুনা ব্রাহ্মণ ও কায়স্ত সম্প্রদায়ের লোক বাস করতেন। চক্ৰবৰ্তীবংশের রামানাথ চক্ৰবৰ্তী মোক্ষার একজন বহুদর্শী কাব্যজ্ঞ ছিলেন।

**জোয়ার বিনোদপুর:** রাজনগর পরগনার জোয়ার বিনোদপুর পূর্বে রাজা রাজবলুভের জমিদারিভুক্ত ছিল। রাজা রাজবলুভের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গোপালকৃষ্ণ অন্যান্য জমিদারির সহিত বিনোদপুর জমিদারিও উত্তরাধিকারী হন। গোপালকৃষ্ণের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে জোয়ার বিনোদপুর জমিদারি হাওলা স্বরূপ তাঁর পুত্র পীতাম্বর সেনকে দিয়ে যান। পীতাম্বর সেনের বংশধরণ এই সম্পত্তি রক্ষা করতে না পারলে তা নিলামে ওঠে। অবস্থার পরিবর্তন হেতু এই সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়। ঢাকার মোগলবংশের মির্জা জয়নাল আবদীন ও মির্জা জাফর নামের দুই ভাই এই জমিদারির ষেলআনাই কিনে নেন। বিনোদপুর ও তাহার সংলগ্ন গ্রামের অধিবাসিদের মধ্যে মুসলমানই বেশি ছিল। তাঁরা বেশ অবস্থাপন্ন। এই গ্রামের অনেকের পেশা ছিল দস্যুতা ছিল বলে ‘ফরিদপুরের ইতিহাস’ প্রম্মে আনন্দনাথ রায় উল্লেখ করেছেন। তবে অনেকই ছিল দুর্বৰ্ষ। জমিদার খাল কেটে জমির উর্বরতা বাড়ালেও তার জন্য খাজনা নিতে সাহস করতেন না। বিনোদপুরের নায়েব লোকনাথ চক্ৰবৰ্তী প্রজাদের হাতে খুন হন। খুনের দায়ে বিনোদপুরের একজন প্রধান তালুকদার শঙ্খ মৃধার প্রাণদণ্ড হয়। বড় বিনোদপুর, চৰ বিনোদপুর, চিতলিয়া, পশ্চিমকান্দি, দক্ষিণকান্দি, কাশিপুর, কাজিকান্দি, মামুদপুর, গৈয়াতলা, মৃধাকান্দি, রণখোলা প্রভৃতি স্থান লইয়া বিনোদপুর জোয়ার। একবার এ-সকল গ্রামের প্রজাগণ মোগল জমিদারগণের কাছারি লুঠ করলে এবং নানান বেআইনি কাজ করলে সরকার তাদের দমনের জন্য সৈন্য পাঠালে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের স্থান এখনও ‘রণখোলা’ নামে পরিচিত। এই নিয়ে একটি লোককবিতা রয়েছে-

‘বাজিল রণের কাড়া,

সিপাহী হইল খাড়া,

বিনোদপুরে পৈল সাড়া।’

রাজনীতিক এইচএস সিরাজউদ্দিন, সাবেক সাংসদ একেএম নাসিরউদ্দিন, আবদুর রশিদ মাহবুব ও আবদুল আজিজ খানের জন্য এই গ্রামে।

**সুবেদারকান্দি:** পশ্চিম পাড়, দক্ষিণকান্দি, চিতলিয়া, কাশিপুর, মজুমদারকান্দি, মনকোলা, দড়িহাওলা প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে ১৯৭২ সালে চিতলিয়া নামে আলাদা ইউনিয়ন গঠিত হওয়ায় সুবেদারকান্দি গ্রাম এখন বিনোদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থান করছে। জোতদার সুবেদ মাদবরের নামে গ্রামটির নামকরণ হয়। সুবেদার পদবির কয়েকজন সৈনিকও এখানে বাস করতেন বলে এরূপ নাম হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এখানে ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, বীজাগার ও মডেল প্রাইমারি স্কুল ছিল। এককালের বাইচের বিখ্যাত নৌকা ও দৌড়ের নামকরা গরম মালিক সাহাম ঢালীর জন্মস্থান। শিক্ষাবিদ আব্দুল হাই মিশ্র, ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসেম, কবি মফিজুল ইসলাম ও কবি হাবিবউল্লাহ সুজুন এ গ্রামে জন্মহৃষণ করেন। একটি গানে<sup>১</sup> রয়েছে এ গ্রামের বিবরণ-

আমরা গেছিলাম গেছিলাম বেড়াইতে

বিনোদপুর সুবেদারকান্দি বেড়াইতে।

শরীয়তপুরের সুবেদারকান্দি সুখ্যতি এর বেশ,

গ্রামবাসীর কীর্তির জ্যোতি উজ্জ্বল করবে দেশ॥ আমরা গেছিলাম....

এই গ্রামের মেঘাই সরদার নাটামোদী লোক

তাঁর অভিনয়ে প্রাণীত হই দৃশ্য জুড়ায় চোখ ॥ এ

তিনি সবার উন্নতি আর স্বাস্থ্য ভালো চান

তাইতো টক বাইগণ আর ইর চাষে উৎসাহ যোগান ॥ এ

তাঁর স্ত্রী ছুটু বিবি শিকা বোনেন ভালো

প্রেরণা দেয় সব হৃদয়ে বাহারি শিকা'র আলো ॥ এ

বাঙালি সংস্কৃতি চাষে তাঁদের বেশ অবদান

তাঁরা মটর শাকে বাইল্লার হোরা আয়াদের খাওয়ান ॥ এ

জাফর মৌলভী, মেঘাই সরদার, রহমান মাদবর,

সুলতান মৌল্য এবং তাঁদের আরো সহচর,

সবার সম্মিলিত চেষ্টায় স্কুল উঠেছে

সেই স্কুলের আলোয় সবার চক্ষু ফুটেছে ॥ এ

ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রফেসর, উকিল, ইউএনও, শিক্ষক- কবি

আর মুক্তিযোদ্ধায় ভরা গাঁও যেন দেশের এক উজ্জ্বল ছবি ॥ এ

**রামজন্মপুর:** বর্তমান ভেদরগঞ্জ সদর পৌরসভার অংশ। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা কমরেড শান্তি সেন এবং কমরেড অরণ্য সেনের বাসস্থান এখানে। পৌরসভার চেয়ারম্যান আব্দুল হাই এর জন্মস্থান। এখানকার কোকোলা মসজিদ অনুপম সৌন্দর্যের প্রতীক।

**শৰ্গঘোষ:** এই গ্রামটি বিক্রমপুর পরগনার হলেও ইদিলপুর জমিদারির অন্তর্গত হয়। এই স্থানটির অবস্থা নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান হইতে স্বতন্ত্র। এই গ্রাম বিক্রমপুরের মধ্যে সবচেয়ে ঊচু বলে স্বীকৃত। আনন্দনাথ রায়ের গ্রন্থে এই গ্রাম 'শূন্যঘোষ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাক্ষণ-বসতির জন্য গ্রামটি প্রসিদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে কালীপুরসন চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁদের পূর্বনিবাস আঙ্কারমাণিক নদীর ভাঙনের

শিকার হলে সেখান থেকে এই গ্রামে আসেন। রাজনগরের ভট্টাচার্য বংশ, কানুরপীঁরা দন্ত বংশ ও জপসার দাস বংশের কায়স্থগণ এই গ্রামে বাস করতেন। স্থানটি মুসলমান-পরিবেষ্টিত ছিল। কবি মফিজুল ইসলামের বাড়ি ‘কবিকুণ্ড’ এই গ্রামে অবস্থিত।

**ইদিলপুর:** এককালের বিখ্যাত পরগনার নাম। এখানকার জমিদারগণ বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কালীপুসন্ন ঘোষ, সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র ঘোষের জন্মস্থান। বাংলার বিশিষ্ট কল্পশিঙ্গী গীতা দণ্ডের পিতৃভূমি।

**ডামুড়া:** বিখ্যাত নদীবন্দর ও ব্যবসায় কেন্দ্র। বিশিষ্ট জননেতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, প্রাক্তন পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক এখানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাক্তন সংসদ সদস্য হেমায়েতউল্লাহ আওরঙ্গ, উপমহাদেশের বিশিষ্ট বীমাবিদ খোদাবক্র, এককালীন সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার ফারুক আলম, সাংসদ ফাহিম রাজ্জাক ছাড়াও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

**পাইকপাড়া:** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবুল ফারাহ মুহাম্মদ আবদুল হক ফরিদী এবং তাঁর সন্তান বাংলাদেশ সরকারের সাবেক কেবিনেট সচিব আতাউল (জেলার একমাত্র সিএসপি) হকের জন্মস্থান।

**সুরেশ্বর:** দেশখ্যাত স্থান। প্রাচীন নদীবন্দর। এখানকার বিখ্যাত পীর জান শরিফের মাজারে প্রতিবছর শীতকালে ওরস হয়।

**মোজারের চর:** বিশিষ্ট রাজনীতিক, ভাষাসেনিক ও প্রাক্তন এমএলএ ডা. গোলাম মাওলার জন্মস্থান।

**রংবুকর:** এই গ্রামটি বিক্রমপুর ও ইদিলপুরের মধ্যবর্তী। বহু ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করতেন। চক্ৰবৰ্তীবংশ প্রসিদ্ধ তালুকদার; এঁর কুলীন চট্টোপাধ্যায় বংশ হলেও চক্ৰবৰ্তী নামে প্রসিদ্ধ। এঁদের বাড়িতে মঠ রয়েছে। এঁরা একদিকে সদনুষ্ঠান ও অপর দিকে দাসোবাজ বলেও দেশের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। গুরুচরণ, শশিভূষণ, অভয়চরণ ও শীঘ্ৰত বৈকুণ্ঠনাথ চক্ৰবৰ্তী প্রভৃতি এই বংশের প্রধান লোক। বৈয়াকরণ গঙ্গাচৱণ বিদ্যাভূষণ এই গ্রামের লোক। তাঁর পুতৃ পতিত শ্রীরাজকুমার চক্ৰবৰ্তী একজন সুলেখক। গ্রামে সংস্কৃত টোল ও সার্কেল স্কুল আছে। স্লানঘাটা নামক গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে বিবাদে চক্ৰবৰ্তী বংশের কোনো ব্যক্তি এবং কৰ্মচারী খুন হয়ে। এঁদের বাড়ির তিন হিস্যায় প্রতিদিন শত শত লোকের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। নবীনচন্দ্র সেন ‘আমার জীবনচরিত’ পুস্তকের তৃতীয়ভাগে ‘আলুর টিল’ অধ্যায়ে এই গ্রামের প্রসঙ্গ রয়েছে।

**মূলকৃতগঞ্জ:** দক্ষিণবিক্রমপুরের প্রথম থানা ছিল এখানে। বিখ্যাত বন্দর ও হাট। রাজনীতিক ও সমাজকর্মী আবদুল করিম দেওয়ান (মনাই দেওয়ান) এর জন্মস্থান।

**বাহের দিঘীর পাড়:** বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় সংসদের সদস্য এবং প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার কর্ণেল শওকত আলীর জন্মস্থান।

**কলুকাটি:** প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী টি.এম. গিয়াসউদ্দিন এবং চার্টার্ড একাউনেন্টেট মো. সাইদুর রহমান, ডা. আলমগীর মতি প্রমুখের জন্মস্থান।

**বিলাসপুর:** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও এককালীন পূর্বপাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আবদুর রশিদ খলিফার জন্মস্থান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ইউনুস খলিফা এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

**কবিরাজকান্দি:** বিশিষ্ট রাজনীতিক ও প্রাক্তন জাতীয় সংসদ সদস্য আমিনুল ইসলাম দানেশ মিয়ার জন্মস্থান।

**বড় গোপালপুর:** বিশিষ্ট রাজনীতিক, প্রাক্তন সাংসদ ও শরীয়তপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক মাস্টার মজিবুর রহমানের জন্মস্থান।

**জানধারকান্দি:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, জাতীয় সংসদ সদস্য বিএম মোজাম্বেল হক এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

**মাঝিরঘাট:** ঢাকা-শরীয়তপুরের প্রবেশপথ। মাওয়া থেকে সকল স্পিডবোট, লঞ্চ, ফেরি, ট্রালার এখানে এসে ভিড়। একটি ব্যস্ত নদীবন্দর।

**মসুরগাঁা, দাসের জঙ্গল:** জমিদার গোলোকচন্দ্র রায় একসময়ে মসুরগাঁা গ্রামে বাস করতেন। নদীভাঙ্গনে গ্রাম বিলীন হলে দাসেরজঙ্গলে তিনি বাড়ি তৈরি করেন। গোলোকচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র রায় তালুকদার। এক সময়ে সখের যাত্রার দল ছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ও অনুবাদক ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় দাসের জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র তুহিন মুখোপাধ্যায় সরকারি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক এবং কল্যা ড. কাকলী মুখোপাধ্যায় ফরিদপুর সরকারি বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

**পঞ্জী:** এই স্থানে বঙ্গ কায়স্ত সমাজের ঘটক ত্রাক্ষণবংশের এক শাখা বাস করত। এই ঘটকবংশীয় গোলোকচন্দ্র ও লোকনাথ কর্তৃক সন্তোষের জাহুরী চৌধুরাণীর অর্থানুকূল্যে বঙ্গ কায়স্তগণের এক কুলকারিকা লিপিবদ্ধ হয়। এই ঘটক মহোদয়গণ কায়স্ত সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এই গ্রামের ঘোষবাড়ি প্রসিদ্ধ। স্টিমারঘাট রয়েছে।

**চিকন্দি:** ব্রিটিশ জয়না হতেই এখানে একটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত। একটি বিশিষ্ট জনপদ।

**গোসাইরহাট:** এই স্থানে একটি বহুপ্রাতন পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। ইদিলপুর পরগনার মধ্যে এর অবস্থান। ব্ৰহ্মানন্দ গিরি নামে এক গোসাইহোর নামে এখানে হাট বসত। গোসাইরহাট স্থান পরে থানা ও উপজেলার মর্যাদা পায়। ইদিলপুরের বঙ্গবিদ্যালয় নামে পুরাতন একটি স্কুল ছিল।

**বুড়িরহাট:** এখানে পুলিশ স্টেশন বা থানা ছিল। লেদাম নদী এই গ্রামের প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হত। এখন নদীর অস্তিত্ব নেই। যোগেশচন্দ্র রায় এই হাটের মালিক ছিলেন। এখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রম আছে। বৰ্ষাকালে এই হাটে বিস্তর নারিকেল, কোষা ও মালগার বন (খড়) বিক্রয় হয়। এখানে বিশাল একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদের অলংকরণ খুব উন্নত ও শিল্পসম্মত।

**দেওভোগ:** বুড়িরহাটের পাশে দেওভোগ গ্রামে বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিরশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর জন্মস্থান। তাঁর পুত্র গৌতম চক্রবর্তীও চিরশিল্পী।

**কনকসার (কনেশ্বর):** এটি ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। এই স্থানবাসী জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় হন্দাভুলুয়ার চাকরি করে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেন। তাঁদের এক জ্ঞাতি কার্তিকপুরের জমিদার ময়তাজউদ্দীন চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৌধুরী তখন জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি লুঠ করে নিয়ে যায়। মামলায় চৌধুরী ও তাঁর পক্ষের লোকজনের শাস্তি হয়। জগবন্ধুর পুত্র শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নিরীহ লোক ছিলেন। পিতার জমিদারিতে তিনি কিছু সম্পদ যুক্ত করেছিলেন। গোসাইরহাট থানার ৮০টি মৌজার ১২টি, ডামুড়া থানার ৬৩টি মৌজার ২১টি, ভেদরগঞ্জ থানার ৮২টি মৌজার ১৩টি, পালং থানার ১০৪টি মৌজার ৮টি, নড়িয়া থানার ১৩৮টি মৌজার ১টি, বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার ১১টি মৌজার ৯টি মৌজা এই মোট ৭৪টি মৌজা ছিল এই এস্টেটের অন্তর্গত। ব্রিটিশ আমল থেকে এখানে তহসিল অফিস আছে। সমাজকর্মী ও রাজনীতিক শেখ আলী আশরাফ এবং সেলিম মিয়ার জন্মস্থান।

**সিঙ্গা:** আঙ্গতোষ ভট্টাচার্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব শৈলেন্দ্রনাথ রায় আইসিএস এই গ্রামের সন্তান। এ-গ্রামের চৌধুরী পরিবার বিখ্যাত।

**ধানকাটি:** বহু কাষত্ব ভদ্রলোকের বাসস্থান। এখানকার কালীপ্রসাদ রায় ও তাঁর ভগী জাহুবী চৌধুরীর প্রথ্যাত ব্যক্তি।

**হাটুরিয়া:** জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বাবুদের ইদিলপুর পরগনার কাছারি দালান এই গ্রামে। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পুত্র মোহিনীমোহন ঠাকুরের নামে এই পরগনা নিলামে কেনা হয়। মোহিনীমোহনের দুই পুত্র— কানাইলাল ও গোপাললাল। কানাইলাল নিঃসন্তান থাকায় তিনি জমিদারির নিজ অংশ গোপাললালকে পতনী প্রদান করিয়া বার্ষিক ২৪,০০০ হাজার টাকা মালিকানা বাবদ প্রাপ্ত হইতেন। গোপাললাল ঠাকুরের পুত্র কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, তৎপুত্র প্রথম শরদিন্দ্রমোহন, দ্বিতীয় শৈরীন্দ্রমোহন, কনিষ্ঠ নিঃসন্তান; জ্যেষ্ঠের পুত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরগনার মালিক ও জমিদার। গোলাম আলি চৌধুরী (নকড়ি মিএও) ইদিলপুর পরগনার তালুকদার। তাঁর পিতা আশক মৃধা ঠাকুর জমিদার-সরকারে কাজ করে সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। তিনি নয়াভাসানি নদীতে পাকা ঘাট, পাকা পোল নির্মাণ করেন। তিনি হাটুরিয়া গ্রামে যেলা বসান। এককালে স্টিমার স্টেশন ছিল। এখানকার কালিবাড়ি ও দুর্গাপ্রতিমা প্রসিদ্ধ। ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী শামসুর রহমান (শাহজাদা মিয়া), জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী, জমিদার সেকান্দার আলী চৌধুরী ও তাঁর পুত্র রওশন আলী চৌধুরীর জন্মস্থান।

### ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ফরায়েজি আন্দোলন, ওহাবি আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবী আন্দোলন, পাকিস্তানবিরোধী স্বাধিকার আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, উন্নস্তরের গণঅভ্যর্থনা, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন দেশে বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি প্রতিটি আন্দোলনে এই জেলার মানুষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

**ফরায়েজি আন্দোলন:** ফরায়েজি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল হাজী শরীয়তউল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০) জন্মস্থান মাদারীপুর মহকুমার শিবচর থানায়। এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লেও মাদারীপুর থেকেই নিয়ন্ত্রিত হত। মাদারীপুর মহকুমার ৬টি থানা বর্তমান শরীয়তপুর জেলার অঙ্গর্গত। সেই সূত্রে হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে শরীয়তপুরকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। হাজী শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার প্রচুর অনুসারী ছিল এই জেলায়। দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান কাদির বক্স শরীয়তপুরের স্থান ছিলেন।

**ত্রিটিশবিরোধী বিপুলী আন্দোলন:** ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের পরে এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাতে শরীয়তপুরের মানুষও যুক্ত হয়। আবদুর রব শিকদার জানিয়েছেন, ‘বিশেষ করে আঙ্গরিয়া, ছয়গাঁও, পালং, কনেশ্বর, ভোজেশ্বর, মহিসার, নড়িয়া, ডাম্ভুড়া ও গোসাইরহাটের বিশিষ্ট হিন্দু নেতাগণ এ-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।’<sup>১২</sup> এই তথ্য পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এই আন্দোলনে মুসলিম নেতারাও যুক্ত ছিলেন। কারণ ১৯০৬ সালের ২৮ জানুয়ারি মাদারীপুরে জমিদার গোলাম মাওলা চৌধুরীর বাসভবনে বঙ্গভঙ্গবিরোধী সম্মেলনে পাঁচাজার মুসলিমান-সহ সাত হাজার মানুষ অংশ নেয়। এই সভায় পশ্চিত শশধর তর্কচূড়ামণি সভাপতিত্ব করেন। স্বদেশি আন্দোলনের মুখ্যপত্র ‘ফরিদপুর হিতৈষী’ এই খবর প্রকাশ করে। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় শরীয়তপুরের মুসলিমরাও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় যুক্ত ছিলেন। ফরিদপুরের মৌলভী আবুল কাসেম এবং রওশন আলী চৌধুরীর মতো প্রভাবশালী মুসলিম নেতা এই আন্দোলনে সামনের কাতারে ছিলেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের জন্য লোনসিংহ গ্রামের বিপুলী পুলিনবিহারী দাস ১৯০৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর গ্রেফতার বরণ করেন। এরপর ‘ভারতছাড়ো’ আন্দোলনে শরিক হয় এ-এলাকার মানুষ। ত্রিটিশবিরোধী বিপুলীদের অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠলে তাঁর পূর্ববঙ্গীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পুলিনবিহারী দাস। ভেদরগঞ্জের ছয়গাঁও থেকে এ-আন্দোলন পরিচালনা করা হতো। এঁরা ছিলেন বিপুলী সূর্যসেনের অনুসারী। তাই ছয়গাঁও-কে দ্বিতীয় চাটগাঁও বলা হতো। ১৯১০ সালে একই অভিযোগে পুলিনবিহারী দাস ও কার্তিকপুরের রজনীকান্ত সেনকে গ্রেফতার করা হয়।

অনুশীলন সমিতির স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন নেপাল চক্ৰবৰ্তী, যামিনীকান্ত চৌধুরী, হরিদাস ব্যানার্জি, ভূপেন্দ্রনাথ নাগ, নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, চিত্রজেন গাঙ্গুলি, মনোরঞ্জন চৌধুরী, সন্তোষ ব্যানার্জী, সন্তোষ দাস প্রমুখ। এছাড়া বিলাসখান গ্রামের আশুতোষ কাহালী, জীবন গুহ্ঠাকুরতা, নলিনী ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ আতর্হী, চিত্র কাহালী, ধীরেন রায়, সুবোধ রায়, কোয়ারপুরের কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, পালংয়ের শচীন্দ্রমোহন কর, সুরেন্দ্রনাথ কর, প্রমথ প্রমথ সরকার, বীরেন্দ্রনাথ সেন, সীতানাথ দে, প্রফুল্লকুমার সেন, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ফতেজঙ্গপুরের বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইদিলপুরের উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, সতীন্দ্রনাথ ঘোষ; ছয়গাঁওয়ের খগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ নেতা অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের পক্ষে স্বদেশি আন্দোলন পরিচালনা করেন। এঁদের মধ্যে পুলিনবিহারী দাস ১০ বছর কারাগারে; আশুতোষ কাহালী ২৪ বছর কারাগারে ৭০ দিন অনশন ও ৯০ মাস পলাতক; বীরেন্দ্র

চট্টগ্রাম্যায় ২৪ বছর কারাগারে ৪০ দিন অনশন ও ৯৬ মাস পলাতক; শচীদ্রমোহন কর ১৪ বছর কারাগারে ১৮ দিন অনশন ও ১৪ মাস পলাতক এবং জীবন গুহ্ঠাকুরতা ১১ মাস কারাগারে ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করায় এই সাজা ভোগ করতে হয়।

১৯২১ সালে বিলাসখান গ্রামে আশতোষ কাহালী ও জীবন গুহ্ঠাকুরতার নেতৃত্বে বিপুরীদের জন্য একটি শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদারীপুরের বিপুরী পূর্ণচন্দ্র দাস শাস্তি সেনা নামের খেচাসেবক বাহিনি গঠন করলে শরীয়তপুরের অনেক বিপুরী তাতে যোগ দেন।

১৯৩০ সালের মহাত্মা গান্ধির লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ফরিদপুর জেলার প্রায় দুই হাজার লোককে ঘ্রেফতার করা হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন শরীয়তপুরের কমরেড শাস্তি সেন। তাঁর স্ত্রী অরুণা সেনও বিপুরী ছিলেন। দেশভাগ পর্যন্ত এই বিপুরী কর্মকাণ্ডে শরীয়তপুরের নেতারা অঞ্চলী ভূমিকা পালন করেন।

**ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন:** অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের বিপুরী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কংগ্রেস-মুসলিম লীগের পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও চলতে থাকে। এই আন্দোলনে এই অঞ্চলের মানুষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই এলাকায় এসব আন্দোলন পরিচালনা করেন খানসাহেব আবদুল আজিজ মুসলি, নয়ন শরিফ সরকার, আদুর রশিদ সরকার, গিয়াসউদ্দিন সরকার, গিয়াসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, খলিলুর রহমান শিকদার, মনাই দেওয়ান, ইউসুফ বালা প্রমুখ।<sup>১০</sup> শরীয়তপুরের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে মহাত্মা গান্ধি, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, দ্বারিকানাথ বারুৱী, শেখ মুজিবুর রহমান, তমিজউদ্দিন খান প্রমুখ নেতা অংশ নিয়েছেন।

**ভাষা-আন্দোলন:** ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলনের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদের সহসভাপতি (ভিপি) ছিলেন গোলাম মাওলা। ১১ জন ছাত্রনেতার মধ্যে যে ৪ জন ছাত্রনেতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ঘোষণা দেন তিনি তাঁদের একজন। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য। ভাষাসৈনিক হিসেবে ডা. গোলাম মাওলার অবদানের জন্য শরীয়তপুরবাসী গৌরববোধ করে। শরীয়তপুরে ছাত্র যাঁরা ঢাকায় ছিলেন, তাঁদের অনেকই এই আন্দোলনে অংশ নেন।

**যুক্তক্ষন্ট আন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান:** ১৯৫৪ সালে গঠিত যুক্তক্ষন্টের আন্দোলনে শরীয়তপুরবাসী একাত্ত হয়। মুসলিম লীগের বিরোধী আন্দোলনে তারা সামিল হয়। এরপর খেলার শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এই এলাকার মানুষ। ১৯৬২-র ছাত্র আন্দোলনে পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে ভূমিকা রাখেন ডামুড্যার কৃতী সন্তান আবদুর রাজ্জাক।

মুক্তিযুদ্ধসহ জাতীয় সকল আন্দোলনে এই এলাকার মানুষ অবদান রাখেন। বাঙালির ইতিহাসে অবদান রয়েছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম এখানে তুলে ধরা হলো।

**চান্দরায় (?-১৫৮৬):** পিতার নাম যাদব রায়। অনুজ সহোদর ছিলেন কেদাররায়। এঁরা ছিলেন কায়স্ত এবং পারিবারিক পদবি ছিল ‘দে’। বাংলার বারভূঁয়াদের একজন

হিসেবে এই দুই সহোদরের নাম যৌথভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাঁদেরকে বিক্রমপুরাধিপতি বলা হতো। এঁদের রাজধানী ছিল শরীয়তপুর জেলার শ্রীপুরে। তাঁদের নিবাস ছিল আড়াফুলবাড়িয়া গ্রামে। কীর্তিনাশার গর্ভে একত্রিষ্ঠাটি গ্রামের মধ্যে চাঁদরায়-কেদাররায়ের গ্রাম ফুলবাড়িওয়াও নিমজ্জিত হয়। দাউদ খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা দুইভাই মিলে সন্ধীপ রাজ্য দখল করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ স্থান, সমগ্র বিক্রমপুর, কর্তিকপুর, ইদিলপুর, শাহবাজপুর ও সন্ধীপ রাজ্য এই দুইভাইয়ের শাসনাধীন ছিল। তাঁর কন্যা সোনামণিকে অপহরণ করে বিয়ে করেন আরেক বারভূইয়া ঝিশাখা। এই মনস্তাপে চাঁদরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৫৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন সূত্রে তাঁর মৃত্যুতারিখ বলা হয়েছে ১৫৯০ থেকে ১৫৯৫ সালের মধ্যে।

**কেদাররায় (?-১৬০৪):** কেদাররায় বারভূইয়ার অন্যতম। তাঁর পিতা যাদবরায়। অগ্রজ সহোদর ছিলেন চাঁদরায়। প্রথমে স্বাধীন সুলতান দাউদ খাঁর কর্মচারী ছিলেন। দাউদ খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা সন্ধীপ রাজ্য দখল করেন এবং বিক্রমপুরের শ্রীপুর বর্তমানে শরীয়তপুরের শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁদের ছিল সুশ্বারূপ নৌবাহিনি। চাঁদরায়ের মৃত্যুর পরেও কেদাররায় একাই প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন। প্রায় সকল ভূইয়া মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করলেও কেদাররায় বিনায়ুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর ‘অমৰাধিপতি’ হিন্দুকুলাঙ্গার রাজা মানসিংহকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া ভুঁগাদলের নির্মূলার্থ প্রেরণ করিলেন।<sup>১৪</sup> মোগলদের সঙ্গে কেদাররায় চারবার যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথমবার ১৬০২ সালে কেদাররায়ের অধিকৃত সন্ধীপ দখল করতে এলে মোগলসেনারা পরাজিত হয়। কেদাররায়ের প্রধানসেনাপতি পর্তুগিজ কার্ভালোর বীরত্বে সম্মত হয়ে সন্ধীপের শাসনভার তাঁকে দেয়া হয়। ১৬০২ সালে ১০ নভেম্বর আরাকান মগদের বিরুদ্ধে কার্ভালোর যুদ্ধে কেদাররায় একশত কোশা নৌকা ও গোলাবার্ঢ পাঠিয়ে সহায়তা করেন। মগরা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে এলেও কেদাররায় সহায়তা করেন। পরে কার্ভালো শ্রীপুরে অবস্থানের সুযোগে মগরা সন্ধীপ আক্রমণ ও দখল করে নেন। একই সময়ে মোগল সুবেদার মানসিংহ বিক্রমপুর দখলের জন্য তার সেনাপতি মন্দাররায়কে পাঠান। তিনি একশত রণতরী ও একদল সাহসী সৈন্য নিয়ে শ্রীপুর দখল করতে আসেন। এই যুদ্ধে নৌবাহিনির প্রধান হিসেবে কার্ভালোর সহায়তায় কেদাররায় বিজয়ী হয়। মন্দাররায় সহ অধিকাংশ মোগল সেনা নিহত হয়। মন্দাররায়ের পরাজয়ের শোধ নিতে মানসিংহ নিজে শ্রীপুর দখল করতে আসেন। সঙ্গে আনেন বেশ কয়েকজন সুদক্ষ সেনাপতি। এই যুদ্ধে কেদাররায় পরাজিত হলেও তিনি ধরা না দিয়ে দক্ষিণে সমুদ্রে লুকিয়ে থাকেন। পরে মানসিংহ সন্ধির প্রস্তাব দিলে তিনি ফিরে আসেন। তখন মোগলদের কর দিতে সম্মত হওয়ায় অধিকৃত রাজ্য কেদাররায়কে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যথাসময়ে মোগলদের ন্যায্য কর না দেওয়ায় মোগল সেনারা আবার কেদাররায়ের রাজ্য আক্রমণ করে। এবার আসেন সেনাপতি কিলমক খাঁ। শ্রীনগরে এসে তিনি অবস্থান করেন। কেদাররায় এখানে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মোগলদের সঙ্গে তৃতীয়বারের এই যুদ্ধে কেদাররায় মোগল সেনাপতি কিলমককে বন্দী করে রাখেন। খবর পেয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে মানসিংহ ছুটে আসেন। ১৬০৪ সালে সাতদিনের প্রবল

যুদ্ধে কেন্দরীয় মারাত্মক আহত হন এবং বন্দি-অবস্থায় শহিদ হন। যুদ্ধ শেষের স্মৃতি হিসেবে শ্রীনগরের নাম হয় ফতেজপুর। কেন্দরীয়ের সুরম্য রাজপ্রাসাদ, বিচারালয়, সেনানিবাস, কোষাগার, কারাগার, কোটিশ্বর মন্দির, রাজপথ-সহ যাবতীয় কীর্তি একসময় কীর্তিনাশার গভে বিলীন হয়ে গেছে।

**রায়দুর্লভ রাম** (সপ্তম শতাব্দী-১৭৭০): রায়দুর্লভ বা রাজা রায়দুর্লভ রাম শরীয়তপুরের রাজমগরের বিরাট ভূখণ্ডের জমিদার। পিতা জানকি রাম। জানকি রাম নবাব সুজাউদ্দিন, সরফরাজ খান ও নবাব আলিবর্দি খানের কর্মচারী ছিলেন। পরে পুত্র রাজবন্ধুত্বও নবাবের কর্মচারী হন। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহর সেনাপতি হয়েও রায়দুর্লভ যুদ্ধ না করে সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতাই সিরাজের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। এর পুরক্ষার হিসেবে মিরজাফরের কাছ থেকে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন।

**রাজবন্ধুত্ব সেন** (১৬৯৮-১৭৬০): দক্ষিণ বিক্রমপুরে অর্থাৎ শরীয়তপুরে রাজবন্ধুত্বের জন্ম ১৬৯৮ সালে। পিতা রায়দুর্লভ রাম। পিতা ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাহর বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি। রাজবন্ধুত্ব বাংলার সুবেদারের বকশী ছিলেন, পরে সিরাজের খালসার মুদ্রাধিকারী হন। রাজস্ব আত্মসাতের জন্য তিনি কারারুচ্ছ হন। মিরজাফরের আমলে তিনি সুবার দেওয়ানি লাভ করেন। মীর কাসিমের সময়েও তিনি ওই পদে ছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে রাজবন্ধুত্বন সেন ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণবন্ধুত্ব সেনকে মীর কাসিম পদ্মায় ডুবিয়ে হত্যা করেন। একসময় কীর্তিনাশার ভঙ্গে রাজবন্ধুত্বের প্রাসাদ বিলীন হয়ে যায়। রাজবন্ধুত্বের পঞ্চম অধিকন্তু কল্যান ঘরের পুত্র প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার।

**হাজী শরীয়তুল্লাহ** (১৭৮১-১৮৪০): জন্ম মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার শামাইল গ্রামে ১৭৮১ সালে। ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। সাধারণ মুসলিম পরিবারে জন্ম। আট বছর বয়সে পিতা আব্দুল জলিল তালুকদার প্রাণ্যাত্মক করলে পিতৃব্য আজিমুদ্দীনের গৃহে আশ্রয় লাভ। বারো বছর বয়সে পিতৃব্য-গৃহ থেকে পলায়ন করে কলকাতায় গমন। সেখানে মওলানা বশারত আলীর নিকট কুরআন পাঠ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। হৃগলী জেলার ফুরফুরায় দুই বছর ও মুর্শিদাবাদে এক বছর আরবি ও ফারসি ভাষা অধ্যয়ন। ১৭৯৯-তে আঠারো বছর বয়সে তাঁর ওশন মওলানা বশারত আলীর সঙ্গে মকায় গমন। সেখানে মওলানা মুরাদের কাছে দুই বছর ও বিখ্যাত পণ্ডিত তাহির কাছে চৌদ বছর আরবি ভাষা ও ইসলামিক শাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ। এরপর কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর ইমালামিক বিদ্যা অধ্যয়ন। ওয়াহাবি মতবাদে অনুপ্রাপ্তি হয়ে ১৮১৮-তে আরবদেশ থেকে জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন। মুসলমানদের মধ্যে অক্ত্রিম ইসলামিক বিধি-বিধান চালু করার জন্য তৎকর্ত্ত্ব আন্দোলন শুরু। এক সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ) ও এক রাসূলের (হ্যারত মুহাম্মদ) উপর বিশ্বাস স্থাপন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, রমজান মাসে রোজা রাখা, সক্ষম ব্যক্তির হজব্রত পালন ও জাকাত দান প্রভৃতি ইসলামিক 'ফরজ' আদায়ের জন্যে মুসলমান সমাজে প্রচার চালান। 'ফরজ' কথা থেকে তাঁর আন্দোলন 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে আখ্যায়িত। ১৮২০-এ দ্বিতীয়বার মকায় গমন। তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ও শিক্ষক তাহির নিকট থেকে

বাংলাদেশে ইসলামিক সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি নিয়ে বাহাদুরপুরে প্রত্যাবর্তন। মুসলমান সমাজে প্রচলিত শেরেক ও বিদাতের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান পরিচালনা। কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, পিরপূজা, কবরপূজা, গীতপূজা প্রভৃতি শেরেকি কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলমানদের উপদেশ প্রদান। এছাড়া হিন্দু জমিদারদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পৈতানুষ্ঠান, রথযাত্রা ও দুর্গাপূজার জন্য কর প্রদান না করার জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দান। তাঁর এই আদেশ মতে অনুসারীরা এ-সকল খাজনা দেয়া বন্ধ করলে হিন্দু-জমিদার ও তাদের মিত্র নীলকুঠিয়ালদের কাছ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। হিন্দু-জমিদাররা ক্রমে হয়ে ফরায়েজিদের দাড়ির উপর কর আরোপ করেন ও তাদের জমিদারিতে গরু জবাই নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে জমিদারদের সঙ্গে ফরায়েজিদের তীব্র দম্প দেখা দেয়। সরকারি প্রশাসন যত্ন জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করায় হাজী শরিয়তুল্লাহ অনেক বার গ্রেফতার হন। শরিয়তুল্লাহর এই সংস্কার আন্দোলন কালক্রমে ইংরেজ-শাসনবিরোধী আন্দোলনে রূপধারণ। ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসকদের দ্বারা ক্বালিত হওয়ায় তৎ-কর্তৃক একে ‘দারুল-হরব’ বলে ঘোষণা। কাজেই এদেশে জুমা ও ঈদের নামাজ না পড়ার জন্য তৎ-কর্তৃক ফতোয়া জারি। হাজী শরিয়তুল্লাহর এ-আন্দোলন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় জনপ্রিয়তা অর্জন। তিনি শুধু একজন ধর্মীয় সংস্কারক নন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠারও একজন দিশারী। ক্ষেত্রে, তাঁতি তথা শ্রমজীবী মানুষকে যুগ-যুগের শোষণ-বঞ্চনা থেকে এবং বিদেশি শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য তৎকর্তৃক তাঁর এই সংস্কারক আন্দোলন পরিচালনা। মৃত্যু, মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার বাহাদুরপুর গ্রামে ১৮৪০ সালে।<sup>১৫</sup>

**পুলিনবিহারী দাস (১৮৭৭-১৯৪৯):** জন্ম নড়িয়ার লোনসিংহ গ্রামে ১৮৭৭ সালের ২৪ জানুয়ারি। পিতা নবকুমার দাস। ১৮৯৪ সালে ফরিদপুর জিলা ক্ষেত্রে এন্ট্রাঙ্গ পাস। ১৯০৩ সালে তিনি ঢাকার টিকটুলিতে আখড়া স্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে তিনি ঢাকার শ্রীরামপুরের বিখ্যাত লাঠিয়াল ওস্তাদ মুর্তজা সাহেবের কাছে লাঠি ও তরবারি খেলা শেখেন। ১৯০৬ সাল থেকে তিনি বিপ্লবের আকাঞ্চায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯০৭ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই সমিতির সর্বাধিনায়ক। বিভিন্ন সময়ে তিনি ১০ বছর কারাভোগ করেন। ১৯২৫ সালে কলকাতায় বিদ্যাসাগর স্ট্রিটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি ও আখড়া স্থাপন করে লাঠিখেলা ও ছুরিচালনা শেখাতে থাকেন। এসব বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করেন। ১৯৪৯ সালের ১৭ আগস্ট ব্যায়াম সমিতির মাঠেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**আবদুল আজিজ মুনশি খানসাহেব (১৮৮৫-১৯৪৯):** জন্ম নড়িয়া উপজেলার চরআত্তায় ১৮৮৫ সালে। পিতা মেছের আলী মুনশি। চরআত্তা ইউনিয়ন পরিষদের আম্যুত্য প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ফরিদপুর জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬ সালে শরীয়তপুর মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে এলাকা থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। মাদারীপুর ইসলামিয়া ইউনাইটেড উচ্চবিদ্যালয় ও নাজিমউদ্দিন মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে। ১৯৪৯ সালে ১ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**আন্তোষ কাহালী (১৮৯১-১৯৬৫):** পালংএর বিলাসখান গ্রামে জন্ম। পিতা দ্বিতীয় কাহালী। পালং উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করে সিলেটের এক

মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেই সময়েই তিনি বিপুলী মন্ত্রে দীক্ষা নেন। বিপুলী পুলিনবিহারী দাসের সহযোগী হন। বিপুলী কাজের অংশ হিসে চন্দ্রঘোনা ডাকাতি, পলিশের ডিএসপি যতীন্দ্রমোহন ঘোষকে হত্যা এবং ইন্দো-জার্মান ঘড়িয়েস্ত্রে যুক্ত ছিলেন বলে ব্রিটিশ পুলিশ অভিযোগ করেছিল। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। ১৯২৫ সালে আবার কারাবরণ। ১৯২৮ সালে মুক্ত হন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত আবার কারাভোগ। নেতৃত্বে সুভাষ বসু ফরোয়ার্ড বুকে যোগদান। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কারাভোগ। ২৪ বছর কারাভোগের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তিনি ফরিদপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং প্রাদেশিক পরিষদ ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। বিলাস খানে জাতীয় বিদ্যালয়, বিপুলীদের আশ্রয়কেন্দ্র ও অনুশীলন ভবন স্থাপন করে গ্রামেই থাকতেন। অনুশীলনভবনের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে ১৯৬৫ সালের ৭ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**মেজবাহউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (১৮৯১-১৯৫৫):** নড়িয়া উপজেলার কার্তিকপুর গ্রামে জন্ম ১৮৯১ সালে। পিতা কফিলউদ্দিন আহমেদ জমিদার ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ভাগৈ বঙ্গড়ার মোহাম্মদ আলীকে তিনি রাজনীতিতে আনেন। মোহাম্মদ আলী পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর চাচাতো ভাই গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরীও যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতায় চলে যান। ১৯৫৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

**নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী (১৮৯৩-১৯৮০):** গোসাইরহাট উপজেলার দাসের জঙ্গল গ্রামে জন্ম ১৮৯৩ সালের ১৫ জুলাই। পিতা প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী। স্বদেশি আন্দোলন ও সত্যাগ্রহে যোগদান, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ প্রভৃতি বিপুলী কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে গিয়ে তিনি ১৯২৪-১৯২৮ এবং ১৯৩০-৩৮ এই ১৪ বছর কারাভোগ করেন। ময়মনসিংহে তিনি বিপুলী মেয়েদের সংগঠিত করেছেন। কলকাতায় তিনি বিপুলী নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সালের ৮ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**নয়ন শরিফ সরকার (১৮৯৫-১৯৬১):** সখিপুরে জন্ম ১৮৯৫ সালে। পিতা সরফ আলি সরকার। পূর্বমাদারীপুরে তিনি প্রথম মেট্রিকুলেট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কংগ্রেস রাজনীতির সমর্থনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্য লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি এমএলএ নির্বাচনে অংশ নিয়ে পরাজিত হন। সখিপুর ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয় ও চিকন্দি সরফ আলি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন বিশালদেহী মানুষ। তাঁর ওজন ছিল সাড়ে পাঁচমন। ১৯৬১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**আবদুর রশিদ খলিফা (১৮৭৯-১৯৭৯):** জন্ম জাজিরা উপজেলার কাজিয়ারচর গ্রামে ১৮৭৯ সালের ১৫ মার্চ। পিতা জাহান বক্র খলিফা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ-বিটি পাস। পরে ইংলান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় ডিপ্লোমা অর্জন। শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করলেও জেলা পর্যায়ের বিদ্যালয় পরিদর্শকের চাকরি করেন। তাঁর লেখা পুস্তক পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটবুক বোর্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে রাজনীতিতে

এসে ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে জাজিরা-পালং নির্বাচনী এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

**আবদুল করিম (মনাই) দেওয়ান (১৯০০-১৯৮৪):** মনাই দেওয়ান নামে পরিচিত। জন্ম নড়িয়ার চরজুজিরায় ১৯০০ সালে। পিতা বাবু দেওয়ান। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের পরে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। কেদারপুর ইউনিয়নের ৩৬ বছর চেয়ারম্যান ছিলেন একনাগাড়ে। ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৬৫ সালে নড়িয়া এলাক থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। নড়িয়া এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখেন। ১৯৮৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

**আবদুল আহমদ শিকদার (১৯০০-১৯৬৭):** জন্ম ডামুড়া উপজেলার বিশকুড়ি গ্রামে। পিতা জাফর আলী শিকদার। ১৯২০ সালে কনেষ্ঠের উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করে কলকাতা থেকে মোকারশিপ পাস করেন। ১৯২৭ সালে মাদারীপুর মোকার হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মাদারীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। মাদারীপুর শহরের উন্নয়নে তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর নামে মাদারীপুর শহরে একটি সড়ক রয়েছে। ১৯৬৭ সালে আগস্ট মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**গিয়াসউদ্দিন আহমদ চৌধুরী বাদশা মির্বা (১৯০৩-১৯৫৭):** জন্ম নড়িয়ার ডিঙ্গামাপিক গ্রামে ১৯০৩ সালের ৩ জুন। পিতা সিরাজউদ্দিন আহমদ চৌধুরী জমিদার ছিলেন। তিনি ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি লঞ্চ ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি শরীয়তপুর এলাকার মুসলিম আসন থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি বঙ্গীয় সরকারের ডেপুটি চিফ হাইপ মনোনীত হন। ১৯৪২ সালে তিনি ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকারের যুক্তফ্রন্টের স্থানীয় স্বায়ত্ত্বাসন, সমবায় ও রেজিস্ট্রেশন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর সময়েই ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (ডিআইটি, পরে রাজউক) প্রতিষ্ঠা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যালটবাক্স চালু হয়। জমিদার হয়েও তিনি জমিদার-উচ্চেদ আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯৫৭ সালের ৩০ জুন মক্ষাশরিফে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**আবদুর রশিদ সরকার (১৯০৪-১৯৭৪):** জন্ম সখিপুর গ্রামে। পিতা নয়ন শরিফ সরকার। আলীগাড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমএ ও এলএলবি পাস করে ফরিদপুর জজকোর্টে ওকালতি করতেন। ১৯৪৬ সালে তিনি কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইনসভায় পরাজিত হন। ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এমএলএ নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পরাজিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর ফরিদপুরের বাড়ি লুঠ হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**সেকান্দর আলী চৌধুরী (১৯০৫-১৯৬৯):** গোসাইরহাট উপজেলার হাটুরিয়া গ্রামে ১৯০৫ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর জন্ম। পিতা আকবর আলী চৌধুরী। কর্মজীবনের শুরুতে নিজেদের জমিদারি দেখাশোনা করেন। ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য হন।

১৯৩৭ সালে সর্বভারতীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রীর মর্যাদায় ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬৯ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

**আবদুর রহমান বকাউল (১৯১০-১৯৯৪):** ভেদরগঞ্জ উপজেলার চরভাগা গ্রামে জন্ম। পিতা আলী হোসেন বকাউল। মাদারীপুর ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাস করে ঢাকায় যান। বিএ ও এলএলবি পাস করে তিনি ফরিদপুরে ওকালতি করেন। মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি শরীয়তপুর এলাকার এমএনএ নির্বাচিত হন। তিনি ফরিদপুর ইউনিসিপালিটির ভাইসচেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর ছেলে এম আজিজুল হক পুলিশের আইজি, ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন।

**শান্তি সেন (১৯১৩-১৯৮৮):** ভেদরগঞ্জ উপজেলার রামগুদ্রপুর গ্রামে জন্ম ১৯১৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। পিতা নিরাগচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের গেজেটেড কর্মকর্তা। ১৯২৯ সালে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রী দীক্ষা নিয়ে মুগাড়ির দলে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে তিনি গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু পরে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৩৪-৪১, ১৯৫৮-১৯৬২, ১৯৬৫-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৮ বছর কারাভোগ করেন। তিনি পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরে সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অরুণা সেনও বিপ্লবী ছিলেন। তাঁদের পুত্র চতুর্ল সেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা। আজীবন ত্যাগী ও বিপ্লবী এই নেতা ১৯৮৮ সালের ৩১ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

**ডা. গোলাম মাওলা (১৯১৭-১৯৬৭):** নড়িয়া উপজেলার চরমোজার ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে ১৯১৭ সালে তাঁর জন্ম। পিতা আবদুল গফুর ঢালী। নড়িয়া বিহারীলাল উচ্চবিদ্যালয়, জগন্নাথ মহাবিদ্যালয়ে পাঠ শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করেন। পরে ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তিনি দুইবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রসংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বেই মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালের উপনির্বাচনে তিনি যুক্তক্ষন্টের প্রার্থী হিসেবে এমপিএ নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। তিনি মাদারীপুর মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পূর্বপাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সহসভাপতি ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২৯ মে তিনি চর্মরোগে মৃত্যুবরণ করেন।

**সিরাজউদ্দিন আহমেদ (১৯১৭-১৯৭৮):** জন্ম ইদিলপুর ইউনিয়নের মহিষকান্দি গ্রামে ১৯১৭ সালের ১ অক্টোবর। পিতা কফিলউদ্দিন আহমেদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ-বিটি পাস করে মাদারীপুর ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয় ও ইদিলপুর উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধানশিক্ষক হিসেবে ২০ বছর (১৯৪০-১৯৬০) দায়িত্ব পালন করেন। একই সময়ে তিনি গোসাইরহাট ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৪০ সাল থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। এরপর ইদিলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন (১৯৬০-৭২ এবং ১৯৭৭-৭৮)। তিনি

ফরিদপুর জেলা কাউপিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে দুইবার প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সরকারের পার্লামেন্টোর সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পান। ১৯৭২ সালে তিনি মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯৭৮ সালের ২৩ মার্চ ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**সেলিম মিয়া (১৯১৮-১৯৭১):** জন্ম ডাম্ভুড়ার কনেশ্বর গ্রামে ১৯১৮ সালের ৪ মার্চ। পিতা মৌলানা মনু বেগুরী। তিনি ভারতের পাটনায় শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের আশ্রমে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ব্রিটিশ আমল থেকেই তিনি কনেশ্বর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৬৮ সালে শরীয়তপুর জেলার প্রথম মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ডাম্ভুড়ায় ‘পূর্বমাদারীপুর স্নাতক মহাবিদ্যালয়’ নামে। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। এলাকায় দুর্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে সড়ক্যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি গ্রেফতার হন। ফরিদপুর কারাগারে আটকাবস্থায় ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল তিনি আততায়ীর গুলিতে খুন হন।

**আমিনুল ইসলাম দানেশ মিয়া (১৯১৯-২০০৬):** জন্ম জাজিরা উপজেলার কবিরাজকান্দি গ্রামে ১৯১৯ সালের ২০ অক্টোবর। পিতা মুশশি বিনাউল্লাহ। লোনসিংহ উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৪০ সালে মাধ্যমিক ও ১৯৪২ সালে মুঙ্গগঞ্জ হরগঙ্গা মহাবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক, ১৯৫৬ সালে কলকাতা থেকে মোকারশিপ পাস করে মাদারীপুরে মোকারি পেশায় যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগের মাদারীপুর মহকুমা শাখার সহকারী সম্পাদক হিসেবে রাজনৈতিক আসন। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের সমর্থনে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তিনি দীর্ঘদিন মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি জাজিরা আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে অবদান রাখেন। ১৯৭৩ সালে তিনি জাজিরা আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি বাকশাল মাদারীপুর শাখার সম্পাদক হন। তিনি মাদারীপুর পৌরসভার কমিশনারও ছিলেন। ২০০৬ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**অরুণ্গো সেন (১৯২০-২০০৭):** ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতৃী। জন্ম ১৩ অক্টোবর ১৯২০, পালং গ্রামে। পিতা জ্যোতিকাচন্দ্র সেন ছিলেন জমিদার। মাতা ইন্দুবালা সেন। তাঁরা ছিলেন মহারাজা রাজবন্দ্রভের বংশধর। পালং উচ্চবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বড়ভাই শিশির সেন ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। তাঁর প্রভাবে তিনি কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হন এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭ সালে বিপ্লবী শাস্তি সেনের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৪৯ সালে তিনি মাদারীপুর ডোনাভান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সেলাই শিক্ষিকার চাকরি পান। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। রামজন্মপুরে ফিরে তিনি ‘নারী ও শিশুমশল সমিতি’ গঠন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতার পরে ভিন্ন আদর্শের কারণে রক্ষিবাহিনির হাতে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৭৮

সালে তিনি ‘গণতান্ত্রিক মহিলা সংস্থা’ গঠন করে নারীআন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। গ্রামের নিরক্ষর নারীদের শিক্ষা ও কৃষিকাজে উদ্বৃক্ত করতেন। তাঁর পুত্র চতুর্জল সেন গণজ্ঞটের কেন্দ্রীয় নেতা। বিপুরী অরুণা সেন ২০০৭ সালের ৫ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।<sup>২৬</sup>



পুলিনবিহারী দাস



আবিদুর রেজা খান



আবদুর রহমান বকাউল



গোলাম মাওলা



আমিনুল ইসলাম দামেশ রিয়া



রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী



শান্তি সেন



আবদুর রাজাক



শঙ্কর আচার্য

**রঞ্জিনীকান্ত ঘটকচৌধুরী (১৯২১-১৯৮৮)**: জন্ম. দক্ষিণ বালুচর গ্রাম, পালং, শরীয়তপুর, ২৬ ডিসেম্বর ১৯২১। লেখক। জমিদার পরিবারে জন্ম। তুলাসার গুরুদাস স্কুল থেকে মেট্রিক পাস (১৯৩৯)। শাস্তিনিকেতনের শিক্ষা ভবনে ভর্তি। সেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস (১৯৪১)। কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন। ছাত্রজীবনেই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। অনুশীলন দলের সদস্য। ১৯৪৩-এ কমিউনিস্ট পার্টির যোগদান। পরের বছর পার্টির ফরিদপুর জেলা সংগঠকের পদ লাভ (১৯৪৪)। ১৯৪৭-এ পার্টির ফরিদপুর জেলা কমিটির সদস্য হন। পার্টির সদস্য বাণী বন্দেয়াপাধ্যায়ে বুসঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৪৮-১৯৫০ পর্যন্ত কলকাতায় বাস। দেশে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। পালং স্কুলে শিক্ষকতার কর্মে যোগদান (১৯৫০)। ১৯৫৪-তে পালং তুলাসার গুরুদাস স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত। ১৯৫৭-তে পালং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। একটানা ছবিবিশ বছর এ-পদে দায়িত্ব পালন (১৯৫৭-১৯৮৩)। পালং তুলাসার গুরুদাস স্কুলের মাঠে সঙ্গাহব্যাপী এক আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠান (মার্চ ১৯৫৭)-এর আয়োজক। ১৯৬১-তে 'ঢাকা দক্ষিণ-পূর্ব রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পরিষদ' গঠন। ইস্টবেঙ্গল ইনসিটিউশনে (সদরঘাট, ঢাকা) অনুষ্ঠিত পরিষদের এ-উৎসবে নেতৃত্ব প্রদান।<sup>১৭</sup> ১৯৭১-এ পালং থানায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। বাঙালি সংস্কৃতির একজন নিষ্ঠাবান সেবক। ১৯৭৮ সালে তিনি সাম্যবাদী রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারায় ঝুঁকে পড়েন। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। মৃত্যু. সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল (ঢাকা), ১৫ জুন ১৯৮৮।

**আবিদুর রেজা খান (১৯২৭-০২০০৫)**: ভেদরগঞ্জ উপজেলার দিগর মহিমখালী গ্রামে জন্ম ১৯২৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। পিতা আবদুল হাকিম খান। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি। ফেনীতে মহকুমা আসন্নার এডজুটেন্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ১৯৬০ সালে ঢাকার ছেড়ে ঢাকায় ওকালতি করেন। ১৯৮৬ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ সালে ভেদরগঞ্জ-গোসাইরহাট এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের প্রাথী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭২-র সংবিধান রচনায় অবদান রাখেন। ১৯৭৩ সালে একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে মাদারীপুরের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব লাভ। ১৯৭৮ সালে তিনি মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন খণ্ডিত আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে জাতীয় কমিটির সহসভাপতি হন। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে তিনি এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে তিনি আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন। তিনি একাধিকবার জেলা শরীয়তপুর আওয়ামী লীগেরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। শরীয়তপুর মহকুমা বাস্তায়নে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে। ২০০৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

**শামসুর রহমান (১৯৩৫-১৯৯১)**: জন্ম জাজিরা উপজেলার কাওয়ান্দি গ্রামে। পিতা আলফাজউদ্দিন আহমদ। বি-এ-এলএলবি পাস করে তিনি মাদারীপুর ও চিকন্দিতে

ওকালতি করেন। পাকিস্তান আমলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতা ছিলেন। ১৯৬৫ সালে জাজিরা এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিনি জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৩ ডিসেম্বর ক্যাপ্সারে আক্রমণ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

**আবদুর রাজ্জাক (১৯৪০-২০০১)**: জন্ম ডামুড়া থানার দক্ষিণ ডামুড়া গ্রামে। পিতা ইয়ামাউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ও এলএলবি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রলিঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির দুইবার (১৯৬৫-১৯৬৭) সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ৬২-র শিক্ষাআন্দোলন, ৬৬-র ৬ দফা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান প্রতিটি আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৬৯-৭০ সালে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনির প্রধান ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও মেঘালয় সেন্টারের মুজিব বাহিনির প্রধান ছিলেন। ১৯৭২-৭৫ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ক্রক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৮-১৯৮১ পর্যন্ত দুইবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি আওয়ামী লীগ ছেড়ে বাকশাল পুনর্গঠন করে সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগে ফিরে এসে প্রেসিডিয়াম সদস্য হন। রাজনৈতিক জীবনে ৫ বছর কারাভোগ করেছেন। ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে ভেদরগঞ্জ-ডামুড়া আসনে, ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে কালকিনি এলাকা, ১৯৯১ সালে শরীয়তপুর ও মাদারীপুরের ২টি আসন থেকে, ১৯৯৬ সালে শরীয়তপুরের দুটি আসন থেকে, এবং ২০০১ সালে শরীয়তপুর ও ফরিদপুরের দুটি আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৯৬-২০০১ সালে তিনি পানিসম্পদ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের সঙ্গে পানিচুক্তি স্বাক্ষরে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। খুলনা-মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চট্টগ্রাম বাসসার্ভিস চালু ও মেঘনায় ফেরির ব্যবস্থা করে তিনি যাতায়াত ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করেন।

**এক্ষণএম নূরুল হক (১৯৪৩-১৯৭৩)**: জন্ম নড়িয়ার সালধ গ্রামে ১৯৪৩ সালের ১০ জানুয়ারি। পিতা জানে আলম হাওলাদার। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ। ছাত্রলিঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা ছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নড়িয়া থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু জয়ের ২ মাস পরে আততায়ীর গুলিতে শহিদ হন।

**সিরাজ শিকদার (১৯৪৪-১৯৭৫)**: জন্ম শরীয়তপুর, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪। রাজনৈতিকিদ। সার্কেল অফিসার আবদুর রাজ্জাক শিকদার তাঁর পিতা। ১৯৫৯-এ বরিশাল জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এস.সি. পাস করে ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন-এ যোগদান। ১৯৬৫-তে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট (১৯৫৪-তে বেআইনি ঘোষিত) পার্টির ঢাকা জেলা কমিটির কংগ্রেস (গোপন) ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান। ১৯৬৭-তে সিলিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ১৯৬৭-তে ছাত্র ইউনিয়ন [মেনন গ্রুপ]-এর

কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি পদে নির্বাচিত। সি.অ্যান্ড.বি.-তে তিনি মাস চাকরি করার পরে 'ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড' নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়ে টেকনাফ গমন। ১৯৬৮-র ৮ জানুয়ারি 'পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলন' গঠিত হলে ১৯৬৮-র শেষের দিকে চাকরি ছেড়ে ঢাকায় ফিরে এসে 'মাও-সে-তুঙ গবেষণাকেন্দ্র' গঠন করেন। কিন্তু জামাতে ইসলামীর জোর দাবির মুখে আইয়ুব সরকার গবেষণাকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়। ১৯৭০-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজে প্রভাষকরূপে যোগদান। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যায়জ শুরু করার পর পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলনের বিপুরী পরিষদের পক্ষ থেকে ২৩ এপ্রিল সংগঠনের কর্মদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত দলিলে গ্রামাঞ্চলে কীভাবে সর্বহারা রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি লিপিবদ্ধ করেন। ৩০ এপ্রিল ১৯৭১-এ বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠিতে পূর্ববাংলার শশস্ত্র দেশপ্রেমিক বাহিনী গঠন। যুদ্ধের মাঝেই ৩ জুন স্বরূপকাঠির পেয়ারাবাগানে শ্রমিক-ক্ষমকদের রাজনৈতিক দল 'পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি' গঠন। স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। তাঁর দল একই সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবর্তীর্ণ হয়। ১৯৭২-এর ১৪ জানুয়ারি সর্বহারা পার্টির প্রথম কংগ্রেসে তিনি সভাপতি হন। ১৯৭৩-এর ২০ এপ্রিল এগারোটি গণ-সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমষ্টিয়ে গঠিত 'পূর্ববাংলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট'-এর তিনি সভাপতি হন। স্বাধীনতা উত্তরকালে বঙ্গবন্ধু সরকারের (১৯৭২-১৯৭৫) বিরোধিতা করেন। ১৯৭৪-এর ২৮ ডিসেম্বর সরকার দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে আত্মগোপন। ১৯৭৫-এর ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের হালি শহরে গোয়েন্দাবাহিনীর হাতে গ্রেফতারবরণ করেন। ২ জানুয়ারি সাভারের রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে প্রেরণকালে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা কবিতার বই আছে।<sup>১৮</sup>

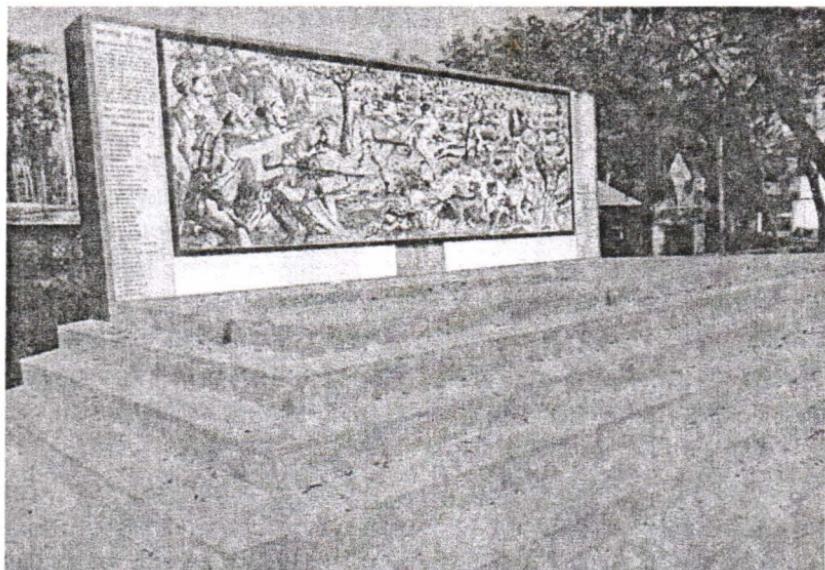
**এমএ রেজা (১৯৪৭-২০০১):** ভেদরগঞ্জ উপজেলার কার্তিকপুরে জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। পিতা মাইনুল হক শিকদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসএস। ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। জগন্নাথ কলেজে ছাত্রলীগের প্রার্থী হিসেবে ১৯৬৭-১৯৬৮-তে সহসভাপতি ও ১৯৬৮-৬৯-এ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পূর্বপাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৭১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বিশেষ সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭১ সালে ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিদানের পর তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভাষণ দেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে সহযোগিতা করার অভিযোগে কারাবরণ করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে থেকে বেরিয়ে তিনি মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে খণ্ডিত আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৮৪ সালে তিনি জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৯৮ সালে ভেদরগঞ্জ-ভামুড়া-গোসাইরহাট আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নিজ নামে তিনি এলাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০১ সালের ৯ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### ঞ. মুক্তিযুদ্ধ

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীয়তপুরের রয়েছে সংগ্রামী ঐতিহ্য। শরীয়তপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা ও কবি মফিজুল ইসলাম। জননেতা আবদুর রাজ্জাক, কর্নেল শওকত আলী প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তারপর বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও যাচাই করে এটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমা (বর্তমান শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা) এর এমএনএ আবিদুর রেজা খান, ডা. এমএ কাশেম, ফগীভূষণ মজুমদার এবং এমপিএ আব্দুর রাজ্জাক, আমিনুল ইসলাম দানেশ ও আলী আহমেদ খান এবং ক্যাপ্টেন শওকত আলী ও স্টুয়ার্ড মুজিবসহ অনেক নেতা কর্মী বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে মাদারীপুর বাদামতলা সিনেমা হলে এক সভা করেন। সভায় ক্যাপ্টেন শওকত আলীকে মাদারীপুর মহকুমার যুদ্ধকালীন অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয় এবং স্টুয়ার্ড মুজিবকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার জন্য ক্যাপ্টেন শওকত আলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

জাতীয় নেতা আবদুর রাজ্জাক (১৯৪০-২০১১) মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন দক্ষ ও একনিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন। শরীয়তপুর জেলার ডামুড়া উপজেলার দক্ষিণ ডামুড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৯-৭০ সালে তিনি আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশমাতাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে সৃজনশীল ভূমিকা রেখে তিনি অন্যতম দিকপাল হয়ে উঠেন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুজিব বাহিনীর অন্যতম প্রধান হিসেবে ভারতের দেরাদুন ও মেঘালয় সেন্টারে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আবদুর রাজ্জাক গৌরব অর্জন করেন।

শওকত আলী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জানুয়ারি শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার লোনসিং বাহের দীঘিরপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অর্ডেন্যাস কোর-এ কমিশন লাভ করেন। তাঁর দক্ষতার গুণে কর্তৃপক্ষ তাঁকে করাচির নিকটবর্তী মালির ক্যান্টনমেন্টে অর্ডেন্যাস স্কুলের প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি সেখানে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে ক্যাপ্টেন শওকত আলী ‘বাট্ট’ বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য ‘অভিযুক্ত’ (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত) মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯৬৮ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি ঘ্রেফতার হন। ১৯৬৯ সালে বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক গণ আন্দোলনের মুখে আইটুব সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও ক্যাপ্টেন শওকত আলীসহ সকল অভিযুক্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্তি লাভ করেন। একই বছর সেনাবাহিনী থেকে তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন শওকত আলী মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর মাদারীপুর বাদামতলা সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় উপস্থিত নেতৃবন্দ ক্যাপ্টেন শওকত আলীকে মাদারীপুর মহকুমার যুদ্ধকালীন অধিনায়কের দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তী কালে তিনি ২নং সেন্টারে একজন সাব সেন্টার কমান্ডার হিসেবে



#### মুক্তিযুদ্ধের শৃঙ্খলোধ, পালং

মেলাঘরে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তিনি পুনরায় সেনাবাহিনীতে যোগদান করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করার পর কনেল শওকত আলীকে পুনরায় বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরে তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে আহবায়ক হিসেবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত সংগঠনের চেয়ারম্যান।<sup>১৯</sup>

ঐতিহাসিক রেসকোর্স মাঠে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও ২৬ মার্চ তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার আলোকে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, কিশোর-যুবক-পৌড় নারী-পুরুষ আপামর জনতাকে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

**পালং ধানা সংগ্রাম পরিষদ:** একান্তরে ১০ মার্চ এক সভায় মুজিবের রহমান চৌধুরীকে সভাপতি ও আলী আজম সিকদারকে সেক্রেটারি করে পালং ধানা আওয়ামীলীগের সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। অতপর ৩১ মার্চ পালং তুলিসার গুরুদাস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল সমাবেশে কবি রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীকে আহবায়ক করে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ওই সভায় মুজিবের রহমান চৌধুরী, আলী আজম শিকদার, রথীন্দ্রনাথ ঘটকচৌধুরী, সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম জাফর মীর ও আবুল ফজল মাস্টার, আব্দুর রব মুস্তী, এইচএস সিরাজ উদ্দিন, একেএম নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

**বিভিন্ন থানার সংগ্রাম পরিষদ:** বিভিন্ন থানার সংগ্রাম কমিটির নাম নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

থানার নাম	সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি	সংগ্রাম পরিষদের সেক্রেটারি
ভেদরগঞ্জ	আবদুল হাই মাস্টার	হোসেন খান
জাজিরা	আবদুল মালেক মাল	সাহাবুদ্দিন মাস্টার
গোসাইরহাট	জালাল আহমেদ শিকদার	ফজলুর রহমান বেপারী
নড়িয়া	সাইদুর রহমান মল্লিক	তথ্য পাওয়া যায় নাই

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ারলেসের মাধ্যমে ২৬ মার্চ যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

Message to all citizens of Bangladesh and also people of the world. Pakistani army forces suddenly attacked the E.P.R. base and Police base of Pilkhana and Rajarbag, Dacca from 00.00 hour of 26<sup>th</sup> March. Killing large people, battle is going on with E.P.R. and Police forces. People are fighting allightly with army. Every people of Bangladesh resist the arm force of every corner of Bangladesh.

May Allah Peace and help our struggle for freedom of Bangladesh!

-Sk. Mujibur Rahman.

উক্ত ঘোষণা দেশের বিভিন্ন থানায় পৌছে এবং স্ব স্ব থানার ওয়ারলেস অপারেটরগণ তা রিসিভ করেন। পালং থানায় এটি রিসিভ করেন আবদুস সালেক খান আর তা অনুবাদ করেন এ কে এম নুরুল ইসলাম চৌধুরী। উক্ত ঘোষণা বাংলায় অনুবাদ করে তাঁর কার্বন কপি থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে পৌছানোর ব্যবস্থা করেন তারা হলেন জালাল উদ্দিন আহমেদ, মনোজ কুমার অধিকারী ও সুলতান মাহমুদ সীমন প্রমুখ। পরে সুলতান মাহমুদ সীমন (বর্তমানে প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) বাংলায় অনুদিত মেসেজটি দি নিউ আর্ট প্রেস (বর্তমানে রোকেন আর্ট প্রেস) থেকে ছাপিয়ে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন। জেলার অন্যান্য থানার যারা বার্তাটি রিসিভ, অনুবাদ ও প্রচার করেন তারা হলেন:

থানার নাম	ওয়ারলেস অপারেটর	অনুবাদক
ভেদরগঞ্জ	আব্দুর রব	আবদুল হাই মাস্টার
জাজিরা	সিরাজুল ইসলাম খান	আব্দুস শকুর মাস্টার
নড়িয়া	মো. গুলজার	তথ্য পাওয়া যায় নাই
গোসাইরহাট	তথ্য পাওয়া যায় নাই	তথ্য পাওয়া যায় নাই

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পূর্ব মাদারীপুরের (বর্তমান শরীয়তপুর) নড়িয়া, পালং, ভেদরগঞ্জ, গোসাইরহাট ও জাজিরা থানার বিভিন্ন স্থানে কিশোর-তরুণদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। কাঠের ডামি অস্ত্র ও বাঁশের লাঠি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিভিন্ন থানার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত একপ প্রশিক্ষণ পাকিস্তানি সেনা ও এ-দেশের দালালদের অন্যায়-অত্যাচার, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা-ধর্ষণের বিরুদ্ধে রাখ্যে দাঁড়াতে মনোবল যোগায় তথা মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে কিশোর-তরুণদের অধিকতর উৎসাহিত করে। শরীয়তপুর জেলা (তৎকালীন পূর্ব মাদারীপুর) এর ৫(পাঁচ)টি থানার বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

নড়িয়া থানায় প্রশিক্ষণ হতো নদীর পাড়ের মাঠ (বর্তমান সিনেমা হলের পাশে)। এর উদ্যোগটা ছিলেন ইউনুচ আলী থান মিতালী এবং প্রশিক্ষক ছিলেন সুবেদার হক। পালং থানায় প্রশিক্ষণ হতো তৃতীয় স্থানে। পালং তুলাসার গুরুদাস হাইকুল মাঠের উদ্যোগটা ছিলেন কবি রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী আর প্রশিক্ষক ছিলেন সেনাসদস্য আব্দুল কাদের মাস্টার। বৃন্দুকের হাইকুল মাঠের উদ্যোগটা ছিলেন এ্যাডভোকেট আবুল কাশেম মুখ্যা, আর প্রশিক্ষক ছিলেন আনসার কমান্ডার আবদুল গফুর মোল্লা ও ফজলুর রহমান সরদার। বিনোদপুর সুবেদারকান্ডি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠের উদ্যোগটা ছিলেন কবি মফিজুল ইসলাম আর প্রশিক্ষক ছিলেন হাবিলদার আবুল কালাম আজাদ ও পুলিশ সদস্য ইসমাইল মাদবর। জাজিরা থানায় জাজিরাহাট মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় (বর্তমান সিনেমা হলের পাশে) ভবনে উদ্যোগটা ছিলেন আবদুল মালেক মাল আর প্রশিক্ষক ছিলেন সেনাসদস্য আবদুস সামাদ মুস্তি। ভেদরগঞ্জ সাজনপুর হাইকুল মাঠে উদ্যোগটা ছিলেন লাল শরীফ মোড়ুল ও প্রশিক্ষক ছিলেন আনসার কমান্ডার আবদুল গনি খান। গোসাইরহাটে কোদালপুর হাইকুল মাঠের উদ্যোগটা ছিলেন ইকবাল আহমেদ বাচু ছৈয়াল এবং প্রশিক্ষক ছিলেন আসনার কমান্ডার আবদুস সামাদ মুখ্যা। নলমুড়ি ইউনিয়ন মাঠের উদ্যোগটা ছিলেন মোশারফ হোসেন (নোয়াব মিয়া) আর প্রশিক্ষক ছিলেন আনসার সদস্য শাহ আলাম।

স্থানীয় শাস্তি কমিটি, রাজাকার, আল বদর, আল শামস্ তথা স্বাধীনতা বিরোধীদের বিষয়টি খেয়াল করে সামাজিক-প্রশাসনিক-রাজনৈতিক উভয় ফ্রন্টের শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা; উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সময়োচিত যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়া, আক্রমণ কৌশল নির্ধারণ ও আক্রমণের মাধ্যমে শক্তিপক্ষকে পর্যন্ত করে তাদের অস্ত্রপাতি হস্তগত করা তথা অধিনস্ত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা প্রত্বতি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পূর্ব মাদারীপুরে যুদ্ধকালীন আঞ্চলিক কমান্ডার ও বিভিন্ন থানায় যুদ্ধকালীন থানা কমান্ডার নিয়োগ দেয়া হয়। আঞ্চলিক কমান্ডার ছিলেন ইউনুচ আলী থান মিতালী আর ডেপুটি আঞ্চলিক কমান্ডার আনোয়ার হোসেন মিন্টু।

জেলার যুদ্ধকালীন থানা কমান্ডার ও ডেপুটি কমান্ডার হলেন যথাক্রমে পালং থানায় এইচ.এম. ইদ্রিস আলী ও আ্যাডভোকেট আবুল কাশেম মুখ্যা, নড়িয়া থানায় এসএম কামাল উদ্দিন মন্টু ও শাহদার হোসেন (জেমস্ বাবুল), ভেদরগঞ্জ থানায় আব্দুল মল্লান রাড়ী ও মো. ইউসুফ খান, গোসাইরহাট থানায় ইকবাল আহমেদ বাচু ছৈয়াল ও মো. ওহাব, জাজিরা থানায় আব্দুর রহমান খান ও মো. ফজলুল হক মাদবর।

যুদ্ধকালীন মুজিব বাহিনীর পালং থানার লিডার হলেন আবুল ফজল মাস্টার এবং ডেপুটি লিডার এম.এ. সান্তোষ খান; জাজিরা থানার লিডার মো. ইউনিস খলিফা ও ডেপুটি লিডার মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ; নড়িয়া থানার লিডার লে. কর্নেল আলমগীর হাওলাদার। ভেদরগঞ্জ থানার লিডার শাহজাহান মুস্তি, ডেপুটি লিডার তোফাজ্জল মোড়ুল। গোসাইরহাট থানার তথ্য পাওয়া যায় নাই।

একান্তর সালের ১৯ জুলাই স্টুয়ার্ড মুজিবের নেতৃত্বে ২৫ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দুর্ধর্ষ গেরিলা দল ভেদরগঞ্জ থানা আক্রমণ করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী পুলিশ-রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে হালকা ও সাধারণ অস্ত্রে কেবল অদম্য সাহস ও ঘনোবল নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে তারা লিপ্ত হন। আর এ-যুদ্ধে শহীদ হন বীর মুক্তিযোদ্ধা আকাছ আলী মিয়া। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি শরীয়তপুরের প্রথম শহীদ। তাঁর নামে এ-অঞ্চলে আকাছ বাহিনী গঠিত হয়। আকাছ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন সুবেদার জয়নাল আহমেদ এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন হাবিলদার মো. বক্র। শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার তেলিপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ আলী দেওয়ান এক্সপ্রেসিভ হ্রপের একজন কমান্ডার ছিলেন। তিনি মাদারীপুর-বরিশাল মহা সড়কে ফরিদপুর পর্যন্ত কাজ করেন।

শরীয়তপুর সদরের স্বর্ণঘোষ গ্রামের আবদুস সামাদ মাস্টার এই জেলায় নৌকমাড়ো বাহিনির প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধে অংশ নেন। নড়িয়া উপজেলার বিঝারী ইউনিয়নের কান্দিগাঁও গ্রামের সুলতান মাহমুদ সীমন (বর্তমানে প্রসিকিউটর, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) মেলাঘরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তাঁর মেধা, যোগ্যতা ও কর্ম দক্ষতার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২২ সেপ্টেম্বর মেলাঘরে ফরিদপুর কোম্পানির স্টাফ অফিসার পদে নিয়োগ প্রদান করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা সুলতান মাহমুদ সীমন দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এ-দায়িত্ব পালন করেন। নড়িয়া উপজেলার নড়িয়া গ্রামের মো. দিদারুল ইসলাম মেলাঘর পৌছলে সাব সেন্টার কমান্ডার শওকত আলীর নির্দেশ অনুযায়ী মেলাঘরে প্রশিক্ষণ শেষে বিশ্রামে থাকা ৮০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে তিনি শরীয়তপুর (তৎকালীন পূর্বমাদারীপুর) আসেন এবং নির্দেশনা মোতাবেক যে যেই থানার অধিবাসী তাকে সেই থানার ক্যাম্পে পৌছে দিয়ে তিনি নিয়মতাত্ত্বিকভাবে এলাকায় কাজ করেন।

শরীয়তপুরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে শরীয়তপুরবাসীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করেছেন কয়েকজন নারী-মুক্তিযোদ্ধা। তাঁদের মধ্যে মাজেদা শওকত আলী, অধ্যাপিকা খালেদা খানম, ফজিলাতুননেছা, রূপা খান প্রমুখ।

### ট. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শরীয়তপুর জেলায় জনপ্রিয়কারী অজস্র গায়ক, শিল্পী ও কবিয়াল রয়েছেন, যাঁরা শরীয়তপুরের গাঁও পেরিয়ে সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কেউ কেউ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমগ্নিতে পরিচিতি অর্জন করেছেন। বিখ্যাত কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

**দাইয়ুন্দিন বয়াতী (১৮৫০-১৯০৮):** জন্ম পালংয়ের কন্দুকর ইউনিয়নে মাকশাহার গ্রামে। পিতা বরকতউল্লাহ বয়াতী। পিতার কাছে সংগীতে হাতেখড়ি। জারিগায়ক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি জারিগানের অনেক সাগরেদ তৈরি করেছিলেন বলে ‘বয়াতীর গুরু’ উপাধি পেয়েছিলেন। লাঠিখেলাতেও ওস্তাদ ছিলেন তিনি। একবার লাঠিখেলাকে কেন্দ্র করে একটি খুনের ঘটনায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। হাজতে বসে তিনি গান গাইতেন। তাঁর গান শুনে মুঝ হয়ে অন্য আসামিরা বিচারককে জানালে বিচারক তাঁকে বেকসুর খালাস দেন। তিনি অজস্র গান লিখলেও তাঁর হাদিস পাওয়া যায় না। রহীন্দ্রনাথ ঘটকচৌধুরী তাঁর দুটি গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর একটি হলো-

আমার দেখে ছন্দ লাগে ধন্দ মন্দ কথা

বেটায় কোথায় বসে বলে কথা

আর কে তাহারে জোগায় কথা

ঠিক করা গেল না সে থাকে কোথা।

...

আরো পরের মুখে অন্ন দিয়ে হাপনে অন্ন খায়

ও তাই দাইয়ুন্দি কয় গুরে মলেম চিলেম না কো মহাশয়।

তাঁর শেখানো পথে তাঁর ছেলে কফিলউদ্দিন নামকরা লোকগায়ক হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে দাইয়ুন্দিন বয়াতী মৃত্যুবরণ করেন।<sup>১০</sup>

**আনন্দনাথ রায় (১৮৫৫-১৯২৫):** শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার জপসা গ্রামে ১৮৫৫ সালে তাঁর জন্ম। পিতা হরনাথ সেন জমিদার গোপীরমণ সেন থাসনবিশের বংশধর। নড়িয়ায় স্থানীয় বাংলা স্কুল ও বরিশালে জেলা স্কুলে পড়ালেখা করেন। ছেটভাই নগেন্দ্রনাথ সেনকে জমিদারিত ভার দিয়ে তিনি ইতিহাস-গবেষণায় ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৮১ সালে রমাকান্ত সেন ছন্দনামে ‘ললিতকুসুম’ নাটক রচনা করেন। ১৮৮৮-৮৯ সালে জপসা গ্রাম কীর্তিনাশয় বিলীন হলে তিনি কলকাতায় চলে যান। ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন। ১৯১৫ সালের তাঁর সভাপতিত্বে দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ‘বারভূইয়া’, ‘ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড’ (১৯০৮), ‘ফরিদপুরের ইতিহাস ২য় খণ্ড’ (১৯২১) রচনা করেন। তিনি সাহিত্যশেখের উপাধি লাভ করেন। বৃহত্তর ফরিদপুরের স্থাননাম, প্রত্নসম্পদ ও অভীত ইতিহাসের অনুসন্ধানে তিনি আম্যুত্য ব্যাপ্ত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। এসময় স্ত্রী বিয়োগ হলে তিনি সংসারবিরাগী হন এবং আত্মায়জনের অজ্ঞাতসারেই মৃত্যুবরণ করেন।

**জানশরীফ সুরেশ্বরী (১৮৫৬-১৯১১):** হ্যরত মাওলানা শাহ আহমদ আলী ওরফে হ্যরত জানশরীফ শাহ সুরেশ্বরী ১২৬৩ সালের ২রা অগ্রহায়ণ নাড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা হ্যরত শাহ সুফি মেহেরউল্লাহ (রহ.)। কঠোর বেয়াজকারী সাধক সুফি সাহেব সর্বত্র সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন এবং এখনও মানুষ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। কথিত আছে, সুফি সাহেবের গাভী অপরের ক্ষেত্রে ঘাস বা ফসলাদি খেলে বা নষ্ট করলে তিনি তিন দিন ঐ গাভীর দুধ খেতে না। অই দুধ যার অনিষ্ট হয়েছে, তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন।

খাবার-দ্বাবারে তিনি অত্যন্ত সাধারণ ছিলেন। সারা জীবন তিনি এক পদের তরকারি দিয়ে ভাত খেতেন। তিনি ছিলেন মোজাদ্দেদিয়া তুরিকার মুরিদ। কিন্তু অন্যান্য বহু তুরিকার বিশেষত চিশ্তিয়া ও কাদেরিয়া তুরিকার ইয়ামগণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। তাঁর নিকটে কেউ মুরিদ হতে এলে আসলে তার সঙ্গে আলাপ করলে বুঝে নিতেন যে তিনি কোন মানসিকতার লোক হবেন। তাই অবস্থা বুঝে কাউকে মোজাদ্দেদিয়া, কাউকে চিশ্তিয়া অথবা কাদেরিয়া এবং কাউকে সাজলিয়া কিংবা কলন্দরিয়া তুরিকায় মুরিদ করতেন এবং বলতেন ‘বাবা আমি তোমাকে অমুক তুরিকায় মুরিদ করে ঐ তুরিকার ফায়েজ দিচ্ছি।’ হ্যারত সুরেশ্বরী ১৯শে মাঘ থেকে ২১শে মাঘ পর্যন্ত উরস শরিফের প্রতিপালন করে গেছেন। বাংলাদেশের অন্যান্য উরস শরিফের মতো এই উরস শরিফে জীব-জ্ঞ জবেহ করা হয় না। ভাত ও নিরামিষ দিয়ে এই উরস শরিফে তবরক বা খানা প্রস্তুত করা হয়। উল্লেখ্য যে ৫ই পৌর থেকে ২১শে মাঘ পর্যন্ত সুরেশ্বর দরবার শরিফের সীমানার ভেতরেও কোন জীব-জ্ঞ জবেহ করা হয় না। সুরেশ্বরী বাংলা এবং উদুৰ্বু ভাষায় মোট ১৩ (তের) খানা গৃহু রচনা করেছেন। কথিত আছে যে রাতের অন্ধকারে কোনরূপ বাতি ছাড়াই তাঁর গৃহু রচনা করতেন। তাঁর রচিত কিতাব এর মধ্যে ‘সুরেহকু গঞ্জেনুর’, ‘ছফিনায়ে ছফর’, ‘কাওলুল কেরাম’, ‘মদিনা কঞ্চি অবতারের ছফিনা’, ‘সিরারেহকু জামেনুর’, ‘লতায়েফে শাফিয়া’, ‘আইনাইন’, ‘মাতলাউল উলুম’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলা ১৩২৬ সনের ২ৱা অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।<sup>১০</sup>

**শ্রীশ্রীরামঠাকুর** (১৮৬০-১৯৪৯): জন্ম ১৮৬০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নড়িয়ার ডিঙ্গামাণিক গ্রামে। লোকগুরু ও দার্শনিক। পিতা রাধামাধব চক্রবর্তী। মাতা কমলাদেবী। পিতা তৎসাধক ছিলেন বলে বালক বয়সেই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ চর্চায় তিনি গভীর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রথমে পিতা, পরে কুলগুরুর মৃত্যুতে বালক রামঠাকুরের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মানুষের জীবনমৃত্যু কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন তাঁর মনে ঘূরপাক খেতে থাকে। এক অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে গুরুদেবের তাঁকে সিদ্ধ মন্ত্র দেন। এরপর সিদ্ধ পুরুষের মতো তিনি মাঝে মাঝেই ভাববিষ্ট হয়ে পড়তেন। তিনি ১৮৭২ সালে গৃহ্যত্বাগ্রী হন। অনুসন্ধিস্থু বালক পায়ে হেঁটে বন-জঙ্গল-পাহাড়-নদীর অজানা পথ পেরিয়ে আসামের শ্রীশ্রীকামাক্ষ্যাদেবীর মন্দিরে পৌছেন। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে কামাক্ষ্যা মন্দিরে পৌছে গুরুদেবের দেওয়া সিদ্ধ নাম একমনে জপ করার সময় তিনি গুরু শ্রীঅনঙ্গদেবের দেখা পান। কিশোর রামঠাকুর গুরুর নির্দেশে পাহাড়, মরপথ পেরিয়ে গভীর অরণ্যের নিরালায় তপস্যায় বসলেন। শোনা যায়, হিমালয় পর্বতমালায় কখনও কৌশিকাশ্রম, কখনও বশিষ্ঠাশ্রম সহ বহু অজানা স্থানে বছরের পর বছর তপস্যা করে এবং তপস্যার মুনিদের সেবাপূজায় সময় কাটিয়ে তিনি অষ্টসিদ্ধি অর্জন করেন। এর পর গুরুর নির্দেশে লোকালয়ে ফিরে মানবসেবায় নিয়োজিত হন। গুরুর নির্দেশ শিরোধার্য করে নিজের রোজগারে মাত্স্বসেবার জন্য তিনি নোয়াখালির এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে পাচকের কাজ নেন। এরপর রামঠাকুর ফেণী শহরে এক ওভারসিয়ারের অধীনে সরকারি কাজ নেন। সেই সময় নানা জাতের বহু মহিলা কর্ম সূত্রে ফেণী শহরে থাকতেন। তাঁদের আপন জন বলে কেউ ছিল না। ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করে এই সব মহিলাকে যত্ন সহকারে খাওয়াতেন। এদের কেউ অসুস্থ হলে মা বোনের মর্যাদায়

সেবা করতেন। ঠাকুরের এই সেবাপরায়ণতা দেখে তখনকার মহকুমা হাকিম কবি নবীনচন্দ্র সেন রামঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন, পরসেবায় ছিল তার পরমানন্দ। জেলখানার ইটখোলার ঘরে পাবলিক ওয়ার্কস প্রভুদের আনন্দ দিতে কখনও কখনও বারাঙ্গনারা হাজির হত। ঠাকুর তাদেরও রাণ্ডা করে খাওয়াতেন, মাতৃজ্ঞানে সেবায়ত করতেন। তৎকালীন কুসংস্কারছন্ম সমাজে যেখানে হোয়াচুঁয়ির নামে শুচিবাস্তুগ্রন্থ মনোভাব, বর্ষ বৈষম্যের মতো কৃপথার প্রভাব ছিল, তখন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের অক্তদার যুবকের এ হেন আচরণকে সমাজ বিপ্লবের এক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি নবীনচন্দ্র সেন ‘আমার জীবন’ বইয়ের চতুর্থ ভাগে ‘প্রচারক না প্রবক্ষক’ অংশে রামঠাকুরের কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। রামঠাকুর তাঁর জীবনের অর্ধেক সময় লোকচক্ষুর আড়ালে গভীর যোগসাধনায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর কাছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শুচি, অশ্চিত্র কোনও ভেদ ছিল না। লোকালয়ে থাকার প্রায় ৪৫ বছর তিনি মানব মুক্তির দিশা বিতরণ করেছেন। রামঠাকুরের শাশ্বত বাণী ‘শাস্তি হইলেই শাস্তি পাওয়া যায়।’ সকল অশাস্ত্রির অবসানে ‘নাম’ই এক মাত্র সম্ভব। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ১৯৩০ সালে এবং কলকাতায় যাদবপুরে ১৯৪২ সালে কৈবল্যধার তৈরি হয়। ১৯৪৩ সালে তাঁর জন্মভিত্তি ডিঙ্গামানিক গ্রামে সত্যনারায়ণ সেবামন্দির তৈরি হয়। নামপ্রার্থীদের জন্য এক নির্দিষ্ট প্রথায় মোহাস্ত পরম্পরা মারফত নাম বিতরণের তিনি ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। ১৯৪৯ সালের ১ মে ৯০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রামঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ড. যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সমুদ্রেরও একটা কূল আছে, কিন্তু তোমার ঠাকুরের কোনও কূলকিনারা নেই। ভজনের বিভিন্ন প্রঙ্গের সমাধানসূচক জবাব তিনি যে সব চিঠিতে দিয়েছেন, তা নিয়ে তিনি খণ্ডে ‘বেদবাণী’ নামে এক প্রকাশিত হয়েছে।

**গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৯৮১)** জন্ম লোনসিং গ্রামে। প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসেবেই পরিচিত। পিতা অমিকাচরণ ভট্টাচার্য, মাতা শশিমুখী দেবী। লোনসিং হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রাইস পাস (১৯১৩)। স্থানীয় পঞ্জিতসার স্কুলে ও পরে লোনসিং স্কুলে শিক্ষকতা (১৯১৫-১৯১৯) করেন। এ-সময়ে বনে-বাদাড়ে ও বোপাখাড়ে ঘুরে ঘুরে কীট-পতঙ্গের জীবন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।<sup>৩২</sup> এরপর বেঙ্গল চেঘার অফ কমার্সের কাশীপুরস্ত (কলকাতা) পাটকলের টেলিফোন অপারেটরের চাকরিগ্রহণ (১৯১৯)। বিপুরী পুলিনবিহারী দাসের মাধ্যমে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ওপর আগ্রহ থাকায় ‘বসুবিজ্ঞান মন্দিরের’ সহকারী গবেষকের দায়িত্ব পালন (১৯২১-১৯৬৫)। তিনি দশকের অধিককাল যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’ (১৯৪৮)-এর মুখ্যপত্র ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ (১৯৪৮) পত্রিকা সম্পাদনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ‘বাংলার মাকড়সা’ (১৯৪৯), ‘করে দেখ’ (১ম খণ্ড-১৯৫৩, ২য় খণ্ড-১৯৫৬), ‘মহাশূন্যে অভিযান’ (১৯৫৮), ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু’ (১৯৭৬), ‘বাঙ্গলার কীট-পতঙ্গ’ (১৯৭৫), ‘মনে পড়ে’ (আত্মজীবনী, ১৯৭৭), ‘পশুপাখি কীট-পতঙ্গ’ (১৯৮২), ‘বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার’ (১৯৮৪?), ‘বাঙ্গলার গাছপালা’ (১৯৮৬), ‘বিজ্ঞান অমনিবাস’ (১৯৮৭), ‘আধুনিক আবিষ্কার’, ‘জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা খবর’, ‘বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংবাদ’, ‘মানব কল্যাণে পারমাণবিক শক্তি’, ‘আণবিক, বোমা’ (অনুবাদ), ‘মহাশূন্যে অভিযান’ ও ‘জীববিজ্ঞান’ (পাঠ্যপুস্তক)। আনন্দ পুরস্কার (১৯৬৮), বাঙ্গলার কীট-পতঙ্গ গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার (১৯৭৫), আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

বসু স্মৃতিফলক (১৯৭৪) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.এসসি. ডিগ্রি (১৯৮১) লাভ। মৃত্যু, কলকাতা, ৮ এপ্রিল ১৯৮১ ৩০ স্থানীয় কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ পিংপড়ে, মাকড়সা, চামচিকা, টিকিটিকি, আরশোলা, কাকড়া, বিছা, শুয়োপোকা, ব্যাঙাচি, প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীর জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের আচার-আচরণ, ত্রীড়া-কৌতুক, প্রজনন ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণায় মৌলিক গবেষণায় তিনি লোকজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

**কফিলউদ্দিন বয়াতী (১৮৯৭-১৯৪২):** জন্ম জেলার মাকশাহার গ্রামে। পিতা বিখ্যাত জারিয়াল ও লোককবি দাইমুদ্দিন বয়াতী। পিতার কাছে গান শিখেছেন। জীবিকার জন্য রাজমিস্ত্রী পেশায় যুক্ত হন। অজস্র লোকগান তিনি সৃষ্টি করেছেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটলেও গান তিনি ছাড়েননি। রাজমিস্ত্রিকে রূপক করে তিনি রচনা করেছেন অমর সংগীত-

আছে তামা পিতল লোহা সোনার ঘড়ি  
দুই হাতে শতেক ঘড়ি টাকায় বিক্রি হইয়াছে,  
আমার দেহঘড়ি সন্ধান করি  
কোন মিস্ত্রির বানাইয়াছে  
সেই ঘড়ির মূল্য যত  
আমি আর বলব কত  
বলতে মোর কি সাধ্য আছে।

...  
অধম কফিলদ্বি বলে সেই যে ঘড়ি  
বানাইয়াছে যেই মিস্ত্রি তালাশ করি তারে।

এই গানটি তাঁর শেষ জীবনের রচনা হলেও ১৯৪২ সালের আগেই হবে। এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় আবদুর রহমান বয়াতীর কষ্টে। গানটি কিছুটা বিক্রিত ও বিবর্তিত হলেও এর মূল রচয়িতা হিসেবে কফিলউদ্দিনের নামই উল্লেখ করতে হয়।<sup>৩৪</sup>

**অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪):** জন্ম ঢাকা শহর হলেও আদি নিবাস শরীয়তপুর জেলার মগর গ্রামে ১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর। কবি, গীতিকার ও গায়ক। ব্যারিস্টারি পাস করে কলকাতা ও রংপুরে কিছুদিন আইন-ব্যবসায় ও পরে লক্ষ্মী শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কিশোর বয়সে সংগীত-জীবনের শুরু। প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে গীত রচনা এবং বাংলা গানে সর্বপ্রথম ঝুমরি আমদানির পথিকৃৎ। গানের সুরে কীর্তন, বাউল তথা লোকসুরের প্রয়োগ এবং গ্রাম্য সুর সংগ্রহ ও প্রয়োগ, সুরের প্রচলিত ঢঙ, গজল, দাদরা, লোকসংগীত ইত্যাতি অবলম্বন করে সুর রচনা করে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন। ভৈরবী, খামজ, পিলু, বেহাগ, কাফী প্রভৃতি প্রচলিত রাগের উপর ভিত্তি করে সুর রচনা করেছেন। মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও স্বজাতির উদ্দেশে নিবেদিত গানগুলো জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের মনে প্রেরণা জোগায়। তাঁর ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!’- গানটি ষাটের দশকে পূর্বাংল্য বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের মনে উদ্বীপনার সংগ্রাম করেছিল। তাঁর গানের সংখ্যা দুশো। ‘কয়েকটি গান’ ও ‘গীতগুঞ্জ’ (১৯৩১) নামে তাঁর গানের বই রয়েছে। ২৬ আগস্ট ১৯৩৪ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।<sup>৩৫</sup>



আনন্দনাথ রায়



রামঠাকুর



হেমন্তকুমার দে



গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য



অতুলপ্রসাদ সেন



যোগেশচন্দ্র ঘোষ



গীতা দত্ত



সুমানলকুমার মুখোপাধ্যায়



আরু ইসহাক

**যোগেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭-১৯৭১):** জন্ম. গোসাইরহাট, ১৮৮৭। শিক্ষাবিদ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিশারদ। ঢাকা জুবিলী স্কুল থেকে ১৯০২-এ এন্ড্রোস, জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯০৪-এ এফ.এ., কৃতিবিহার কলেজ থেকে ১৯০৬-এ বি.এ. এবং কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৮-এ রসায়নশাস্ত্রে এম.এ. পাস। ১৯০৮-১৯১২ পর্যন্ত ভাগলপুর কলেজে ও ১৯১২-১৯৪৮ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে রসায়নের অধ্যাপনা। ১৯৪৭-১৯৪৮ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ, লন্ডন কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো ও যুক্তরাষ্ট্রের কেমিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯১৪-তে ঢাকায় আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ‘সাধনা ঔষধালয়’ স্থাপন করেন। তাঁর গবেষণা, সাধনা ও কর্মাদ্যমের ফলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক মানে উন্নীত। রোগ-ব্যাধির কারণ ও লক্ষণ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অন্তর্নির্হিত তত্ত্ব, আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যবহার পদ্ধতি ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থাবলি: অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবন্ধতা, আরোগ্যের পথ, গৃহ-চিকিৎসা, চর্ম ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও মুখরোগ চিকিৎসা, আমরা কোন পথে? আয়ুর্বেদ ইতিহাস প্রভৃতি। ১৯৭১-এর ৪ এপ্রিল সাধনা ঔষধালয়ের সদর দফতর (৭১, দীননাথ সেন রোড, গোপালগঞ্জ, ঢাকা)-এ নিজ অফিসকক্ষে পাকসেনাদের গুলিতে শহিদ হন।

**আবদুল মোতালেব সরদার (১৯০০-১৯৮০):** ভেদরগঞ্জ উপজেলার সাখিপুর গ্রামে জন্ম। পিতা গফুর আলী সরদার। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে সুনামের অধিকারী হলেও গান গেখা, সুর করা ও পরিবেশন করার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। মহাত্মা গান্ধী, পির বাদশা মিয়া, শেরে বাংলা প্রমুখ নেতাদের সামনে তিনি নিজের লেখা গান গেয়ে শনিয়েছেন। লোকসংগীতের চর্চা করেছেন। আঞ্চলিক ভাষায় গান রচনা করেছেন। তাঁর একটি গানে ছিল-

জনচোর তেতার বাতিটা ভিজ্যা গিয়াছে  
পি মোদের ভক্ত জগতের  
করণান্ধি ভারতযুগের  
সেদিনের গান কেন গাহি রে!<sup>৩৫</sup>

**আবদুল হক ফরিদী (১৯০৩-১৯৯৬):** নড়িয়া থানার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা আলফাজউদ্দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় ও লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শক, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্টিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। এসএম ইসলামের ‘কালচারাল হেরিটেজ অব ইসলাম’ গ্রন্থটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। সওগাতা, মোহাম্মদী, মাহেলও প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ ছাপা হয়। ১৯৯৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

**ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬):** জন্ম. গঙ্গানগর থাম, গয়ঘর, ১ ফেন্ডুয়ারি ১৯০৭। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ যাত্রা পালাকার। ময়মনসিংহ গীতিকা এবং লোকগাথা নিয়ে তিনি অজস্র পালা রচনা করেছেন। পিতা হরিকিশোর দে, মাতা ক্ষীরোদসন্দর্বী দেবী। বাল্যশিক্ষা শুরু গ্রামের পাঠশালায়। ১৯২৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ এবং ১৯৩৭-এ বি.টি. পাস করে শরীয়তপুরের কার্তিকপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৪৫-এ পশ্চিমবঙ্গে ইচ্ছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চবিদ্যালয়ের অতিরিক্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান, ১৯৫২-তে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত। ১৯১৯-তে বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চন্দশ্চেখের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রথম পালা ‘চন্দশ্চেখ’ রচনা। ১৯২৫-এ ‘স্বর্ণলংকা’ পালা রচিত এবং বাণী

নাট্যসমাজে অভিনীত। ১৯৩১-এ পেশাদার দলের জন্য ‘বজ্রনাভ’ পালা রচনা। ১৯৩৬-এ যয়মনসিংহ গীতিকার পালা অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত সংলাপে নারীমুক্তির বক্তব্য নিয়ে ‘চাঁদের মেয়ে’ রচনা। ১৯৪১-এ সাম্প্রদায়িক গোঁড়মির কুফল নিয়ে ‘রঞ্জতিলক’ পালা রচনা। ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাসায় ভগ্নিপতি কামিনীকুমার দে-র মৃত্যুর পরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক ‘শেষ নবাব’ পালা। বিখ্যাত পালা: দেবতার গ্রাস (১৯৪২, নট কোম্পানি), সমাজের বলি (১৯৪৪, নট কোম্পানি), মায়ের ডাক (১৯৪৫, প্রভাস অপেরা), শেষ নমাজ (১৯৪৬, আর্য অপেরা), ধরার দেবতা (১৯৪৮, নিউ গণেশ অপেরা), কোহিনূর (১৯৫০, নট কোম্পানি), ধর্মের বলি (১৯৫১, আর্য অপেরা), গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১, সত্যনারায়ণ অপেরা), ভাগ্যের বলি (১৯৫৯, নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা), সোহাব রুক্ষম (১৯৫৯, অমিকা নাট্য কোং), সোনাই দিঘি (১৯৫৯, সত্যম্বর অপেরা), বগী এলো দেশে (১৯৬০, নবরঞ্জন অপেরা), কবি চন্দ্রাবতী (১৯৫৯, বীণাপাণি অপেরা), সুলতানা রিজিয়া (১৯৬৭, নট কোম্পানি), করণাসিঙ্গু বিদ্যাসাগর (১৯৬৮, নট কোম্পানি), পতিঘাতিনী সতী (১৯৬৯, বৈকুণ্ঠ যাত্রাসমাজ), মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন (১৯৬৯, ভারতী অপেরা), মুজিবের ডাক (১৯৭২), আঁধারের মুসাফির (১৯৭২, নট কোম্পানি), নটী বিলোদিনী (১৯৭২, নট কোম্পানি), সতী করণাময়ী (১৯৭৫, নব অমিকা অপেরা), বিদ্রোহী নজরুল (১৯৭৪, নব অমিকা অপেরা), ভারতপথিক রামমোহন (১৯৭৪, নট কোম্পানি), সীতার বনবাস (১৯৭৫, মোহন অপেরা) প্রভৃতি। পুরুষার ও উপাধি: ‘পালাস্মাট’ উপাধি লাভ (১৯৬৭), ‘লোকনাট্যগুরু’ উপাধি লাভ (‘অভিনয়’ পত্রিকা, ১৯৭৬)। মৃত্যু: কলকাতা, ১২ মার্চ ১৯৭৬।<sup>৩৭</sup>

**সাকিম আলি বয়াতী (১৯১০-১৯৭০):** বাড়ি নড়িয়া উপজেলার ডিঙ্গামাণিক গ্রামে। পুঁথিগায়ক হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। পিতা আহমদ আলী তাঁতের কাজ করতে। সাকিম আলিও পিতার পেশায় আত্মানিয়োগ করেন। কাজের ফাঁকে গান গাইতেন। নিজের চেষ্টায় তিনি হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করেন। পুঁথিগায়ক ওছেদ আলীর গান শুনে তিনি পুঁথিগানে আগ্রহী হন এবং রামভদ্রপুরের পুঁথিগায়ক ইছাবালী শিকদারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তবে পুঁথি থেকে উপকরণ নিয়ে তিনি নতুন করে আসরে গান পরিবেশন করতে বলে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর একটি ছিল এমন—

ডিক্রি পাইয়া উড়তেছে পাখি  
পাখির বর্ণন করিতে শক্তি কি রাখি॥

গৃধিনী শকুন কবিরাজ  
চোর কাকের নাহি লাজ  
গাছকুড়াইল্যা ছিঁড়ে তাজ  
ঠোটের দ্বারায় ছিঁড়ে গাছ  
ডাউক ডক্কির তাজকোরা  
ঘূঘুশালিক গগণভোরা...।

এই গানে বিলুপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় পাখির নাম রয়েছে। এরকম অজস্র গান তিনি রচনা করেছেন ‘ছাবিশ সালের বাড়ের বর্ণনা’ নামের একটি গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।<sup>৩৮</sup>

তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতির বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি স্থানীয় পাখি ও বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন।

**রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী (১৯২১-১৯৮৮):** জন্ম দক্ষিণ বালুচর গ্রাম, পালং, ২৬ ডিসেম্বর ১৯২১। লোকসংস্কৃতির সংগ্রাহক, গবেষক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে তিনি পালং তুলাসার গুরুদাস স্কুলের মাঠে সঙ্গাহব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৬১ সালে ‘ঢাকা দক্ষিণ-পূর্ব রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পরিষদ’ গঠন করেন এবং ইস্টবেঙ্গল ইনসিটিউশনে (সদরঘাট, ঢাকা) অনুষ্ঠিত এ-উৎসবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বাঙালি সংস্কৃতির একজন নিষ্ঠাবান সেবক। সংক্ষারমুক্ত উদার মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় দক্ষতার পরিচয় প্রদান। কবিগান, জারিগান, মুশিদি, ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গান জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনন্বীক্ষ্য। কবিতাগ্রহ ‘পূর্বাপর’ (১৯৬৮), স্মৃতিকথা ‘রবীন্দ্র-তরুমূলে’ (১৯৮৮), গল্পগ্রন্থ ‘বারাপাতা’ (১৯৮৮) রথীন্দ্রকান্ত ঘটকের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘কয়েকজন লোককবি ও প্রসঙ্গত’ গ্রন্থটি লোকসংস্কৃতিচর্চার অনন্য নির্দশন। মৃত্যু সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল (ঢাকা), ১৫ জুন ১৯৮৮।<sup>৩৯</sup>

**মো. মেঘাই সরদার (১৯২১-১৯৭৫):** জন্ম বিনোদপুর সুবেদারকান্দি গ্রামে ২৫ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে। তিনি ছিলেন স্থানীয় নাট্যচর্চার ওস্তাদ-পরিচালক। বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ-লালন-পালনে এবং চাষাবাদ কাজে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ, স্বাস্থ্যরক্ষায় শাকসজি খাওয়া ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে সবাইকে উৎসাহিত করতেন। গ্রাম্য থিয়েটারে অভিনয় করে তিনি বিপুল সুনামে অর্জন এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। ভাষাসৈনিক ডা. গোলাম মাওলা ও কবি রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সখ্য ছিল। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে পালং তুলাসার গুরুদাস উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে সঙ্গাহ ব্যাপী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজনে তিনি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। লোকজ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে তাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে।<sup>৪০</sup>

**আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩):** জন্ম শিরসল, নড়িয়া, ১ নভেম্বর ১৯২৬। কথাসাহিত্যিক, অভিধানকার। উপন্যাসে লোকজীবনের ও লোকসংস্কৃতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। পিতা মোহাম্মদ ইবাদুল্লাহ। শরীয়তপুর উপসী তারাপ্রসন্ন হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক (১৯৪২), ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক (১৯৪৪), করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (১৯৬০)। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের নবগঠিত নিরাপত্তা বিভাগে যোগদান। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) উপপরিচালক নিযুক্ত। ১৯৭৪-এ মিয়ানমারের (বার্মা) আকিয়াব শহরে বাংলাদেশ কনসুলেটে ভাইস কনসাল হিসেবে নিযুক্ত লাভ। ১৯৭৬-এ কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে ফাস্ট সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান। ১৯৮৯-এ এনএসআই-র খুলনা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভ। ১৯৮৪-এর ১ নভেম্বর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। প্রথম গল্প ‘রসের জলসায়’ ১৯৪০-এ কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত

‘নবযুগ’ পত্রিকায় প্রকাশিত। সাড়া জাগানো উপন্যাস ‘সূর্য দীর্ঘল বাড়ি’ ১৯৫৫-এ প্রকাশিত। ১৯৮৯-এ এপ্রিলে এর কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত। ‘সূর্য দীর্ঘল বাড়ি’ বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনুদিত। এর চলচিত্রজনপ্র আন্তর্জাতিক নটি পুরস্কার লাভ করে। গল্পগুহ্য ‘মহাপতঙ্গ’-র ইংরেজি অনুবাদ ‘Dragon Fly’-এর নাট্যরূপের জন্য ‘সুইজারল্যান্ড আন্তর্জাতিক পুরস্কার’ লাভ। গল্পগুহ্য: ‘হারেম’ (১৯৬২), ‘মহাপতঙ্গ’ (১৯৬৩), ‘গল্পসংগ্রহ’ (২০০৫), অভিধান: বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (ক থেকে এও পর্যন্ত, ১৯৯৮), বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান-স্বরবর্ণ অংশ (১৯৯৩)। পুরস্কার: বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩), সুন্দরবন সাহিত্য পদক (১৯৮১), একুশে পদক (১৯৯৭), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার। মৃত্যু: ঢাকা, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।<sup>১১</sup> তাঁর ‘পদ্মার পলিদীপ’ উপন্যাসে শরীয়তপুর অঞ্চলের লোসংস্কৃতির ব্যাপক উপস্থাপনা রয়েছে।

**সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৮-১৯৮৪):** জন্ম গোসাইরহাট উপজেলার দুলখণ্ড গ্রামে, ১৭ মার্চ ১৯২৮। পৈতৃক নিবাস দাসের জঙ্গল গ্রামে। অনুবাদ, শিক্ষাবিদ, ফোকলোরব্রতী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-তে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. ১৯৮১-তে ‘কবি জসীমউদ্দীনের কবিমানস ও কাব্যসাধন’ বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি. উপাধি লাভ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থাবলি: জসীমউদ্দীন (১৯৬৭), আধুনিক রচনা (১৯৬৮), কবি ফররুর আহমদ (১৯৬৯), মোজাম্বিল হক (১৯৭০), মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৯৭০), সাহিত্যসমীক্ষা (১৯৭৬), জসীমউদ্দীন কবিমানস ও কাব্যসাধনা (১৯৮৩), কাব্যনির্মাণকলা: এরিস্টেল (১৯৭৬), হোরেসের কাব্যতত্ত্ব (১৯৭৯), লুঙিউনুসের কাব্যতত্ত্ব (১৯৮৩) প্রভৃতি। দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১) লাভ। মৃত্যু: ঢাকা, ২৭ মে ১৯৮৪।

**আব্দুল হাসিম বগাতী (১৯২৯-):** জাজিরা থানার নাওড়োবা গ্রামের বাসিন্দা। পিতার নাম আব্দুল জব্বার মোড়ুল। আলখেল্লা পরতেন। লোকে তাঁকে ফকির বলত। সাত বছর বয়সে পিতা তাঁকে একটি সারেঙ্গি উপহার দেন। সারেঙ্গি বাজিয়ে তিনি আপন মনে গান গাইতে শুরু করেন। পড়ার পাশাপাশি তিনি গান চালিয়ে যেতে থাকলেন। ‘সাত বছর গত হইল, গানের বাতাস গায় লাগিল/ সঙ্গে সঙ্গে পড়া ছাড়ি না’ গানে নিজের কথা প্রকাশ করেছেন। মায়ের মৃত্যুশোকে তিনি রচনা করেন ‘আমি তোমার অবোধ ছেলে/ ও মা অন্তরে করেছ আসন থেকে আমার হৃদকমলে’। দশ বছর বয়সেই তিনি রচনা করেন তত্ত্বমূলক গান-

আমি তোমার ভাঙ্গাতরী  
তুমি আমার কর্ণধার  
যে দিক ঘোরাও সেদিক ঘুরি  
মিছে কেন দোষ দেও আমার।’

তাঁর ৩০টি গান নিয়ে 'জ্ঞানদর্পণ' (১৯৫৭), ১০২টি গান নিয়ে 'হালিম সংগীত বা তর্ক্যুন্দ' (১৯৬৩), ২৬টি গান নিয়ে 'প্রেমসুধা', ১৮টি গান নিয়ে 'মুচ্ছল্লী' ও ফকিরের তর্ক্যুন্দ' (১৯৫৮), এবং ৬৮টি গান 'পারশ রতন' (১৯৭৬) নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।<sup>১২</sup>

**গীতা দস্ত** (১৯৩০-১৯৭২): জন্ম. গোসাইরহাটের ইদিলপুর গ্রামে। ২৩ নভেম্বর ১৯৩০। বাংলা ও হিন্দির সিনেমা এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী। প্রকৃত নাম গীতা রায়চৌধুরী। পিতা দেবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন জমিদার। মাতা অমিয়া দেবী। ১৯৪২-এ বারো বছর বয়সে পিতা-মাতার সঙ্গে বোম্বে চলে যান। ১৯৪৭-এ তিনি মেট্রিক পাস করেন। প্রে-ব্যাক গায়িকা হিসেবে সুনাম অর্জন। বোম্বের খ্যাতিমান সুরকার হন্মান প্রসাদ তাঁর গান শুনে ১৯৪৬-এ 'ভক্ত প্রহুদ' নামের চলচ্চিত্রে কোরাসে মাত্র দুই লাইন গান গাওয়ার সুযোগ দেন। এরপর 'দো ভাই' (১৯৪৭) ছবিতে কষ্ট দেন। এই ছবির সুরকার শচীনদেব বর্মণ শিল্পী গীতা দস্তের কষ্টের বাঙালি টানকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছিলেন 'দো ভাই' ছাড়াও 'দেবদাস' (১৯৫৫) এবং 'পেয়াসা' (১৯৫৭) ছবিতে। 'পেয়াসা' ছবিতে 'আজ সাজন মুখে অঙ্গ লাগা লে' বাঙালি কীর্তন গানকে গীতা সফলভাবে হিন্দিতে গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। বিশিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা গুরু দন্তকে বিয়ে করেন (১৯৫৩)। তাঁর গাওয়া কয়েকটি কালজয়ী গান হলো, তুমি যে আমার (হারানো সুর ১৯৫৮), এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায় (হসপিটাল ১৯৬০), নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে (পৃথিবী আমারে চায় ১৯৫৭), ওগো সুন্দর জানো নাকি (ইন্দ্ৰাণী ১৯৫৮), এই মায়াবী তিথি (সোনার হরিণ ১৯৫৯), আমি শুনেছি তোমার গান (স্বরলিপি ১৯৬১) প্রভৃতি। শচীনদেব বর্মণ ছাড়াও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ও পি নাইয়ার, সুবীন দাশগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনিল বাগচী প্রমুখের সুরে তিনি বাংলা ও হিন্দি গান গেয়ে তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসনে অবিস্তৃত হন। মৃত্যু হরকিষণদাস হাসপাতাল, বোম্বে, ২০ জুলাই ১৯৭২।<sup>১৩</sup>

**দলিলউদ্দিন বয়াতী** (১৯৩৩-২০০৪): জাজিরা উপজেলার কান্দি গ্রামে বাস করতেন। পিতা চফর আলী ফকির। পিতা আধ্যাত্মিক গান রচনা করতেন। পিতার কাছ থেকেই গানে হাতেখড়ি। গান শিখে তিনি ধলু বয়াতী নামে পরিচিত হন। আবদুল হালিম বয়াতীকে তিনি গুরু মান্য করতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান ছিল এমন-

তোমরা নাকি বলতে পার  
একটা পয়দা হইল কী?  
এইটা যখন পয়দা হইল  
টরটোরাইয়া কথা কইল  
মুখ ভরা তার দাঢ়ি ছিল  
কপালে তার লেখা কী?

**ধালেক শাহ বিনোদপুরী** (১৯৪০-২০১৩): জন্ম ৩ সেপ্টেম্বর পালং-এর চিতলিয়া ইউনিয়নের দড়িহাওলা গ্রামে। পিতা আবদুল গনি মাতবর, মাতা মাজু বিবি। বিনোদপুর সুবেদারকান্দি বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের পরে আর অহসর হননি। বড়বোন সখিনা বেগমের গান শুনে তিনি গানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। নিজের চেষ্টায় পলিগীতি ও ভাটিয়ালি গাইতে শুরু করেন। কিন্তু অভাবের সংসারে

পিতার কাজে সহযোগিতা করতে ঢাকায় আসেন। গেড়ারিয়ার ঢালকানগরের পিতার কাঁচামালের ব্যবসায় যোগ দেন। অবসরে তিনি লোহারপুলে রিকসার পেছন থেকে ঠেলে উপরের দিকে উঠিয়ে দিতেন। এতে খুশি হয়ে কিছু পয়সা দিতেন যাত্রীরা। এই পয়সা জমিয়ে তিনি হারমোনিয়াম কেনেন। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত গানের চর্চা করেন। একসময় তিনি গান লেখা শুরু করেন এবং সুর দিয়ে নিজেই পরিবেশন করেন। এখন তিনি জারিগান, মুশিদি, মারফতি, বাউলগান, মাইজভাওরি গান ও সুরেশ্বরী গানের শিল্পী হিসেবে নদিত। সুরেশ্বরী দরবার শরফিফের খলিফা হিসেবে তিনি পির হ্যরত চুন্নি মিয়ার আদেশে আঠারো বছর ধরে পাটের ছালার তৈরি পোষাক পরেন। লোকশিল্পী হিসেবে তিনি পাগলা খালেক শাহ বিনোদপুরী হিসেবে পরিচিত। ‘তামা কাসা লোহা পিতল- চাইর চিজের এক নমুনা/ দয়াল আমার বিনোদপুরী সুফি মাওলানা’, ‘কুঞ্জবনে বাজায়ে বাঁশি- বিরহিণী রাই গো/ কে আর বাজাবে বাঁশি শ্যাম ব্রজে নাই গো!/ বাজায় বাঁশি কুঞ্জবনে/ আগুন লাগে রাধার মনে/ বিরহিণীর কথা মনে নাই গো..’ প্রভৃতি অজস্র গান তিনি রচনা, সুরযোজনা ও পরিবেশন করেছেন।

**মফিজুল ইসলাম (১৯৫৩):** জারিগানের রচয়িতা। জন্ম পালং-এর বিনোদপুর সুবেদারকান্দি গ্রামে ১৯৫৩ সালের ১৫ জানুয়ারি। বর্তমান আবাস কবিকুঞ্জ, স্বর্ণঘোষ। পিতা মেঘাই সরদার, মা হাফিজা খাতুন ছুটি বিবি। পালং তুলাসার গুরুদাস হাই স্কুল, মাদারীপুর নাজিম উদ্দিন কলেজ, নাটোর কৃষি প্রশিক্ষায়তনে অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ। কারিগরি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে কৃষি ডিপ্লোমা পাস করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বিনোদপুর ইউনিয়ন হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিশোর বয়সে বিশাদসিদ্ধি, শাহজাহান, গরিবের মেয়ে, দায়ী কে, আনারকলি প্রভৃতি লোকনাট্য ও যাত্রাপালায় অভিনয় করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এলাকায় কবিভাই হিসেবে পরিচিত। কলকাতার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ এবং দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। প্রকাশিত বই: ‘ছবি’, ‘হন্দয় অতল তলে’, ‘বিক্ষুল সংলাপ’, ‘এই এখানেই’, ‘অঙ্ককারে হাজার তারা’, ‘বেদনার নীল চিঠি’, ‘আজকের অঙ্গীকার’, ‘প্রতীক’ প্রভৃতি। ‘পরিবেশ ও জীবন’ নামে প্রবন্ধগ্রন্থের জন্য পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ২০১১) এবং কবিতার জন্য পেয়েছেন কবি শামসুর রাহমান সাহিত্য পুরস্কার ২০১২। লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তিনি বিনামূল্যে ভেজ ও ফলজ গাছের চারা প্রদান করেন এবং একক আবৃত্তি করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। তিনি শরীয়তপুর সাহিত্য একাডেমি ও প্রতিভাস আবৃত্তি সংসদের প্রতিষ্ঠাতা। ‘কৃষিবিপুব’ পত্রিকার সাম্মানিক সাংবাদিক। শরীয়তপুরে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কবিকুঞ্জে প্রতি বছর বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর জারিগান এলাকার আদুল আজিজ দেওয়ান, মিজানুর রহমান, সামিনা ইয়াসমিন সেতু প্রমুখ শিল্পী পরিবেশন করেন। ‘পাটের আবাদ’ নিয়ে তিনি জারিগান লিখেছেন। তা এমন-দ্রুত বর্দনশীল আঁশ ফসল পাট, তার অনেক গুণ আমরা পাই/ আমরা চাষী গ্রামবাসী পাটের আবাদ করি তাই।’ কৃষির গুণগান করে তিনি অনেক জারিগান লিখেছেন। তার একটি উল্লেখ করা হলো-‘শোনেন দেশবাসী

ভাই আমরা কৃষির গান গাই, / কৃষি ছাড়া এই দেশেতে বাঁচার উপায় নাই।' তাঁর স্মৃতি ও প্রত্যাশার একটি জারিগান (অংশ বিশেষ) এমন- 'সিনেমা, সার্কাস, থিয়েটার, গাড়ু, গান ও পুতুল নাচ/ প্রণয়ের ভোরে বেঁধেছে আমাদের আর নৌকা বাচ, / ওরে আনন্দ করে বাজিয়েছি আহা বাটি টিনের খালও / শিশুকিশোর কালই আহা ছিলো তো বেশ ভালো।'

**শ্যামসুন্দর দেবনাথ (১৯৫৫):** জন্ম পালং ১০ ফেব্রুয়ারি। পিতা, সন্তোষচন্দ্র দেবনাথ, মাতা, চারঞ্চিলা দেবনাথ। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। পাশাপাশি পুরাতন বইবাঁধাই, দর্জি কাজ এমনকি সাংবাদিকতাও করেছেন। স্থানীয় বহু সংকলন ও সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বর্তমানে লোকসংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ করেন, আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা ও গান রচনা করেন। এলাকার সকল সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। রথীন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, নজরুল একাডেমি, শরীয়তপুর সাহিত্য একাডেমি, জাতীয় কবিতা পরিষদ, প্রতিভাস আবৃত্তি সংসদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রভৃতি সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। জাতীয় ও স্থানীয় পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্প, কবিতা, ছড়া ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শরীয়তপুর জেলায় লোকসংস্কৃতির তথ্যভাগার হিসেবে তিনি পরিচিত। এ জেলার বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও অনন্য সন্মান ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

শরীয়তপুরে আরো যাঁরা লোককবি ও লোকশিল্পী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ওছেন আলী বয়াতী, ইছাবালী শিকদার, তাহের বয়াতী, মোচন ঝী, আবদুল আজিজ দেওয়ান, আবদুল মাল্লান বয়াতী প্রমুখ রয়েছেন।

### তথ্যনির্দেশ

- ১ 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার ফরিদপুর' (নূরুল ইসলাম খান সম্পা.), সংস্থাপন বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ০১
- ২ 'বাংলা বিশ্বকোষ ঢয় খণ্ড' (খানবাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পা.), নওরোজ কিতাবিস্তান ও ত্রিন বুক হাউস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৭৯
- ৩ 'আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস' (তপন বাগচী সম্পা.), বইপত্র প্রকাশ, ২০০৮, ঢাকা, পৃ. ১১৮
- ৪ তপন বাগচী (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
- ৫ খানবাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পা.), 'বাংলা বিশ্বকোষ' ঢয় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান ও ত্রিন বুক হাউস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৭৯
- ৬ 'আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
- ৭ আবদুর রব শিকদার, 'শরীয়তপুর অতীত ও বর্তমান', প্রকাশক লীনা শিকদার, ঢাকা, ২য় সং, ২০০৭, পৃ. ২০৬
- ৮ 'আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
- ৯ 'আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
- ১০ সাক্ষাৎকার: পলাশ রাউত, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শহীদ সিরাজ শিকদার মহাবিদ্যালয়, মহিষবালী, শরীয়তপুর, ১০ জুলাই ২০১১
- ১১ 'বাংলা বিশ্বকোষ' ঢয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৯
- ১২ 'বাংলাদেশ জনগণনা প্রতিবেদন', বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো, ঢাকা, ২০০১

- ১৩ 'আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস', প্রাণকু পৃ. ২৪
- ১৪ 'বাংলাদেশ জনগণনা প্রতিবেদন', প্রাণকু
- ১৫ 'আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাস', প্রাণকু, পৃ. ৪২জা
- ১৬ ড. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ, শরীয়তপুরের মনসাৰাতি : সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নতুন সংযোজন, 'প্রত্নতত্ত্ব', জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৯
- ১৭ কাজী নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক, শরীয়তপুর, সাক্ষাৎকার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২
- ১৮ কাজী নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক, শরীয়তপুর, সাক্ষাৎকার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২
- ১৯ কাজী নজরুল ইসলাম, সাংবাদিক, শরীয়তপুর, সাক্ষাৎকার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১২
- ২০ নজরুল ইসলাম, উপস্থিতকারী কৃষি কর্মকর্তা, জাজিরা, শরীয়তপুর এবং মাকসুদা খাতুন, অধ্যাপক, রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভাগ, শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২
- ২১ ডা. আবদুল মল্লান রচিত গানটি কবি মফিজুল ইসলামের সৌজন্যে প্রাণ, পচিমপাড়া, শরীয়তপুর, ১২ মার্চ ২০১২
- ২২ আবদুর রব শিকদার, প্রাণকু, পৃ. ১০০
- ২৩ আবদুর রব শিকদার, প্রাণকু, পৃ. ১০১
- ২৪ যোগেন্দ্রনাথ গুণ, 'কেদার রায়', নবাবপুর আলবার্ট লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৩২১ (১৯১৪), পৃ. ৩৭
- ২৫ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', শামসুজ্জামান খান প্রযুক্ত (সম্পা.), ওয় সং, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৫০৫
- ২৬ Comrade Aruna Sen Passes Away, দ্য ডেইলি স্টোর, ঢাকা, ৬ জানুয়ারি, ২০০৭
- ২৭ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, ২০১১, পৃ. ৪৬৮
- ২৮ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, পৃ. ৫৮৫
- ২৯ মো. দিদুরুল ইসলাম, 'স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে শরীয়তপুর', মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৩
- ৩০ রথীস্মৃকান্ত ঘটকচৌধুরী, 'কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গ', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৩-৪৪
- ৩১ www.sureshwardargah.org/
- ৩২ এম এ আজিজ মিয়া, 'গোপালচন্দ্র ড্রাচার্য' (জীবনী), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২২
- ৩৩ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, পৃ. ২০৮
- ৩৪ রথীস্মৃকান্ত ঘটকচৌধুরী, প্রাণকু, পৃ. ৪৬-৪৭
- ৩৫ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, পৃ. ০৭
- ৩৬ আবদুর রব শিকদার, প্রাণকু, পৃ. ২৯৯
- ৩৭ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, পৃ. ৩০৫
- ৩৮ রথীস্মৃকান্ত ঘটকচৌধুরী, প্রাণকু, পৃ. ৫০-৫২
- ৩৯ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, পৃ. ০৭
- ৪০ সাক্ষাৎকার, আবুল কাশেম খান, নাট্যকারী ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, ডোমসার ইউনিয়ন, শরীয়তপুর, ০৫ জুন ২০১১
- ৪১ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, পৃ. ৬৭
- ৪২ রথীস্মৃকান্ত ঘটকচৌধুরী, প্রাণকু, পৃ. ৩৫-৪২
- ৪৩ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রাণকু, পৃ. ২০৪

## লোকসাহিত্য

লোকমুখে যে কিসসা, কাহিনি, ছড়া, প্রবাদ রচিত হয়, তাই লোকসাহিত্য হিসেবে বিবেচিত। এখন বিভিন্ন এলাকার লোকসাহিত্যের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। তবে এর লিখিত রূপেরও বিবরণ ঘটে। মানুষের মুখেমুখেই এর নতুন রূপ পায়। লোকমুখে রচিত হয়ে লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে লোকসাহিত্য একটি এলাকার বিশাল শিল্পভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত। শরীয়তপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা লোকসাহিত্যের কয়েকটি উপকরণের বেশ কিছু নমুনা উক্তাব করা হলো।

### ক. লোকগান্ড/কাহিনি/রূপকথা/উপকথা

শরীয়তপুর জেলায় জলাভূমি প্রচুর। একসময় মানুষের প্রচুর অবসর ছিল। তাই সারাদিন ধরে গল্প বলার আসর বসত। বয়স্ক দাদা-দাদি কিংবা নানা-নানিই কেবল নয়, সাধারণ নারী-পুরুষও গল্প বলত। লোকমুখে প্রচলিত এসব গল্পের আকার সময়ভেদে ছোট-বড় করা যেত। শরীয়তপুর সদরের স্বর্ণঘোষ গ্রাম থেকে গল্পটি সংগ্রহ করা হয়েছে। এর লিখিতরূপ দিয়েছেন কবি মফিজুল ইসলাম।<sup>১</sup>

### গরিব ধোপার গল্প

এক গ্রামে এক ধোপা বাস করত। সে খুব গরিব। তার আছে এক বউ। তাদের আছে এক ছেলে আর এক মেয়ে। একসময় তাঁদের অবস্থা এমন খারাপ হয়ে উঠল যে, কাজকর্ম তেমন জোটে না, মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করা ছাড়া আর উপায় রইল না। প্রতিদিন ধোপা ঘর থেকে বাইরে গিয়ে এপাড়া-ওপাড়া ভিক্ষে করে যা পায়, তাই দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে।

একদিন এক প্রতিবেশী তাকে বলে, তুমি ভিক্ষে করছ দেখে আমাদের খুব খারাপ লাগছে। তোমার বউকে বল, ‘সে যেন সঙ্গাহের ষষ্ঠি দিনে উপোস থাকে এবং শুক্রদেবের ব্রত পালন করে। দেখবে তোমার অভাব থাকবে না। সঙ্গাহের ষষ্ঠি দিনে একজন বৃন্দাকে বাড়িতে নিমস্ত্রণ করতে হবে। তাকে যত্নান্তি করতে হবে। আর ব্রত পালন করতে হবে শুক্র দেবতার। এভাবে এক বছর ব্রত পালন করলে শুক্রদেব তোমার মঙ্গল করবেন।’

ধোপা গিয়ে তার বউকে একথা জানায়। বউ এই উপদেশ পালন করে।

ধোপার বউয়ের আছে এক ভাই। সে জাতব্যবসা কাপড় কাচা ছেড়ে দিয়ে শহরে কাপড়ের বড় ব্যবসা করে। তার অনেক সম্পদ। একদিন এক হাজার ধনী লোককে

খাওয়ার নিম্নলিখিত করে তার বাড়িতে। তিনদিন ধরে উৎসব হয়। তিনদিনই খাওয়া-দাওয়া। সেই সঙ্গে থামের সকল লোককে সে আমন্ত্রণ করে।

ধোপার বউ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে থেতে যায়। ভাবে, এত লোক যাবে, কেউ তো আর তাকে চিনতে পারবে না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে একদিন ভালো-মন্দ খেয়ে আসবে। এতে তার ভাইয়েরও কোনো সমস্যা হবে না। কারণ সে তো অনেককেই নিম্নলিখিত করেছে। তার একটাই দুঃখ, সবাই সেজেগুজে যাচ্ছে। কিন্তু



কথক মহিজুল ইসলামের কাছ থেকে কিসসা সংগ্রহ করছেন প্রধান সমৰকারী

তার ভাল শাড়ি নেই, কোনো অলঙ্কার নেই। সাদামাটা একটা শাড়ি পরেই সে যায়। ছেলেমেয়েদেরও ভালো পোশাক নেই। পেট ভরে খাবার দিতে পারে না, জামা-কাপড় দেবে কীভাবে?

সকল মানুষের সঙ্গে ধোপার বউ তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে থেতে বসে। বাড়িভর্তি এত লোক-কে কার হৌজে রাখে!

খাওয়া শুরু হয়েছে। লোকজন খাবার বিতরণ করছে। তার ভাই সকলের পাতে ঘি দিচ্ছে। ঘি দিতে গিয়ে ভাই তার বোনকে চিনে ফেলে। ভাই তখন ধর্মক দিয়ে বলে, ‘একটা ভাল শাড়ি পরে আসতে পারলে না? তোমার কি ভাল গয়নাও নেই। ছেলেমেয়েদের পোষাকের যা শ্রী! তোমার ভাই আমি, একথা জানলে আমার মানসম্মান থাকবে? তোমার জন্য আমি লজ্জায় মুখ দেখাব কী করে?’

বোন কোনও কথা বলে না। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। ভাই আবার বলে, ‘আজ তোমাকে তাড়িয়ে দিছি না। তবে কালকে তুমি না এলেই আমি খুশি হব। আশা করি আমার সম্মান তুমি নষ্ট করবে না।’

পরের দিনও খাওয়ার আয়োজন। ধোপার বউয়ের আর যেতে ইচ্ছে করছে না। আগের দিন ভাই তাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে না দিলেও, আজ যদি তাড়িয়ে দেয়, এই ভয়ে সে ঘরে থাকবে বলেই ভোবে নিল।

কিন্তু গোল বাধায় ছেলেমেয়েরা। আগের দিন তারা মামাৰাড়ি খেয়ে খুব মজা পেয়েছে। তাই আজকেও তারা খেতে যাওয়ার জন্য বায়না ধরে। তাই মাকে তারা অনুরোধ করে তাদের নিয়ে যেতে।

মা তার সন্তানদের কাছে অপমানের কথা বুঝিয়ে বলতে পারে না। তাদের পেট পূরে খেতে দিতে না পারার লজ্জাও আছে। ছেলেমেয়েদের পীড়াপীড়িতে ধোপার বউ শেষ পর্যন্ত খেতে যেতে রাজি হয়। ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে এক কোণে চুপচুপি খাওয়ার সারিতে গিয়ে বসে পড়ে।

বিশাল আয়োজন! কত লোক খাচ্ছে! কত লোক খাবার বিতরণ করছে? ধোপার বউয়ের ভাই সকলের পাতে নিজ হাতে ধি দিচ্ছে। ধি দিতে গিয়ে তার ভাই তাকে দেখে ফেলে। এবার ভাই একেবারে রেগে যায়। অগ্নিশৰ্মা যাকে বলে! সে চিৎকার করে বলে, ভিক্ষুক কোথাকার! গেঁয়ো ভূত! আমি নিষেধ করার পরেও আসতে তোমার লজ্জা করল না?

ভাইয়ের ধর্মক ও শাসানির পরেও বোন চুপ করে থাকল।

ভাই তখন কিছুটা শাস্ত হয়ে বলে, ‘আজকেও তোকে ছেড়ে দিলাম। কালকে আর আসবি না। এই তোকে আবার নিষেধ করলাম। আর কালকেও যদি আসিস, তবে তোকে ঘাড় ধরে বের করে দেব।’

পরের দিন বোন আর ভাইয়ের বাড়িতে যেতে চায় না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের পীড়াপীড়িতে এবারেও যেতে বাধ্য হয়। মনে-মনে ভাবে, এত ধর্মকের পরে বোন যে আসতে পারে, ভাই তা কঞ্জনাও করতে পারবে না।

এইবার দারোয়ান তাকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয় না। গেটেই তাকে আটকে দেয়া হয়। কেবল আটকে দেয়া নয়, ছেলেমেয়েসহ তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তাদের কারো খাওয়া হয় না। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তারা বাড়ি ফেরে।

বাড়ি ফিরে এসে ধোপার বউ শুক্রদেবের কাছে প্রার্থনা জানায়, যাতে সে এই গরিব হওয়ার যাতনা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তার কান্নাভরা আকুতিতে শুক্রদেবের মন গলে। শুক্রদেব সদয় হন। তিনি এমন বর দিলেন যাতে সে তাড়াতাড়ি গরিব থেকে ধনী হয়ে ওঠে।

কিছুদিনের মধ্যেই ধোপার অভাব ঘুচে যায়। তারা খুব ধনী হয়ে ওঠে। এইবার ধোপার বউ তার ভাইকে বাড়িতে নিয়ন্ত্রণ করে। ভাইয়ের মনে পড়ে যায়, বোনকে

অপমানের কথা। সে এই নিম্নণ রাখতে খুব লজ্জা পায়। কিন্তু নিম্নণ না রাখলে তো আরও লজ্জা। তাই সে নিম্নণ রাখে। কিন্তু বোনকে বলে, ‘আমি তোমার বাড়ি থেতে যাব, তবে তার আগে আমার বাড়িতে তোমাকে আসতে হবে।’

এমনভাবে ভাই অনুরোধ জানায় যেন বোন তাতে রাজি হয়। ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে বোন রাজি হয়।

পরের দিন বোন যায় ভাইয়ের বাড়িতে নিম্নণ থেতে। বোন এবার সুন্দর শাড়ি পরে, নতুন ডিজাইনের দামি গয়না পরে ভাইয়ের বাড়িতে আসে।

বোনকে দেখে ভাই খুশি হয়। তাকে সমাদর করার জন্য ভাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাই তাকে বসার জন্য দেয় কাঠের পিংড়ি আর খাওয়ার জন্য দেয় পাথরের থালা। বোন খুব শাস্তভাবে থেতে বসে। ভাতের থালার কাছে গা থেকে খুলে রাখে সোনার জরি লাগানো শাল। ভাই তার বোনকে দেখে আর ভাবে ঘরে খুব গরম লাগছে বলে গায়ের শাল হয়তো খুলে রাখছে। এবার বোন কাঠের পিংড়ির ওপর খুলে রাখে গায়ের সোনার গয়না। ভাই ভাবে, ওজন লাগছে বলে হয়তো খুলে রাখছে। এইবার বোন কিছু ভাত রাখে সোনার জরিওয়ালা শালের ওপর। তরকারি রাখে গলায় পরা সোনার নেকলেসের ওপর। আর কপালে পরা সোনার টিপ খুলে, তার ওপর রাখে বড়বড় মিষ্টি।

ভাই বিস্মিত হয়ে বলে, ‘তুমি এসব কী করছ?’

বোন বলে, ‘ঠিকই করছি ভাই, তুমি আসলে যে অতিথিকে নিম্নণ করেছে আমি তাদেরই খাওয়াচ্ছি।’

ভাই বুঝতে না পেরে আবার বলে, ‘কিন্তু তুমি খাচ্ছ না কেন?’

বোন বলে, ‘আমি তো নিম্নণ পাইনি। নিম্নণ পেয়েছে আমার সম্পদ। তাই ওদেরকে খাওয়াচ্ছি। আমি সেই দিনই তোমার বাড়িতে থেয়ে নিয়েছি, যেদিন তুমি উৎসব করে ধোপা খাওয়াচ্ছিলে। সেদিনের স্বাদ আমি চিরদিন মনে রাখব।’

ভাই এবার আরো লজ্জা পায়। আর ভুলটা বুঝতে পারে। সে তখন তার বোনের পা জড়িয়ে ধরে। বড় বোন আর কী করবে? ছোটোভাইয়ের ওপর কতক্ষণ রাগ রাখতে পারে। ভাই তখন বোনের সঙ্গে বোনের বাড়িতে যায়। দুই ভাই-বোন মিলে শুকনদেবের কাছে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে। সেই দিনটি ছিল সংগৃহের ষষ্ঠিদিন। তাই সংগৃহের ষষ্ঠিদিনের নাম রাখা হয় শুকনবার।

## ৪. কিংবদন্তি

মুখে-মুখে যে সকল লোককথা প্রচারিত হয় এবং একসময় মানুষ তা বিশ্বাস করে, এমন বিষয়গুলোই কিংবদন্তির রূপ পায়। সাধারণত কোনো পুরোনো দিঘি, বাড়ি, মন্দির, মঠ, মাঠ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এসব কিংবদন্তি তৈরি হয়। শরীয়তপুর জেলার বেশ কিছু কিংবদন্তি তুলে ধরা হলো:

## কোয়রপুরের ভূত

আনন্দনাথ রায় তাঁর 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে কোয়রপুরের ভূতের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এই প্রসিদ্ধ গ্রামটিতে বিশ্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ও অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় বাস করিতেছেন। মোসলমানের সংখ্যাও অল্প নয়। সাধারণত বৈদ্য সম্প্রদায়ের জন্য স্থানটী প্রসিদ্ধ। বৈদ্যবংশীয় মাধব সেনের বংশধরগণ গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। ইহাদের পূর্বপুরুষ গোয়ালদের অঙ্গর্গত পৌঁচাথুপী পঞ্চস্তুপ হইতে এই স্থানে আগমন করেন। ইহাদের মধ্যে মাধবতৃপ রায় একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন; প্রবাদ, তাঁহার মন্ত্রবলে কতিপয় ভূত তাঁহার ভূত্যত্ত্ব স্থীকার করিতে বাধ্য হয়। দুর্কর কার্যসমূহও তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদন করিয়া লওয়া হইত। বিশেষতঃ স্থানস্তরে গমনাগমন সময়ে তাঁহারাই তাঁহার পালকী বহন করিয়া লইয়া যাইত। একবার আহারাস্তে তাঁহার পরিবারস্থ কোন একটি বালকের শরীর উচ্ছিষ্টযুক্ত হয়; তখন একজন ভূত ভূত্যকে তাঁহাকে উচ্ছিষ্টযুক্ত করিয়া আনিবার জন্য অনুমতি করা হয়। ভূতের সহিত কথা ছিল যখন যাহা বলা হইবে তখনই তাঁহার সম্পাদন করিতে হইবে। ভূত প্রভূর অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র বালককে পুকুরে লইয়া গিয়ে তাঁহার শরীরে ও উদর মধ্যে যতটা দ্ব্রু পাইল তাঁহা সমুদয় অপহৃত করিয়া লইয়া আসিল। বলা বাহুল্য যে বালকের উদর বিদীর্ণ করিয়া পাকস্তুলী পরিস্কার করার, বালকের পঞ্চতৃ পাইতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না। এইরপ অবস্থায় শিশুটাকে ঘরের চালের উপর রোদ্রে রাখিয়া দেয়। কিছুকাল পরে বালকের অনুসন্ধান হইতেই সেই ভূত ভূত্যকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বালক কোথায়?' ভূত ঘরের চাল দেখাইয়া দিল। এই দৃশ্যে বাড়িতে শোকের প্রবাহ প্রবাহিত হইল। মাধব রায় ভূতকে তর্জন গর্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন এ-দুর্ক্ষর্ম করিল। ভূত বলিল হৃকুম মান্য করিবার জন্যই আমি উহার ভিতরের বাহিরের সমুদয় উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া দিয়া শুক্ষ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। তখন তিনি আর কি করিবেন, বুঝিলেন বাহিরের অন্নের কথা বিশেষ করিয়া না বলায় তাঁহারাই মূর্খতার কার্য হইয়াছে। ভূত আর ও তাঁহার বেতনভোগী চাকর নয়, ছুতোয় নাতায় যতটা অনিষ্ট করিয়া বাহির হইতে পারে, তাঁহারাই চেষ্ট করিবে। আরও প্রবাদ এক দিবস নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ভূত ভূত্যগণকে আদেশ করা হয়, কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইস। ইহারা কোন মোসলমান বাড়ির পাক করা কৈ মৎস্য উপস্থিত করিল। তখন আবার তাঁহাদিগকে বলা হয় কেন রাধা মৎস্য আনিলে? উত্তর হইল, 'আমরা যাহা সম্মুখে পাইয়াছি তাঁহাই লইয়া আসিয়াছি, জীবন্ত মাছ আনিতে হইবে এরপ ত আমাদিগকে বলা হয় নাই।' এই সকল ব্যাপার অবলোকনে, সর্বসাধারণে রায় মহাশয়কে ভূত বিদায়ের জন্য ধরিয়া বসিল। রায় মহাশয় বাধ্য হইয়া তাঁহাই করিলেন। কিন্তু যাইবার কালে তাঁহাদিগকে কিছু পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন কি না তাঁহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই।



## ইদিলপুরের ইন্দিলঝা

আনন্দনাথ রায় তাঁর 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, অতি পূর্বে ইদিলপুর একটী সামান্য চরকর্পে পরিগণিত ছিল, পরে ইদিল খাঁ নামে কোন ব্যক্তি উহা আবাদ করিয়া

বাসোপযোগী করেন। বর্তমান সময়ে বিক্রমপুর ও ইদিলপুর পরগণার মধ্যে যে ধনুর বিল বিদ্যমান রহিয়াছে আমাদের অনুমান অতি পূর্বকালে উহা এক প্রবল স্রোতস্বতীরপে উভয় পরগণার মধ্যে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে সেই নদী মজিয়া বিলে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান সময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর ও উত্তর ইদিলপুর একই ভূভাগে পরিণত দৃষ্ট হয়, অথচ প্রবল কীর্তিনাশ নদী উভুর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুরকে বহু ব্যবধান করিয়া ফেলিয়াছে। ইদিলপুর পরগণাও আবার নয়াভাসনী নদীকর্তৃক উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তরাংশ ফরিদপুর জেলার ও দক্ষিণাংশ বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ইদিলপুর বিক্রমপুরের এক অংশ। ইদিলপুরের অস্তর্গত যে সকল গ্রাম এখন বর্তমান, ১৯৪৮ শকাব্দে (১০৭২) রাজা শ্যামলবর্মার তাত্ত্বিকাসনে ঐ স্থানগুলির “বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভূজান্তে” এই ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। নাগরকুণ্ঠী, ধীপুর, লক্ষ্মুয়া, কুলকুণ্ঠি প্রভৃতি স্থানগুলিও ঐ পাঠের অস্তর্গত, অথচ ঐ স্থানসমূহ অধুনা ইদিলপুরের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে ইদিলপুর নামের পতন হয় নাই এইটি নিশ্চিত কথা। মুসলমান শাসনকালেই উহা ভিন্ন পরগনা বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। ইদিলখাঁর নামের সহিত উহার যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য কারিলেও ইহা যথার্থ বলিয়া অবধারিত হয়। বাস্তবিক তাত্ত্বিকাসন সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক, যখন শ্বেতগুলি রচিত হইয়াছিল তখন পর্যন্ত ইদিলপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল না, ইহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

### মনসাবাড়ির নামের কিংবদন্তি

মনসাবাড়ির স্থাপত্যিক নির্দশন প্রাথমিকভাবে গবেষককে কৌতুহলী করে তুলবে। এই কৌতুহল আরও বৃদ্ধি পাবে বাড়িটিকে ঘিরে গড়ে ওঠা দুটো কিংবদন্তি শুনে। ময়ূরভট্টের কিংবদন্তি সময়ের বিচারে বেশি প্রাচীন। মনসাবাড়ি প্রথম দিকে ময়ূরভট্টের বাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। আমাদের ধারণা বর্তমান বাড়িটির দ্বিতীয় অঞ্চল অর্থাৎ টোল বা শিক্ষায়তন ছিল প্রথম পর্যায়ের স্থাপনা। মন্দিরসমূহ গড়ার আগে এ-অঞ্চলটি হয়তো ময়ূরভট্টের বাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। কিংবদন্তিটি বোধকরি সে ভাবেই গড়ে উঠেছে। কিংবদন্তি অনুযায়ী ভারতের কনৌজ থেকে একসময় ভট্টাচার্য পরিবার শরিয়তপুরের ধানুকা অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। এদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন ময়ূরভট্ট। ময়ূরভট্ট যখন মাট্টগভো তখন একবার তাঁর মা-বাবা তীর্থ করার জন্য কাশিধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক বনের ভেতর ভট্টাচার্যের স্ত্রী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তীর্থের উদ্দেশ্যে পথে বেড়িয়েছেন ভট্টাচার্য পরিবার। ধর্মের চেয়ে সত্ত্বানের মায়াকে বড় করে দেখলেন না তারা। নবজাতককে একটি শালপাতায় ঢেকে রেখে তীর্থের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। তীর্থ শেষ হলে ভট্টাচার্য পরিবারকে স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবতা। জানালেন তাঁদের পূজা গ্রহণ করেননি তিনি। সদ্যজ্ঞাত পুত্রকে বনে অরক্ষিত রেখে আসা তাঁদের অন্যায় হয়েছে। নিজেদের ভূল বুঝতে পারলেন ভট্টাচার্য দম্পত্তি। ফিরে এলেন সেই বনে। নিদিষ্ট জায়গায় এসে দেখতে পান একটি ময়ূর পাখা দিয়ে ঢেকে রেখেছে তাঁদের পুত্রকে। মায়ের কোলে ফিরে আসে

পুত্র। ময়ূরের আশ্রয়ে বেঁচেছিল বলে ছেলের নাম রাখা হয় ময়ূরভট্ট। আর এই ময়ূরভট্টের উত্তরসূরীরা ভট্টাচার্য বাড়ির নাম দিয়েছেন ময়ূরভট্টের বাড়ি। ভট্টাচার্যের আগমনের সূত্র অনুসন্ধানে এই কিংবদন্তি ভূমিকা রাখতে পারে। একই সঙ্গে মনসাবাড়ির বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে গড়ে-ওঠা শিক্ষায়তনের স্থাপত্য একটি ঐতিহাসিক পটভূমি গড়ে তোলার পথ সৃষ্টি করেছে। মন্দিরবাড়ির স্থাপত্যসমূহ সেদিক থেকে কিছুটা নবীন। এই স্থাপনাসমূহের প্রাচীন সূত্র ধারণ করে দ্বিতীয় কিংবদন্তিটি গড়ে উঠেছে। ময়ূরভট্ট বাড়ির এক কিশোরের অভ্যাস ছিল প্রত্যুষে বাগানে ফুল কুড়ানো। এক প্রত্যুষে ফুল কুড়াতে গিয়ে দেখতে পায় বাগানে মন্তব্দ এক সাপ। তায় পেয়ে কিশোর ছুটে আসে বাড়িতে। পরদিন ফুল কুড়াতে গিয়ে আবার সাপের মুখোযুবি হয়। সাপ ভয়াত কিশোরের পিছু বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করে ও কিশোরকে ঘিরে নৃত্য করতে থাকে। বাড়ির লোকজন ভয়ে-বিশ্বায়ে প্রত্যক্ষ করতে থাকে এই দৃশ্য। রাতে স্বপ্নে তাদের কাছে আবির্ভূত হন দেবী মনসা। তিনি মনসা পূজা করার নির্দেশ দেন। এর পরেই আচার্য বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় মনসামন্দির। সেই থেকে এই বাড়ির নাম হয় মনসাবাড়ি।

### দিগঘরী দিঘির কিংবদন্তি<sup>২</sup>

ভেদরগঞ্জ উপজেলার উপকর্তৃ মহিসার একটি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে রয়েছে দু'টি অতিশয় বৃহৎ দিঘি; উক্তর দিকের দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রী দিগঘরী মায়ের বাড়ি, মন্দির ও দিগঘরী তলা। কবে, কে ও কখন এ-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন সে ব্যাপারে ইতিহাসে তেমন সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য নেই। তবে এই এলাকার মানুষের হৃদয় জুড়ে দখল করে আছে এর সম্পর্কে নানান কাহিনি আর কিংবদন্তী।

সেকালে মহিসার গ্রামটি ছিল জনবিরল বসতি, জঙ্গলাকীর্ণ, দুর্গম ও জনমানবের অগম্য একটি ভৌতিক জায়গা। বহু সাধক দূর-দূরাঞ্জ থেকে এখানে এসে সাধনা করেছেন। মায়ের বাড়ির বৃহৎ দিঘির পূর্ব পাড় সংলগ্ন রয়েছে একটি ইসলামিক সাধক চান্দু ফকিরের আস্তানা। এখনো সেখানে বহু সাধক-সাধিকা সাধনা করেন এবং বিভিন্ন উৎসব ও ইসলামিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে বহু আলোচিত ও পরিচিত মনাই ফকিরও মাঝে মধ্যে সাধনা করতে আসতেন। দিগঘরী মায়ের আবির্ভাব লীলা ও শতবর্ষীয় বৃন্দাদের বংশ পরম্পরার প্রবচন আর প্রবাদ থেকে যে কথা প্রতীয়মান তাতে দিগঘরী মায়ের শুভ আবির্ভাবের পূর্বেই খনন করা হয়েছিল এ-দিঘি। দিঘির পশ্চিম তীরে অবস্থিত দিগন্ত বিস্তৃত শাখা-বিশিষ্ট বট-অশ্বথ বৃক্ষযুগল পাদদেশে কোন এক তত্ত্বজ্ঞ-তাত্ত্বিক সন্যাসী সুদীর্ঘকাল আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রতীক স্বরূপে কালী মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে অহর্নিশি সাধনা করতেন। ফলে এর আশে-পাশে জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে। অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার এ-গীঠস্থানের পাশে বসতি স্থাপন করে পীঠস্থানে নিয়মিত পূজা পার্বন করতে থাকেন। অবশ্যে কোন এক সময় সেই তত্ত্বজ্ঞ-তাত্ত্বিক সন্যাসী সিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ এ-গীঠস্থানেরই পার্শ্বের এক সান্তিক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীত্রীদিঙ্গিণা কালী জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক সুন্দরী কন্যাকৃপ। শৈশব থেকেই সে ছিল অঙ্গ কান্তি ঘনকৃষ্ণ মেঘবৎ, আজানুলমিতি কেশধাম, আপ্তাদেশবৃত্ত, আকর্ণবিস্তৃত উজ্জ্বল নয়ন দেবদুর্লভ। এক অপরূপ রূপবতী কন্যা। তিনি প্রত্যহ পীঠস্থানের বট-অশ্বথবৃক্ষযুগলের নিকটবর্তী পশ্চিম পার্শ্বে একটি ছোট্ট পুকুরে (যা পীঠস্থানের জিয়স

পুরুর নামে খ্যাত) স্নান সম্পন্ন করে ধ্যানমগ্ন ঐ সন্ন্যাসীর নিত্যকর্মে সহযোগিতা দান করতেন। সন্ন্যাসীও বেশ মুঝ হতেন এবং আদর-স্নেহে তাঁকে আকৃষ্ট করে রাখতেন। রূপবতী কন্যাটি মাত্র অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করলে সেকালের রীতি অনুযায়ী পিতা তাঁকে বিয়ে দিতে চাইলে কন্যা তাতে অসম্ভব জ্ঞাপন করে। তৎকালীন সামাজিক চাপে অসহায় পিতা বাধ্য হয়ে বর যোগাড় করে কনেকে পাত্রস্থ করতে মনস্থ করেন। নির্ধারিত বিয়ের তারিখের পূর্বের দিন দ্বি-প্রহরে কুমারী কন্যা তাঁর আত্মীয়া ‘মাট্র মা’কে সঙ্গে নিয়ে স্নানের উদ্দেশ্যে দিঘির ঘাটে যায়। কুমারী কন্যা একা-একাই স্বচ্ছসলিলা বিশাল দিঘিতে অবগাহন করতে এগিয়ে যায়। তার সংস্পর্শে দিঘির জল উত্তাল তরঙ্গময়ী হয়ে ওঠে। কন্যাও তরঙ্গময়ী জলের সঙ্গে খেলা করতে করতে মধ্য দিঘিতে ঢলে যায়। মাট্র মা তাঁকে ফিরে আসার জন্য বারবার ডাকতে থাকেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! সে মাট্রকে নিরাপদ স্থানে থাকার জন্য উচৈ স্বরে বলতে থাকে “মাট্র সা...র, মাট্র সা...র”! বলতে বলতে কন্যাটি দিঘির অতল জলে তলিয়ে বিলীন (অপ্রকট) হয়ে গেল। মাট্রমা চিন্তকার দিতে দিতে বাড়িতে গিয়ে অলৌকিক ঘটনাটি বিয়ে বাড়ির সবার কাছে প্রকাশ করেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঢলে এসে শত চেষ্টা করেও দিগন্বরীর সন্ধান পাওয়া গেল না। বিবাহোৎসব মূখ্যরিত ব্রাহ্মণ পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। উল্লেখ্য যে, জন্ম থেকে অষ্টমবর্ষ পর্যন্ত এ-কুমারী কন্যা ন্যূনতম লজ্জা নিবারণ ব্যতীত কোন বস্ত্র পরিধান করে নি। তাই সকলে তাঁকে দিগন্বরী নামে ডাকতো। বিয়ের দিন প্রাতঃকালে জনৈক শাঁখারী মশাই যাচ্ছিলেন সাধকের সাধনস্থল নিজেন অশ্বথ-বটবৃক্ষের তলা দিয়ে ঐ বিয়ে বাড়িতে, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কনেকে বিবাহপূর্ব শাঁখা পরাতে। ঐ সময় অশ্বথ-বট বৃক্ষ-যুগলাভ্যন্তর থেকে এক মানব কঠুস্র ভেসে এলো ‘শাঁখারী মশাই, আমাকে শাঁখা পরিয়ে দিন।’ এই বলে ঐ বৃক্ষযুগলাভ্যন্তর থেকে দুঁটি নারী হস্ত কে যেন এগিয়ে দিলেন শাঁখারী মশাইয়ের কাছে শাঁখা পরাবার জন্য। তৌতসন্ন্যস্ত শাঁখারী মশাই দুঁটি কোমল হস্তে শাঁখা পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাষ্য এলো ‘আমিই বিয়ে বাড়ির কুমারী কন্যা- দিগন্বরী। আমার বাবার কাছ থেকে শাঁখার মূল্য চেয়ে নিয়ে যাবেন।’ একথা জানাজানি হওয়ার পর সন্ন্যাসী গভীর নিশিথে ধ্যানমগ্ন হয়ে আদ্যাশঙ্কি মহামায়ার লীলা অবলোকন করতে পারলেন। দিনটি ছিল শুভ নববর্ষ পহেলা বৈশাখ। মায়ের আদেশে সন্ন্যাসী বট-অশ্বথ বৃক্ষ-যুগলের পাদদেশে মহামায়ার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য একাধারে সাতদিন পর্যন্ত নিয়মিত পূজা ও তেল-সিঁদুর অর্পনের পরামর্শ দিলেন। চারদিকে একথা ছড়িয়ে পড়লে সীয় কল্যাণকামী মাত্তক্ষ বাংসল্য মানব সকল আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশ্বাস স্থাপন করে দলেদলে মহাসমারোহে অশ্বথ-বটবৃক্ষমূলে সমবেত হয়ে পূজার্চনা করতে লাগলো। সে থেকে পারিবারিক-সামাজিক-আধ্যাত্মিক ও আত্ম কল্যাণার্থে সংকল্প নিয়ে মায়ের রাতুল চরণে শান্তীয় রীতিতে কোন কিছু নিবেদন করলে মা তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

### মহিসারের দিঘি ও ‘মাট্র-সার’ নামের তাৎপর্য

মহিসার দুঁটি বিরাট দিঘি রয়েছে। একটি হচ্ছে দিগন্বরী মাতা ঠাকুরাণীর মন্দির/বাড়ির সীমানার মধ্যে আর অপরটি হচ্ছে মায়ের মন্দিরের থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে। তবে দিগন্বরী মাতাঠাকুরাণীর মন্দিরের দিঘি ও তাঁর পার্শ্বস্থ একটি ছোট্ট জিংয়স পুরুরকে

(আধ্যাত্মিক পুকুর) কেন্দ্র করে এতদাখ্যলের মানুষের মাঝে নানা রকম কিংবদন্তী ও নানা অলৌকিক কাহিনি বিদ্যমান রয়েছে যেমন- অনেকের মতে দিঘিদ্বয় কড়ির আমলে খনন করা হয়েছে। সেখানে বিশাল বিশাল মটকায় করে কড়ি মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল। খনন কার্য চালালে হয়তো কড়ির সঙ্কান আজও মিলতে পারে বলে তাঁদের বিশ্বাস। শতবর্ষীয় বুড়োদের সঙ্গে আলাপ থেকে জানা যায়, দিঘি দু'টো নাকি একই রাতে দৈবক্রমে কাটা হয়েছিল। তবে কে বা কারা কিভাবে কেটেছেন তার কোন অনুসন্ধান মিলেনি। কারণ পুরাঘটিত এতোসব ঘটনা ঘটার সময় তৎকালে আশুনিক যুগের ন্যায় কোন ব্যবস্থা ছিল না যাতে করে তা লিপিবদ্ধ করা যেতো। অন্য একটি জনশ্রুতিতে রয়েছে যে, মন্দিরের পার্শ্ববর্তী বাড়ির একটি মেয়ে প্রায়শঃ জিয়স পুকুর ঘাটে বসে থাকতো। বিশেষ করে পূর্ণিমা ও অমাবশ্যক দিনে। একদিন তার মাত্রামা তাকে ডেকে আনতে গেলে মেয়েটি সিড়ি বেয়ে গভীর জলে অপ্রকট হয়ে যায় আর ঠিকার করে বলতে থাকে ‘মাত্রা সা-র, মাত্রা সা-র’। আবার কারো মতে এক পুত্রহীনা মাত্রামা পুত্রাকে দিয়ে দিঘি দুটো খনন করান। কিন্তু দিঘিতে কোন জল উঠেছিল না। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাত্রামা পুত্রাকে দিয়ে নতুন কুলাঘ ধান দুর্বা এবং ফুলসহ পূজার্চনা শেষে হাত-মুখ ধূঁইছিল। ইতিমধ্যে জল বাঢ়তে থাকে এবং পুত্রা ঐ জলের মধ্যে নেমে যেতে থাকে আর জলের গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে সে ঠিকার করে বলতে থাকে ‘মাত্রা সা-র, মাত্রা সা-র’। অপর দিকে ঐতিহাসিকদের মতে দিঘি দু'টিই পাল আমলে খনন করা হয়েছে। কেননা পাল আমলের এমনি বহু দিঘি উন্নত বঙ্গে দেখা যায়। পাল রাজাগণ প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মবলস্থী ছিলেন। এর একটি দ্রষ্টান্ত হচ্ছে- ১৯৮৪ সালে দিঘি খননকালে দু'টি বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্কান পাওয়া গেছে। যা ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে এখনো রক্ষিত আছে। তাছাড়া বিক্রমপুর ও আমাদের শরীয়তপুর জেলার (প্রাচীন দক্ষিণ বিক্রমপুর) অনেক স্থানের নামের শেষে ‘সার’ শব্দাংশটিকু যুক্ত আছে। যেমন- জৈনসার, পঞ্চসার, পশ্চিমসার, সামসার, তুলাসার প্রভৃতি। তদ্রপ মহিপালের স্মৃতি রক্ষার্থে স্থানটির নাম মহিসার রাখা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে ‘মায়ের অপ্রকটকালীন সাবধান বাণীটিকু ধারণ করেই পরবর্তীতে এতদাখ্যল ‘মাত্র-সার’ নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর পীঠহানকে বলা হয় ‘দিগম্বরী তলা’। এই দু'য়ে মিলে স্থানটি ‘মাত্র-সার দিগম্বরী তলা’ নামে খ্যাত। পরবর্তী সময়ে ‘মাত্র-সার’ শব্দটি অপস্তংশ হয়ে ‘মহিসার’ অতঃপর ‘মহিষার’ (বর্তমান) শব্দে রূপ নিয়েছে। আবার কেউ কেউ একে ‘দিগম্বরী মায়ের বাড়ি’ ও বলে থাকেন। কেউবা একে ‘মহিসারের দিঘি’ বললেও চিনতে পারেন। অনেকে সবার প্রিয় ও ছোট্ট একটি মধুর নাম শুধুমাত্র ‘মায়ের বাড়ি’ বলতেও পছন্দ করেন। এখানে সেই প্রাচীনকাল থেকে প্রতি নববর্ষে পহেলা বৈশাখ থেকে সপ্তাহব্যাপী বৈশাখী পূজার্চনা হয়। এ-উপলক্ষে দিগম্বরী মায়ের পূজা সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি এবং মায়েদের ব্যবহার্য উপকরণাদি, শিশুদের খেলনা, খতু ভিস্তিক নানা ফল, দধি-মিষ্ঠি চিড়া-মুড়ি ইত্যাদিসহ কতিপয় মুখরোচক খাবার বিক্রির জন্য কিছু খুদে দোকান-পশারীরাও হাজির হয়। ফলে বিশাল দিঘির পাড় ঘিরে বিশাল বিশাল গাছের ছায়ায় পূর্ণ এ-পবিত্র স্থানটি এখন বাঙালীর ঐতিহ্যের অংশস্বরূপ ‘বৈশাখী মেলায়’ রূপ নেয়। তাই এটি ‘মহিসার গলইয়ার মেলা’ বা ‘মহিসারের মেলা’ নামে আখ্যায়িত হয়েছে।

## গ. লোকছড়া

আধুনিক ছড়া শিশুসাহিত্যের অঙ্গর্গত হলেও লোকছড়া ছেলেবুড়ো সকলের জন্যই প্রযোজ্য। লোকমানুষের মুখে-মুখেই ছড়া তৈরি হয় এবং বাহিত হয়। কালের ধূলোয়ও এই ছড়া হারিয়ে যায় নি। প্রতিদিন যেমন নতুন ছড়া তৈরি হচ্ছে, আবার কিছু পুরনো ছড়ার নতুন রূপ পাচ্ছে।

শরীয়তপর এলাকায় ফালুনের শেষ বা চৈত্র-বৈশাখে বৃষ্টি হলে বীজ বোনার ধূম পড়ে যেত। তখন নিম্নলিখিত একটি প্রবচনধর্মী ছড়া সবাই বলে থাকে।

চৈতের বারো  
বৈশাখের তেরো,  
আউল্যা ভাইরা-  
যে যত পারোঁ ।

অর্থাৎ চৈত্র মাসের বারো তারিখ থেকে বৈশাখ মাসের তেরো তারিখ পর্যন্ত হালচামের প্রকৃষ্ট সময়। এই ছড়ার সঙ্গে খনার বচনের মিল পাওয়া যায়। কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার অধিকারী মানুষের নিজেদের জীবনাভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই লোকছড়ায়। এবং এর মধ্যে প্রাকৃতিক সত্য এবং কৃষিবিদ্যার সত্য লুকিয়ে রয়েছে।

আদিম কাল থেকে মানুষেরা শীতকালে শুকনা লতাপাতা জেলে আগুন পোহাতে শুরু করে। এখন শুধু গরিবই নয়, গাঁও-গেরামের প্রায় সব মানুষেরই শীতকালে আগুন পোহানো একটা চিরাচরিত অভ্যাস। শুকনা লতা পাতা, খড়কুটা প্রভৃতি জেলে এ-অঞ্চলে আগুন পোহানোর সময় অনেকের মুখে শোনা যায়-

শীতকালে আগুন পোহায় না  
কার নানী?  
আগুন পোহাইলে তিনহান কাম  
ব্যাবাক্তে জানি,  
আউগ্যানি, পাউচ্যানি আর খাউজ্যানি! <sup>৮</sup>

শিশু কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে বন্ধুবান্ধবী কেউ একজন প্রস্তাব করতে বসলে-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা দূর থেকে দেখে বন্ধুবান্ধবী কেউ একজন বা সকলে চিৎকার করে আনন্দ করা বা লজ্জা দেওয়ার জন্য স্থানীয় ভাষায় বলেওঠে-

মোত্তে বইছে কে  
হোলদি পোড়া দে  
হোলদি অইলো রাঙা  
হোগা দইর্যা টাঙ্গা! <sup>৯</sup>

শিশু-কিশোর বয়সের পরিচিত ছেলেমেয়েরা একে অপরকে ধোকা দিয়ে বা দুষ্টামি করে আনন্দ পাওয়ার জন্য কখনো সখনো বলে থাকে-

তোরে বোলায়!  
কেড়া?

তোর পেডের পোলায়!  
তোরে নেউক বোলায়!৫

পেডের পোলায় শব্দ থেকে বোঝা যায় যে ছেলেরা মেয়েদের উদ্দেশ্যে এই ছড়া বলে থাকে। এখানে ‘বোলায়’ শব্দের অর্থ ‘কলেরায়’।

গাঁও-গেরামে শাশ্ত্রি ও ছেলেবউর মধ্যে প্রায়ই কলহ লেগে থাকে। বউ তার স্বামীর কাছে শাশ্ত্রির বিরুক্তে, শাশ্ত্রি তার বউর বিরুক্তে ছেলের কাছে সুযোগমত অভিযোগ করে থাকে। শরীয়তপুরের আঞ্চলিক ভাষায় শাশ্ত্রি ও ছেলেবউর ঝগড়ার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো।

কাজ শেষে ছেলে বাড়ি এসেছে, ছেলের কাছে মায়ের নালিশ:  
বাবা তুই রাগ করিছ না  
হইন্না যা আয় গরে!  
ছাইছের তোন আইয়া, অজু ছাড়া বউ  
হাগের পাইলা দরে!৬

তাই শুনে পাশ থেকে ছেলেবউর উন্নতি:  
আম্যাজানের কতায় আহে উট্কি,  
কই রইলো হাগের পাইলা, কই রইলো পুট্কি!৭

এই এলাকার শিখকিশোর যুবক বৃক্ষ অর্থাৎ সব বয়সের নরনারী এক জায়গায় বসে ছড়া, গান, কিস্মা, চুট্টি প্রভৃতি বলে আনন্দে অবসর কাটাত। কখনোবা হাস্যরসের ছড়া বানানোর প্রতিযোগিতাও হতো। হাতের পাঁচটি আঙ্গুল নিয়ে রচিত একটি চমৎকার ছড়া এখানে তুলে ধরা হলো:

এই কুটিডা অইলো শিশ  
পরেরডা জানে না কিছু  
মইদেরডা অইলো দাঁত মাজনী  
হেইয়ার পরেরডা পথ দেহানী  
বুইড্যাডা অইলো আউল বাজানী!৮

অর্থাৎ ছোট আঙ্গুল, কনিষ্ঠ, সে শিশ, অবুঝ। পরেরটা কিছু জানে না। মধ্যমা দিয়ে দাঁত মাজা যায়। আর তার পরেরটি দিয়ে পথ নির্দেশ করা যায়। আর বৃক্ষাঙ্গলি দেখালে ঘামেলা সৃষ্টি হয়।

ননদ-ভাবীর মধ্যে অনেক সময় বৈরীভাব থাকে। একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। ননদ ও ননদ জামাই বেড়াতে এসেছে। এক সময় ননদ ও তার স্বামী (ননদজামাই) এর মধ্যে খুনসুটি হয়। ননদজামাই বেজার হয়ে আঙ্গিনায় এসে (শুণেরের কাজের অবশিষ্টাংশ) চটি চাঁচার কাজ করছেন। এমন সময় ভাবী ননদ জামাইর কাছে গিয়ে বলে,

আঁধি আতে চাড়ি ছাছে-  
আমার নন্দেরে নিবেন না!

আমার নন্দের চেকন গলা  
বাঁশি বাজে কদমতলা!১০

নন্দের প্রতি ভাবীর মিছরির ছুরির ন্যায় আচরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছড়ায় আঙি-আংটি, আতে-হাতে, ছাছে-চাঁছে, চড়ি-বাঁশের চটি, চেকন-চিকন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শরীয়তপুর সদরের বিনোদপুর সুবেদার কান্দির শিশু-কিশোর ছেলেমেয়েরা পানিতে দুব সাঁতার, চইচও প্রভৃতি খেলা খেলে থাকে। পানিতে খেলতে গিয়ে দুবাড়ুবির কারণে চোখ প্রচও লাল হয়ে যায়। চোখের সেই লাল তাড়াতাড়ি কেটে যাবে (সেরে যাবে) এরূপ বিশ্বাসের একটি ছড়া গান এই এলাকায় প্রচলিত আছে। প্রতি দুই জনে নিজ নিজ দুই হাতের বৃন্দাঙ্গুল দিয়ে একে অপরের দুই চোখ চেপে ধরে যুগল কঢ়ে সুরে সুরে ছড়া গানটি গেয়ে থাকে। ছড়াটি নিম্নরূপ-

কাউয়া লো কা  
শিল্পী রাইন্দা খা  
শিল্পীর বিতর গু  
কুরালে করে কু,  
বিলাইতে করে মেঁও  
আমার চোকের লাল পানি-  
তোমার চোকে নেও,  
তোমার চোকের ঠাণ্ডা পানি আমার চোকে দেও!১১

ছড়া গানটি গাওয়া শৈষে অনেকক্ষণ পানিতে দুব দিয়ে থেকে পরে ওঠে। চোখের লাল কোট না গেলে আবার একই নিয়মে চলতে থাকে। এভাবে সুরে সুরে গানটি গায় এবং আবার অনেকক্ষণ দুব দিয়ে থেকে পরে ওঠে ও বাড়ি চলে যায়। মা চোখের লাল দেখলে বঁকুনি দেবে-এই ভয়ে এরূপ ছড়াগান গেয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করে এবং পরে বাড়ি যায়।

শিশু কিশোর বয়সে অনেক সময় ‘সংখ্যা গোনা’র খেলার পাল্লা হতো। বলা হতো কে কুড়ি পর্যন্ত তাড়াতাড়ি গোনতে পারে?

ছড়ায় সংক্ষিপ্ত কুড়ি-

একা,  
দোকা,  
বুলবুলি-  
চোকা;  
লাউয়া  
দুরি,  
উমিশ-  
কুড়ি!১২

শিশুকে সাতুনা দিতে হবে কিংবা ঘুমপাড়াতে হবে অথবা তাকে নিয়ে খেল আনন্দে সময় কাটাতে হবে। এ-লক্ষ্যে বাবা-মা কিংবা শিশুর বড় বোন বা বড় ভাই

চিত হয়ে শুয়ে নিজের দুই হাঁটু ভাঁজ দিয়ে উপরে জাগিয়ে পাশাপাশি দুই পায়ের পাতার  
উপর শিশুকে বসায়। তারপর শিশুর দুই হাত নিজের দুই হাতে ধরে এবং পায়ের শাখা  
নেড়ে নেড়ে শিশুকে দোল খাওয়ায় আর দোলার তালে তালে সুরে বলতে থাকে-

**বাড়ই লো বাড়ই, দাওহান দেও!**

দাও দিয়া কি করবা?

বরগ কাড়মু!

বরগ দিয়া কি করবা?

বউ আনমু!

বউ কই?

জলে গ্যাছে!

জল কই?

ডাউগে খাইছে!

ডাউক কই?

বনে গ্যাছে!

বন কই?

পুইড়া গ্যাছে!

ছাইমাড়ি কই?

ধোপায় নিছে!

ধোপা কই?

আডে গ্যাছে!

আড কই?

মিল্লা গ্যাছে!<sup>১৩</sup>

ছোড়ো তাল গাছটা লড়ে চড়ে বড়ো তালগাছটা ভাইসা পড়ে, দুঃখুরুত যা! এই  
বলে শিশুকে আলতোভাবে ফেলে পাশে শোয়ানো হয়।

### শিক্ষামূলক ছড়া

দিনে শিবা রাতে কাক

বাঢ়ুর সামনে গাভীর ডাক

তালগাছে শকুনের বাসা

তবেই ছাড় দুনিয়ার আশা!<sup>১৪</sup>

### সংখ্যার ছড়া

যখন ছিল দুই পাও

যেহানে খুশি সেহানে যাও

যখন অইল চাইর পাও

ভাত-কাপড় দিয়া যাও।

যহন অইল ছয় পাও

আবৰা আমারে লইয়া যাও।<sup>১৫</sup>

### প্রশ্ন-উত্তর ছড়া

ওখানে কে রে ?  
 আমি খোকা  
 মাথায় কী রে ?  
 আমের ঝাঁকা  
 খাসনে কেনরে ?  
 দাঁতে পোকা ।  
 বিলোসনি কেন রে ?  
 ওরে বোকা ।<sup>১৬</sup>

### খেলার ছড়া

হাতগুটি খেলার সময় ছেলেমেয়েরা মুখেমুখে ছড়া কাটে । যেমন-

দাদু পান সুপারি খায়  
 পান সুপারি খেয়ে দাদু  
 হাট বাজারে যায় ।  
 হাটে ছিল পাগলা কুকুর  
 কামড় মেড়েছে ।  
 সেই কামড় খেয়ে দাদু  
 গাছে উঠেছে ।  
 গাছে ছিল কাঠ পিপড়া  
 কামড় দিয়েছে ।  
 সেই কামড় খেয়ে দাদু  
 পানিতে নেমেছে ।  
 পানিতে ছিল বাঘমায়া  
 হাওয়া দিয়েছে ।  
 সেই হাওয়া খেয়ে দাদু  
 বাড়ি গিয়েছে ।  
 বাড়িতে ছিল টিপাটিপি  
 পা টিপেছে ।  
 সেই পা নিয়ে দাদু  
 স্বর্গে গিয়েছে ।  
 স্বর্গে ছিল রাজকুমারী  
 বিয়ে করেছে ।  
 ছি-ছি-ছি দাদু  
 বিয়ে করেছে ।<sup>১৭</sup>

আরেকটি ছড়ায় যুক্ত হয়েছে আধুনিক অনুষঙ্গ—

হাও মিলো  
ছিলো ছালো  
হ্যাপি বয়  
হ্যাপি গার্ল  
পিং পং স্বাদ এলো বেরিয়ে ।  
ভাইয়াকে বলো না  
চিড়িয়াখানা চলো না ।  
চিড়িয়াখানায় হাতি নেই ।  
তোমার আমার সাথী নেই ।<sup>১৮</sup>

খেলার সময় কাটা হয় এমন আরেকটি ছড়া—

শান্তালতা বাঁশের পাতা  
বাঁশ ঝুনঝুন করে  
শান্তালতার বিয়ে হবে  
জমিদারের ঘরে ।  
জামিদারের ছেলে  
মুরগি চুরি করে ।  
অর্ধেক পথ যাইয়া মুরগি  
কক-কক করে ।  
নড়ে না চড়ে না  
সবাই মিলে চুপচাপ ।<sup>১৯</sup>

### ব্রতের ছড়া

হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষ্যে ছড়া কাটা হয় । সাধারণত নারীরাই এই ছড়া কেটে থাকে । কয়েকটি ব্রতের ছড়া এখানে উল্লেখ করা হলো:

১  
ওঠ ওঠ সূর্য ঠাহৰ  
ঝিকি মিকি দিয়া ।  
উঠতে যদি না পারো  
বিমলারে লইয়া ।  
বিমলা গো পঞ্চ কইন্যা  
দানে দিল বিয়া ।  
খাওয়াইলা লওয়াইলা  
কেমনে দিল বিয়া ?<sup>২০</sup>

২

রামের মতো পতি পাব,  
সীতার মতো সতী হবো ।  
লক্ষণের মতো দেবর পাব,  
দশরথের মতো শশুর পাব ।  
কৌশল্যার মতো শাশুড়ি পাব,  
কুষ্টীর মতো পুত্রবতী হব ।  
দ্রৌপদীর মতো রাঁধুনী হব,  
দৃগ্নির মতো সোহাগী হব ।  
দূর্বার মতো নত হব,  
ষষ্ঠীর মতো তেজী হব ।<sup>১</sup>

৩

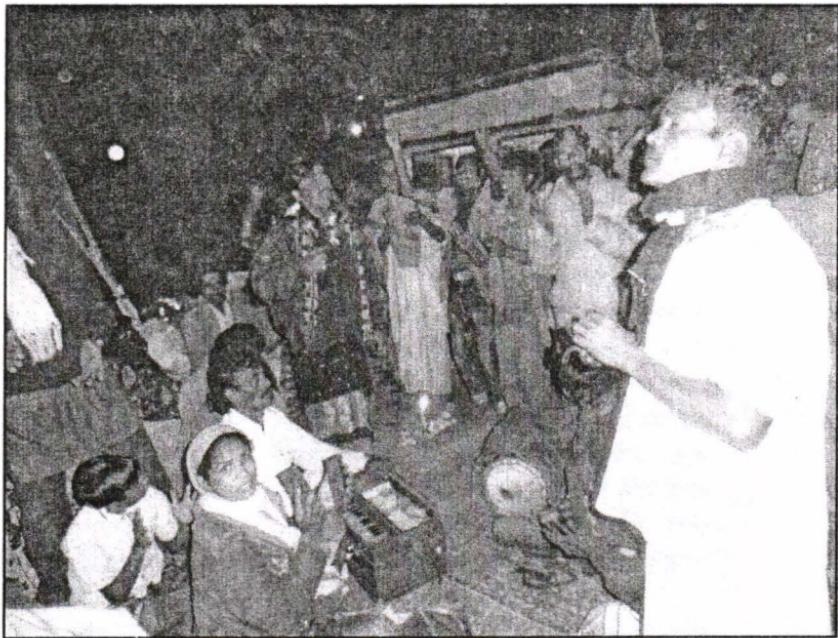
অশ্থ তলায় বাস করি ।  
সতীন কেটে নির্মল করি॥  
সাত সতীনের সাত কোটা ।  
তার মাঝে আমার অভয়ের কোটা॥  
অভয়ের কোটা নাড়ি-চাড়ি ।  
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥<sup>২</sup>

৪

কুঁচ কুঁচতি কুঁচই বন, কেনরে নাতি এতক্ষণ ।  
মোহর এল ছালা ছালা, তাই তুলতে এত বেলা ।  
টাকা এল ছালা ছালা, তাই তুলতে এত বেলা ।  
ধান এল ছালা ছালা, তাই তুলতে এত বেলা ।  
চাল এল ছালা ছালা, তাই তুলতে এত বেলা ।  
ডাব এল ছালা ছালা, তাই তুলতে এত বেলা ।<sup>৩</sup>

### ৪. ভাটকবিতা

ভাটকবিতাগুলো বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয় । ছড়ার তৎক্ষণিক আমেজ ছাড়িয়ে এগুলো একটু গভীরতর হয় । এই ছড়াগুলো মুখে মুখে রচিত হয় আবার কখনো কখনো কোনো লোককবি পুঁথির আকারে লিখে রাখেন । নিচে একটি ভাটকবিতা উদ্ধার করা হলো । এগুলোকে পথকবিতাও বলা হয় ।



শোরাজপুর টেক্কেরহাট বাজারে ভাটকবিতার আসর

### নিজাম ডাকাতের কথা

১. শোন শোন শ্রোতা বঙ্গ দেশ বিদেশী ভাই॥  
নিজাম খুনির কথা কিছু লেখিয়া জানাই ।  
নিজাম ছিল বড় ডাকাত এই দুনিয়ার পরে ।  
দয়া মায়া না আছিল তাহার অন্তরে ॥  
৪/৫ টারে খুন করিয়া খাইতোরে ছামনের খানা ।  
দেখ খোদার আজব কারখানা ॥
২. দিন দুপুরে রাস্তার পরে কোমর বাঢ়িয়া ।  
বসে থাকতো নিজাম খুনি রাম দাও হাতে লইয়া ॥  
সাত খুন না করিয়া খাইতো নারে খানা ।  
আর বেশী করতো খুন পাইতো যে কয়জনা ॥  
দয়া-মায়া নাহি ছিল শোনতো না কেউর কান্দ না ।  
দেখ খোদার আজব কারখানা ॥
৩. একদিন সেখ ফরিদ যাইতেছিল আপনার ঘরে ।

ভাগ্য চক্রে পরে গেল খুনির নজরে॥  
 টাকার লোভে নিজাম তাকে খুন করিতে চায়॥  
 কে-কে নিবে পাপের অংশ নিজামকে জিগায়॥  
 নিজাম বলে ভাগী হবে, মাতা-পিতা, স্তৰী পুত্র কন্যা-  
 দেখ খোদার আজব কারখানা॥

৪. ঘরে আছে পুত্র কন্যা বাপ আরও মায়।  
 তারা আমার অসৎ কামাই বইয়া বইয়া খায়॥  
 যারা খাবে অসৎ কামাই অংশ নিবে তারা  
 আজরাইলের মত নিজাম রামদাও হাতে খাড়া  
 ফরিদ বলে বাপ মাকে জিজ্ঞাসিয়া আস না॥ এ
৫. এই কথা শুনিয়া নিজাম হাসিয়া আটখানা।  
 বলে, আমার কাছে এ সমস্ত না চলে বাহানা॥  
 আমি যদি জিজ্ঞাসিতে বাঢ়ি চলে যাই।  
 দেশ ছাড়িয়া যাবা তুমি এক দৌড়ে পালাই॥  
 আমার কাছে এ সমস্ত বাজে কথা চলে না॥ এ
৬. ফরিদ বলে রাখ মোর হাতে পায় বান্ধিয়া।  
 কেন মতে যাইতে যেন, না পারি পালাইয়া॥  
 মাতা-পিতা স্তৰী-পুত্র ঘরে আছে যত।  
 তারা যদি পাপের অংশ নেয় সমান মত॥  
 তার পরেতে খুন করিছ তুই হায়রে নিজাম কানা॥ এ
৭. ইহা শুনি নিজাম খুনি আনিয়া এক রাসি।  
 বান্ধিল জনমের বাঙ্কা মনের মত কশি॥  
 আছিল এক বট বৃক্ষ আনিয়া সেখানে-  
 তার সঙ্গে বান্ধিল কশি যত ছিল মনে॥  
 কোন মতে পালাইয়া যাইতে যেন পারে না॥ এ
৮. হাত-পাও, বান্ধিয়া পরে বক্ষে পাথর দিয়া।  
 বাপ-মাকে জিজ্ঞাসিল বাঢ়িতে আসিয়া॥  
 খুন করিয়া যত টাকা কামই করে আনি।  
 হবা কিনা পাপের ভাগী বল মা-জননী।  
 মাতা-পিতা বলছে তখন কেন্দ্র নিব তোর পাপ-গুনা॥ এ
৯. ১০ মাস ১০ দিন তোরে গর্ভে দিনু ঠাই।

সেই কষ্টের সমান কষ্ট ত্রিজগতে নাই॥  
 শীতের দিনে ফুল বিছানে শোয়াইয়া তোমারে ।  
 আমরা শইছি ভিজা যায়গায়, গু-মুতের ভিতরে॥  
 এখন মোরা হইছি বুড়া খাইবো তোর কামাই খানা॥ এ

১০. রাগের সঙ্গে বলছে পিতার শোনরে হারাম খোর  
 এই জগতে যাহার ছেলে না হইয়াছে চোর?  
 যাহার ছেলে নয়রে ডাকাত, নাহি করে খন?  
 যাহার ছেলে অসত কাজে না যায় রে কখন?  
 তাহার মাতা, পিতা, ভবে খাইতে বুঝি ভাত পায় না? এ

১১. সু-পুত্র জন্মিয়া ভবে বংশ উজ্জ্বল করে ।  
 কু-পুত্র লইয়া তাহার পাপ দিতে চায় ঘারে॥  
 দর হইয়া যা হারামজাদা সমুখ হইতে মোর ।  
 আর যেন থাকিয়া ভবে মুখ দেখিনা তোর ।  
 করলাম তোরে ত্যাজ্য পুত্র, তুইতো আমার পুত্র না॥ এ

১২. এই কথা শুনিয়া নিজাম দেওয়ানা হইল ।  
 স্ত্রীর কাছেতে যাইয়া বলিতে লাগিল॥  
 খুন করিয়া যত টাকা আনি কামাই করি ।  
 সেই পাপের অংশ নিবা কি না বল প্রাণেশ্বরী?  
 স্ত্রী কি বলল তখন শোনরে বঙ্গগণ॥ এ

১৩. ছেটকালে মাতা-পিতা পালিয়া পুসিয়া ।  
 তোমার হাতে সুপে দিছি সিয়ানা করিয়া॥  
 সেই হইতে হইছি আমি তোমার সঙ্গী ।  
 পাপ খাওয়াও কি পুণ্য খাওয়াও আমি কি আর জানি?  
 আমি কি? বলেছি তোমায় কর যাইয়া পাপ গোনাহ॥ এ

১৪. আমি তোমার ঘরের দাসী যদি করি পাপ ।  
 তুমি আমার গোনাহ খাতা (অপরাধ) করে দিবা মাফ॥  
 তাহা না করিয়া তোমার পাপ দিতে চাও ঘারে ।  
 কেহর পাপে কেউ দ্বুবে না যার পাপে তার ধরে॥  
 দেখো ফেরাউনের পাপের বোঝায় আছিয়ারে ধরল না॥ এ

১৫. এই কথা শুনিয়া নিজাম পাগলের মতনে ।  
 দৌড়াইয়া চলিল হায়রে সেখ ফরিদ যে খানে॥  
 যাইয়া দেখে ফরিদ সাহ রইছে সেখায় বসি ।

কোথায় রইছে বুকের পাথর, কোথায় রইছে রশি ।  
ইহা দেখি নিজাম খুনির থামে না আর কান্দনা॥ এ

১৬. কান্দিতে লাগিল নিজাম ধরে পাও দু'খনি॥  
জামা-কাপড় ভিজে গেল ঝরে আঁধির পানি॥  
ফরিদের চরণে পড়ি কান্দিতে লাগিল ।  
দুই নয়নের জলে তাহার বক ভিজিয়া গেল॥  
মাফ কর (২) নইলে আরতো উপায় দেখি না॥ এ

১৭. জীবন ভরে করছিরে পাপ নাইকো তাহার সিমা ।  
আমার জন্য রাখছে খোদায় ভীষণ জাহানামা ।  
এই কথা বলিয়া নিজাম পড়লো পীরের পায় ।  
মুখে তাহার বলতে আছে শুধু হায় হায় ।  
আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া করছে শুধু কান্দার॥ এ

১৮. ফরিদ বলে শুনরে নিজাম, আমার কথা শোন ।  
করুণাময় বিশ্বপতি আছেরে একজন॥  
আজ হইতে তোবা কর খোদার দরগায় ।  
সোনাকে ডুবাইয়া যিনি লোহাকে ভাষায় ।  
তাঁহার কাছে কানরে নিজাম হইয়া তাঁহার দেওয়ানা॥ এ

১৯. তাঁহার নামের মালা পরি রাত্রি দিন জপ ।  
পাহাড় সমান করলে গুনাহ তাও করে মাফ॥  
কান্দিয়া বলিল নিজাম ধইরা গুরুর পাও ।  
তোমার সঙ্গে সঙ্গে হায়রে আমায় নিয়া যাও ।  
পীরের সঙ্গে চললো নিজাম, ছাড়িয়া পুত্র-কন্যা॥ এ

২০. থাকিয়া পীরের সঙ্গে নানা দেশে ঘোরে ।  
কত দিনে পৌছুলো যাইয়া দিল্লির শহরে॥  
তিনটি বছর রইল নিজাম পাগলের ভেষ ধরি ।  
মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র ছাড়িয়া ঘর বাঢ়ি॥  
মাফ করহে মারুদ মাওলা এই শুধু তার জপনা॥ এ

২১. তাহার পরে ফকির পীরে দেশেতে চলিল ।  
বসাইয়া এক গাছের তলে নিজামকে বলিল॥  
এই যে দেখ মরা বৃক্ষ নাইকো ফল ও ফুল ।  
আজ ১২ বৎসর গত হইল শুকাইয়া গেছে মূল॥  
এই গাছ তলে বসি কান্দ মাফ করবে সাঁই রক্বানা॥ এ

২২.      মরা গাছে নতুন পাতা ধরবেরে যেদিন ।  
           মনে কইর তোমার গোনাহ্ মাফ্ হবে সে দিন॥  
           এই কথা বলিয়া ফরিদ চইলা গেল ঘরে ।  
           ঐ গাছ তলে বসিয়া নিজাম আল্লাহ্ (২) করে॥  
           কত গোনাহ্ করছি হায়রে মাফ্ কর সাঁই রক্ষানা॥ ঐ
২৩.      ওহে প্রভু বিশ্বপতি ত্রিজগতের সাই ।  
           তুমি ছাড়া করণাময় অন্য কেহ নাই॥  
           পাহাড় সমান করছি গোনাহ্ মাফ্ কর আমারে ।  
           চোখের পানি বুক বাহির অবৰ বরন বরে॥  
           তার পরেতে কি হইল শোনরে বঙ্গগণ॥ ঐ
২৪.      এই প্রকারে কত দিন গত হইয়া গেল ।  
           নতুন এক ঘটনা হায়রে ঐ খানে ঘটিল॥  
           ঐ দেশে আছিল এক সুন্দরী রমণী ।  
           রূপে গুণে ছিল সেত সতীর চূড়ামণি॥  
           তার রূপের কাছে হার মানিত সোনার গড়া প্রতিমা॥ ঐ
২৫.      পর্দানশীন থাকতো সদা পর্দার ভিতরে ।  
           কোন সময় না দেখিত অচেনা অপরে॥  
           ঐ দেশের এক দারুণ পাপী ব্যাভিচারী ছিল ।  
           কুক্ষণে পড়িয়া তাহার নজরে পরিল॥  
           ঐ রূপ দেখিয়া পাপী হইল রূপের দেওয়ানা॥ ঐ
২৬.      মনে মনে বলে পাপী কি দেখিলাম হায় ।  
           এমন রতু আর দেখিনাই খোদার দুনিয়ায়॥  
           মরি-মরি, আহা মরি! ঐ রূপ দেখিয়া ।  
           তুম্বের আগন্তের মত অঙ্গ যায় জুলিয়া॥  
           মনের আশা করবো পুরা ঐ রূপসী ছাড়বো না॥ ঐ
২৭.      সকাল, বিকাল, রাত্রি দিন আশায় ২ ঘোরে ।  
           আর পড়লো না সাধক্ষী সতী পাপীর নজরে॥  
           দিনে দিনে মাস পুরিল মাসের পর বৎসর  
           তবু পাপীর মনের আশা রইল মনেই তার॥  
           ইহার পরে কি হইল শোনো তাহার বর্ণনা॥ ঐ
২৮.      পাপীর যত মনের আশা মনেই রইয়া গেল ।

ହାୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା କଲେରାୟ ମରିଲ ॥  
 ମାତା-ପିତା ବଞ୍ଚୁ ଭାତା କବର ଦିଯେ ଶେଷେ ।  
 କନ୍ଦିଆ କାଟିଆ ତାରା ବାଡ଼ି ଚଲେ ଆସେ ॥  
 ମେଯେର ଶୋକେ ମାତା-ପିତାର ଚୋଥେର ପାନି ଥାମେ ନା ॥ ଏ

୨୯. ହାୟରେ ପାପୀ ବ୍ୟାଭିଚାରୀ ତ୍ରିଜଗତେର ପାଜି ।  
 ତାର କଥା ଲିଖିତେ ଆମାର କଲମ ହୟ ନା ରାଜି ।  
 ଯଥନେ ମରିଛେ କନ୍ୟା ଶୋନଲୋ ପାପ କାନେ ।  
 ଖୋଣ୍ଡା କୋଦାଲ ଲହୟା ପାପୀ ଚଲଲୋ ଗୋରଙ୍ଗାନେ ॥  
 ରାତ୍ରିକାଲେ କବର ଖଦି ତାର ସଙ୍ଗେ କରତେ ଜେନା ॥ ଏ

୩୦. ଏକେ ତୋ ଭାଇ ଜୋନାକ ରାତ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ନିଶି ।  
 ନିଜାମ ଖୁନି ଦେବତେ ଆହେ ଗାଛେର ତଳେ ବସି ॥  
 କେ ଯେନ ହାୟ କବର ଖୁଦି ନାମଲୋ ଗୋରେର ମାରେ ।  
 ନିଜାମ ବଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଶ ଆର ଲାଗବେ ବେ କୋନ୍ କାଜେ ॥  
 କୀ କରତେଛେ ଦେଖେ ଆସି ଏହି ବଲେ ହୟ ରଙ୍ଗୋନା ॥ ଏ

୩୧. ଯାଇଯା ଦେଖେ ମହାପାପୀ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଶେର ପରେ ।  
 ମନେର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରତେ ବୁକେ ବୁକେ ଧରେ ॥  
 ଇହା ଦେଖେ ନିଜାମ ଖୁନିର ଅସି ହଇଲ ଲାଲ ।  
 ବଲେ ବିନା ଦୋଷେ ଖୁନ କରିଛି ହାୟରେ ଏତୋ କାଳ ॥  
 ଏହି ଶାଲାରେ ଖୁନ କରିବ ଯା କରେ ପାକ ରବାନା ॥ ଏ

୩୨. ସାମନେ ପାଇଲୋ ଖଣ୍ଡି କୋଦାଲ ଧରିଯା ଆଛାଡ଼ି ।  
 ମାଥାର ଖୁଲି କରଲୋ ଗୁରା ଦିଯାରେ ଏକ ବାଡ଼ି ॥  
 ତାର ପରେତେ କବର ଖୁଦି ଚାପା ମାଟି ଦିଯା ।  
 କାନ୍ଦିତେ ଲାଗିଲ ନିଜାମ ଗାଛତଳେ ବସିଯା ॥  
 ଆହାରେ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ ତୋମାର ଲୀଲା ବୁଝି ନା ॥ ଏ

୩୩. ହାୟରେ ଖୋଦା ବିଶ୍ୱପତି ତ୍ରିଜଗତେ ସାଇ ।  
 ଜୀବନ ଭରେ କରଛିଲେ ଖୁନ ତାହାର ସୀମାନାଇ ॥  
 ଆବାର ଏକଟି ଖୁନ କରିଲାମ ତୋମାର ନାମ ଲଇୟା ।  
 ସହିତେ ପାରଲା ନା ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରତେ ଦେଖିଯା ॥  
 ତୌବା କରେ ଆବାର ବୁଝି ଖୁନ କରେ କରଲାମ ଗୁନା ॥ ଏ

୩୪. ମାଫ୍ କର-ମାଫ୍ କର ବଲେ କାନଲେ ସାରାନିଶି ।  
 କରନ୍ତାମୟ ଖୋଦାର କାହେ ଗାଛେର ତଳେ ବସି ॥

করণাময় খোদার কাছে তুলে দোন হাত ।  
 চোখের জলে বুক ভিজাইয়া কানলো সারা রাত ।  
 প্রভাতে চাহিয়া দেখ মাঝ হইছে তার পাপ গোনাঃ॥ ঐ

৩৫. মরা গাছে ধরছে পাতা বরছে কত ফুল ।  
 ১২ বৎসর আগে যাহার শুকাইয়াছিল মূল ॥  
 খুন করিয়া নিজাম ডাকাত করছে কত পাপ ।  
 আবার একটি খুনে সব গোনাহ তার হইয়া গেল মাঝ ।  
 খোদা তোমার খেলা তুমিই বোধ আমরা কিছু বুঝি না॥ ঐ
৩৬. ভাইরে, অল্প বয়েসে কবি হইয়া দেশে দেশে ঘূড়ি ।  
 কানে শুনি, চক্ষে দেখি, দেখি পত্র গঢ়ী॥  
 কেউ করিয়া অসত কামাই মহা সুখে থায় ।  
 আবার কেহ করে ব্যাবিচারী চুপে ২ হায় ।  
 কেহ আবার ধরা পরি সয় দুনিয়ার লাঞ্ছনা॥ ঐ
৩৭. তাই বলি ভাই সকলি, শোনেন দিয়া মন ।  
 কেউ হইও না মহাপাপী ভুলেও কথন॥  
 কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ সংযম করিয়া ।  
 সৎ পথে পরিয়া থাক, খোদার দিকে চাইয়া॥  
 মাতা-পিতা বদ্ধু আতা কেহর পাপ কেহ নেবে না॥<sup>২৪</sup> ঐ

## তথ্যনির্দেশ

- ১ মফিজুল ইসলাম, কবিকুণ্ঠ, স্বর্ণঘোষ, শরীয়তপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১
- ২ সাক্ষকার, জিতেন্দ্রচন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক, শ্রীশী দিগবরী মাতা ঠাকুররানীর মন্দির পরিচালনা কমিটি এবং প্রভাষক, এম. এ. রেজা ডিপ্রি কলেজ, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১
- ৩ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ৪ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ৫ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ৬ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ৭ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ৮ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ৯ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ১০ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ১১ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু
- ১২ মফিজুল ইসলাম, প্রাণকু

- ১০ মফিজুল ইসলাম, প্রাণক
- ১১ মফিজুল ইসলাম, প্রাণক
- ১২ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাজিরা ডিপ্রি মহাবিদ্যালয়, জাজিরা, শরীয়তপুর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১
- ১৩ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ১৪ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ১৫ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ১৬ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ১৭ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ১৮ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ১৯ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ২০ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ২১ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ২২ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ২৩ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক
- ২৪ সংগ্রহস্তুৎ: রীনা রানী দাস, প্রাণক

# বন্ধুগত লোকসংস্কৃতি

## লোকশিল্প

জীবনযাপনের তাগিদেই সাধারণ মানুষ বাঁশ, বেত, লোহা, সোনা, তামা, কাঁসা, মাটি প্রভৃতি বস্তু দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে নানারকম সামগ্ৰী নির্মাণ করেছে। এর মাধ্যমে যেমন সাংসারিক প্রয়োজন ঘটিছে, তেমনি এর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে লোকজীবনের শিল্পচেতনা। লোকসমাজের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে লোকশিল্প। এই সব লোকশিল্প বৎসরস্পরায় প্রবাহিত হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে শ্রমজীবী মানুষ লোকশিল্পের চৰ্চা করে থাকে। শরীয়তপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী কয়েক ধরনের লোকশিল্পের বিবরণ তুলে ধৰা যায়।

### ১. মৃৎশিল্প

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার রামভদ্রপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম কার্তিকপুর। মৃৎশিল্পের জন্য এ-গ্রামের সুখ্যাতি যুগ-যুগান্তরের। এ-গ্রামের পাল বৎশের



কুমারের ঢাক

লোকদের আদি পেশা মাটি দিয়ে ঘর গৃহস্থলির বিভিন্ন বাসন কোসন, কলস, টালি, ঘটকা, হাড়ি, পাতিল, বদনা সহ অনেক তৈজসপত্র তৈরি করা। বৎশ পরস্পরায় এ-কাজ করে আসছে কুমার বা পালেরা। স্বাধীনতার পর আধুনিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে কার্তিকপুরের মৃৎশিল্পে। এই এলাকার উৎপাদিত শিল্পসম্ভাবনা আজ সমাদৃত হয়েছে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ২০টি দেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে। সুনাম আর সুখ্যাতি অর্জন হলেও গত ৩০ বছর এ-পেশায় কাজ করে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি মৃৎশিল্পীদের। কেউ এগিয়ে আসেনি কার্তিকপুরের পালদের নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সহায়তা করতে।

কার্তিকপুর গ্রামে সমীর পাল, প্রদীপ পাল, সন্দীপ পাল, রঙ্গদীপ পাল, গোবিন্দ পাল, জওহরলাল পাল ও উত্তম পালের ৩টি ফ্যান্টিরি রয়েছে মাটির আধুনিক পণ্য



মাটির হাঁড়ি বানাচ্ছেন কুমার-বধু

তৈরির জন্য। কার্তিকপুরের পালদের মৃৎশিল্প কারখানায় তৈরি হয় মাটির ট্যারাকোটা, টাইলস, মোমদানি, ফুলদানি, ফুলের টব, নাইট ক্যান্ডেল, কয়েন বক্স, সিনারি ওয়াল প্লেট, ক্যাকটাস টব, ওয়াল প্লাস্টার, ওয়াল টব, কলমদানি, ভিজিটিংকার্ড বক্স, স্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের নেইটি বেইটি হাউজ, মা মেরির মূর্তি, ক্রিসমাস হ্যাংগিং রিং সহ অন্তত ৩শ ধরনের সো পিচ। এ-সকল পণ্য তৈরি করার জন্য পরিবারের লোকদের বাইরেও রামভদ্রপুর, ডিঙ্গামানিক ও কার্তিকপুর গ্রামের প্রায় ৪ শতাধিক বিভিন্ন বয়সের শ্রমিক, বিশেষ করে নারীশ্রমিকেরা কাজ করে।

বে-সরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) কারিতাস, হীড় বাংলাদেশ, উষা হ্যাভিক্রাফটস, ঢাকা হ্যাভিক্রাফটস ও আড়ং এর মত অনেক প্রতিষ্ঠান কার্তিকপুরের মৃৎশিল্প পন্থিতে এসে উন্নিষ্ঠিত পণ্য তৈরির জন্য অর্ডার দিয়ে থাকে। এ সকল এনজিও এই পণ্যগুলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহরের নামী দামী মার্কেট ও মেলায়

বিক্রি করে। বেশিরভাগ পণ্য তারা ইউরোপ মহাদেশের সর্বত্র, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে রপ্তানি করে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব লোগো এ-সকল পণ্যের গায়ে ঝটে নেয়। বছরের পুরো সময় ধরেই মৃৎপট্টিতে কাজের চাপ থাকে। দেড় ইঞ্জিন থেকে শুরু করে ৬ ফিট আকারের এবং ৩ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা মূল্য মানের বিভিন্ন পণ্য এই পালেরা তৈরি করে থাকে।

মৃৎশিল্পীরা জানান, প্রথমে তারা দোআঁশ মাটি সংগ্রহ করে। এই মাটি পানির সঙ্গে মিশিয়ে তরল করে। মাটি ও পানির তরল অংশ জার্মান থেকে আমদানি করা বিশেষ ধরনের জালি (নেট) দিয়ে ছাঁকা হয়। এরপর ২০ দিন পর্যন্ত বিশেষ পাত্রে ঝুলিয়ে রেখে পানি ঝাড়ানো হয়। পানি ঝরা শেষ হলে তাকে মুঝু বলা হয়। এই মুঝু রোদে শুকিয়ে তা আবার পানি মিশেয়ে নরম করে তা দিয়ে ডিসাইন বা নকশা অনুযায়ী মূল পণ্য তৈরি করা হয়। তৈরি কাঁচা পণ্য সরাসরি রোদে বা আগুনে শুকানো যাবেনা। এগুলোকে মাচা করে ঘরের ভেতরে ১০/১২ দিন পর্যন্ত রেখে শুকাতে হয়। শুকানো পণ্যের গায়ে স্থানীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাঙ্কা রং মেঝে পাঠিয়ে দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে। এই সকল সংস্থা পছন্দ মত রং করে এরপর ব্যবহার উপযোগী করে বিক্রি ও রফতানি করে।



বানানোর পর মাটির পণ্য শুকানো হচ্ছে



টেকসই করানোর জ্য পোগানো হচ্ছে

মৃৎশিল্পী সন্দীপকুমার পাল জানান, তাদের বংশপরম্পরার পেশা মাটির তৈরি বিভিন্ন পণ্যনির্মাণ ও বিক্রি করা। ১৯৭৬ সালে ঢাকা আর্ট কলেজের একজন শিক্ষকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় তারা প্রথম মাটির তৈরি আধুনিক পণ্য তৈরি করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিক্রি করা শুরু করে। পাশাপাশি বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। এরপর থেকে তাদের নির্মিত পণ্যের মান দেখে ক্রমেই তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে থাকে কয়েকটি সংস্থা। তিনি বলেন, তাদের উৎপাদিত এই পণ্যগুলো চুক্তিবদ্ধকারী প্রতিষ্ঠান দেশের বড় বড় প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করে এবং বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

সমীর মৃৎশিল্পের স্বত্ত্বাধিকারী প্রদীপকুমার পাল বলেন, তাদের বড়ভাই সমীরকুমার পাল ভারতে থাকেন। সেখান থেকে বিভিন্ন বিদেশি ডিসাইন সংগ্রহ করে পাঠালে সে অনুযায়ী তারা পণ্য তৈরি করেন। তাদের প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১০/১২ লক্ষ টাকা মূল্ধন রয়েছে। ঢাকার যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বানিয়ে নেয় তারা বছরে প্রায় ৩০/৪০

লাখ টাকার অর্ডার দেয়। পাশের দুইটি ফ্যান্টারিতেও অনুরূপ পণ্য তৈরির অর্ডার দেয়া হয়। এই পল্লী থেকে বছরে প্রায় কোটি টাকার মৃৎপণ্য তৈরি করে সরবরাহ করা হয়। তাদের ১ ফিট মাপের ১টি পণ্য মেমন নাইট ক্যানেল (পরী) তৈরি করতে মাটি, শ্রমিক সহ ৬০ টাকা খরচ পড়ে, কিন্তু বিক্রয় করা হয় মাত্র ৭৫ টাকা। অর্থাৎ এর একটা নাইট ক্যানেল ঢাকায় বিক্রি করা হয় ‘আড়াইশ’ থেকে তিন শ’ টাকা। বিদেশে কমপক্ষে ২০ ডলার। তারা ৫-৭ ফুট লম্বার একেকটি হাতি নির্মাণ করে পায় ১৫-১৮ হাজার টাকা। আর এগুলো ঢাকায় বা এর বাইরে বিক্রি হয় ৩৫-৪০ হাজার টাকায়।

রঙ্গদীপ পাল জানান, তাদের ৪ ভাইয়ের যৌথ পরিবারের এই শিল্পের কাজ করে আয় হয় মাসে মাত্র ৪০/৫০ হাজার টাকা। ৩০ বছর যাৎ এ-কাজ করে দেশ বিদেশ থেকে অনেক সুনাম অর্জন হয়েছে বটে কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। অনেক বার ঢাকার জাতীয় যাদুঘরে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় সনদও পেয়েছেন। কিন্তু তাদের নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সহায়তার আশ্বাস কেউ দেয়নি। তিনি বলেন, নিজেদের এ-ব্যবসা করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এ-জন্য ঢাকাতে অফিস, সো-ক্রম থাকতে হয়। বিদেশী বায়ারদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করতে পারলে আরো অধিক পণ্য তৈরি করে রঞ্জনি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব, আর এজন্য প্রয়োজন সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের কার্তিকপুরের মৃৎশিল্পীদের পাশে এগিয়ে আসা।

ডিঙ্গামানিক গ্রামের মৃৎশিল্প মালতি রানী (২২) জানান, তিনি কিশোরী বয়স থেকে মৃৎশিল্পের কাজ করেন। কখনো স্থায়ী কখনো খণ্ডকালীন কাজ করে মাসে প্রায় সাড়ে তিন থেকে ৫ হাজার টাকা রোজগার করেন।

মৃৎশিল্প সোহানা (১৭), পারভীন (১৮) ও অর্চনা (১৮) জানায় তারা স্কুলে লেখাপড়া করার সময় থেকেই পালবাড়ির মৃৎশিল্পের খণ্ডকালীন কাজ করত। নিজেদের লেখা পড়ার খরচ বহন করার পরও তারা কাপড় চোপড় ও প্রসাধনীর অর্থ এই পারিশ্রমিকের আয় থেকে বহন করত। এখনো তারা প্রত্যেকে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৪ হাজার টাকা আয় করছে বলে জানায়।

কার্তিকপুর পালপাড়া রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিলন কুমার দাস বলেন, পালদের তৈরি মাটির পণ্য এতটা মানসম্মত যে, কেউ কাছে এসে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করে কেউ বিশ্বনন্দিত এত সুন্দর পণ্য উৎপাদন করতে পারে। তিনি বলেন, এখনকার পালদের পুঁজি থাকলে তারা নিজেরাই এ-পণ্যগুলো বিদেশে রফতানি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হতে পারত।

রামজন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ শাহজাহান ঢালী বলেন, যুগের পর যুগ ধরে কার্তিকপুর গ্রামের পালেরা মৃৎশিল্পের কাজ করে আসছে। তাদের সুনাম রয়েছে দেশে বিদেশে। তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে পাঠিয়ে এর লভ্যাংশ নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা। কিন্তু সরকার যদি এই সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করত তা হলে তারা শরীয়তপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সুনামকে আরো বৃদ্ধি করতে পারত।

শরীয়তপুরের ঝাউচর গ্রামের সহদেব পাল, পিতা সুবলচন্দ্র পাল জানান তাদের পূর্বপুরুষ ৩৬ থেকে ৪ শত বছর ধরে কুমারের কাজ করছে। তার পরিবার ৪০ বছর

ধরে এ-কাজ করছে। এঁটেল মাটি, বালু, চাক, ঢাইস, চুলা, লাকড়ি উপকরণই মূল। তাঁর পরিবার হাঁড়ি, পাতিল, নকশি পুতুল, আলপনা, সখের হাঁড়ি, মুখোশ প্রভৃতি জিনিসপত্র তৈরি করে।<sup>১</sup>

এক যুগ আগেও শরীয়তপুরের গ্রামে গ্রামে পালপাড়া ও কুমারপাড়ায় প্রতিমা তৈরিসহ রকমারি সামগ্রী তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করত মৃৎশিল্পীরা। কালের ব্যবধানে স্টিল, দস্তা, সিলভার, ও প্রাস্টিক সামগ্রীর সঙ্গে পালা দিতে গিয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে মৃৎশিল্প। কিন্তু ভিন্ন আঙিকের কারণে এখনও নানা প্রতিকূলতায় টিকে রয়েছে শরীয়তপুরের সমির পাল মৃৎশিল্প। এখানে তৈরি বিভিন্ন শোপিস, টালি, ওয়ালমেট, কয়েনবেঞ্জ, মোমদানি, ফুলদানি দেশের গও পেরিয়ে রঙানি হচ্ছে বিভিন্ন দেশে সাফল্য শুধু প্রতিষ্ঠানেই নয়, এসেছে পুরো গ্রামে। পুরুষের পাশাপাশি আজ বাড়তি আয় করছেন নারীরাও। কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ত শতাধিক নারীর। এদিকে সরকারি পঞ্চপোষকতার অভাবে তৈরি সামগ্রী সরাসরি রঙানি করতে না পারায় লাভ হচ্ছে না বলে জানান সমীর মৃৎশিল্পের মালিক সরকারি সহযোগিতা পেলে কার্তিকপুরের মৃৎশিল্প দেশের পাশাপাশি বিদেশেও সুনাম অর্জন করতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।<sup>২</sup>

কোটাপাড়গামের কুমার সুধীরচন্দ্র বলেন, আগে মাটির তৈরি জিনিসের কদর ছিল বলে আমরা কাজ করে লাভবান হতাম। এখন খেলনা ছাড়া হাড়ি, পাতিল, কলসসহ অন্যান্য জিনিসপত্রের তেমন কদর নেই। তাই অনেকেই এই পেশা ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া কাজ করতে লোকও পাওয়া যায় না। পাশাপাশি ব্যাংক বা সরকার থেকে আমরা কোন সহযোগিতা পাই না। ভোজেশ্বর বাজারের কুমার দীলিপচন্দ্র বলেন, এ-কাজ করে এখন আর পোষায় না। ভাল মাটিও পাওয়া যায় না। তাছাড়া আগের মত জিনিসপত্রের চাহিদাও নেই। পুঁজির অভাবে বিদেশে রফতানি করা যাচ্ছে না। বাপ-দাদার পেশা বলে টুকি টাকি কাজ করে এ-পেশাকে ধরে রেখেছি।<sup>৩</sup>

## ২. কামারের কাজ

লোহা পুড়িয়ে কিছুটা নরম করে তারপর পিটিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। লোহার কাজ যারা করে, তাদের বলা হয় কর্মকার বা কামার। শরীয়তপুরের প্রায় প্রতিটি স্থায়ী হাটেই কামারের দেখা পাওয়া যায়। কামারের সাধারণত দা, কাচি, বঁটি, ঝুঁতি, লাঙলের ইস প্রভৃতি দ্রব্য বানায়। তারা ঢাকা থেকে লোহার পাত কিনে নিয়ে যায়, তারপর কয়লার চুল্লিতে হাঁপরের বাতাস দিয়ে আগুনকে গনগনে করা হয়। এর মধ্যে লোহার পাত রাখলে লোহা গলে যায়। কিছুটা নরম হলে হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হয়। ইচ্ছেমতো পেটালেই হয় না। দরকারি স্থানে পিটিয়ে তারা বাঁকা করে। তারপর পেটাতে পেটাতেই দা, কাচি কিংবা যে দ্রব্য বানাবে, তাঁর আদল নেয়। এর জন্য পরিশৰ্ম, দক্ষতা এবং শিল্পজ্ঞানও থাকা দরকার।

শরীয়তপুরের আদি পেশার মধ্যে কামার বা কর্মকারের পেশা সর্বজনস্বীকৃত হলেও নানা প্রতিকূলতার কারণে এ-পেশার সঙ্গে যুক্ত শরীয়তপুর জেলার ৬ উপজেলার প্রায় ১২শ' কামার পরিবারের ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছে দুর্ঘাগের ঘনঘটা। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, জ্বালানি কয়লা ও লৌহজাত শিল্পে আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন হওয়ায়

কামারদের সুদিন আর নেই। দা, বটি, কান্তে, কোদাল, হাতুড়ি ও কুঠার তৈরি করাই কামার বা কর্মকারের প্রধান কাজ। বর্তমান সময়ে এসব জিনিসের চাহিদা ত্রাস পাওয়ায় বলদ-লাঙ্গলের পরিবর্তে কলের লাঙ্গল ব্যবহার হওয়ায় কোদাল ও লাঙ্গলের ফাল তৈরির প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। দা, কুঠার যা-ই দু-একটি তৈরি হচ্ছে তা দিয়ে সংসার চলছে না কামারদের। যাঁতি, ছেচুনিসহ বিভিন্ন সৌখিন সামগ্ৰীতে লোহের ব্যবহারের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবহার হওয়ায়ও কামারদের আয়-রঞ্জির পথ কুঠ হয়ে আসছে। শরীয়তপুর জেলার ৬৫টি ইউনিয়নের বিভিন্ন হাটবাজারে এক সময়ে ৫ সহস্রাধিক কামারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতো। কালক্রমে এদের সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে ১ হাজার ২শতে দাঁড়িয়েছে বলে একটি বেসরকারি সংস্থাৱ হিসাব মতে জানা গেছে। এসব কর্মকারের অবস্থা এতই কুণ্ড যে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দুবেলা দুমুঠো আহার জোগাড় করতেই হিমশিম থাচ্ছে। এদের সত্তানদের লেখা-পড়াৰ খৰচ জোগাতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।



হাপুরের গনগানে আঙুলে শোষা পোড়ানো হচ্ছে

বুড়িরহাট বাজারে কর্মবত চন্দনকর গ্রামের ভাষান কর্মকারের ছেলে শিশু কর্মকার জানান, এক সময় কামার পেশাটি রাজ রাজাদের অতি প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের ঢাল তরবারি তৈরি করাই ছিল কর্মকারদের প্রধান কাজ। কালক্রমে রাজাদের রাজত্ব শেষ হওয়ার পর আধুনিক অঙ্গের ব্যবহার শুরু হলে কামারদের কদর কমতে থাকে। এর পরেও দেশের কৃষিক্ষেত্রে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কান্তেসহ দা, বটি তৈরি করে কামারদের দিন ভালোই চলছিল। বর্তমানে কলের লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু হওয়ায় লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, নিড়ানি যন্ত্রের কাঠি তৈরির প্রয়োজন পড়ে না বললেই চলে। ফলে

কামারদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। কর্মকাররা তাদের পৈতৃক পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য পেশায় যুক্তহচ্ছে। বাপ-দাদার আমল থেকে এ-পেশায় যুক্তিহাকার ফলে কর্মকাররা নতুন কোনো পেশায় গিয়ে সুবিধা করতে পারছে না বলে তিনি জানান।

সাজনপুর বাজারের সুকুমার কর্মকার জানান, লোহার মূল্য বৃদ্ধি, পাথর কয়লার সংকট সর্বোপরি লোহার তৈরির সামগ্রীর চাহিদা কমে যাওয়ায় কামারদের সুদিন শেষ হয়ে গেছে। সারা দিন কাজ-কর্ম করে পেটের ভাত জোগাড় করাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সরকারি প্রঠিপোষকতা ও কোনো স্বীকৃতি না থাকায় কামার সম্প্রদায় এ-পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।<sup>8</sup>

বুড়িরহাটের ৮০ বছর বয়সের সুনীল কর্মকার জানান, সরকারি প্রঠিপোষকতা ও কাজের স্বীকৃতি পেলে কর্মকার পেশায় থেকেও দেশের ব্যাপক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে শরীয়তপুর জেলার কামাররা। এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় ঝণ সুবিধা, কাঁচামালের নিচয়তা ও লোহার তৈরি জিনিসপত্রের বিক্রয় ও বিপণনের ব্যবস্থা করা।

পালং, আঙ্গারিয়া, কার্তিকপুর, ভেদরগঞ্জ, বুড়িরহাট প্রভৃতি বাজারে এখনো কামাররা তাঁদের জীবিকা টিকিয়ে রেখেছে। গ্রামীন জনপদে গৃহস্থালী কাজে এবং কৃষি কাজে লোহার দ্রব্যের চাহিদা সব সময়েই থাকবে। তাই কামারের কাজও চলতে থাকবে।

### ৩. নকশা ও আল্লনা

আল্লনা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের একধরনের লোকাচার। দৈনিক পূজার্চনায়, কাঁসা বা পিতলের ঘট ব্যবহৃত হয়। বিয়ের গায়েহলুদ কিংবা নানান আচারের জন্য পানির জন্য ঘট, কলস ও পাতিল লাগে। এসব পাত্রে নানান রকম নকশার ব্যবহার থাকে। এ-নকশা আঁকা হয় স্থানীয়ভাবে হাতে বানানো রঙে। মাটির পাত্রের জন্য চালের গুঁড়া, চুন, তেল, সিন্দুর ও বিভিন্ন পাতার রস দিয়ে আঁকা হয় ফুল ও লতাপাতা বা স্বত্ত্বিকা চিহ্ন।

হিন্দুদের পূজার জন্য মনসার ঘট, লক্ষ্মীর ঘট, বিপদনশিল্পীর ঘট, শিব চতুর্দশীল ঘট সাজানো হয়। সামাজিক উৎসবে অর্থাৎ বিয়ে, জন্মদিন, পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উঠোনে আল্লনা করা হয়। হিন্দুবাড়িতে গোবরগোলা জল ছিটিয়ে বাড়ি শুন্দ করে নেওয়া হয়। তারপর ঘরের মেঝে, উঠোন বা পথের উপর চালের গুঁড়ির আল্লনা আঁকা হয়। এগুলো বাড়ির মেঝেরাই করে থাকে। শরীয়তপুরের প্রায় সর্বত্র এই রীতি চালু রয়েছে। বর্তমানে বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে নকশা আঁকার জন্য পেশাদার রঙশিল্পীদের ডেকে আনা হয়। তারা কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এখনো হাতে বানানো চালের গুঁড়ি বা পিটুলি দিয়ে উঠোনের আলপনা আঁকা হয়।

**সরাচিত্ব:** লক্ষ্মীপূজার জন্য ব্যবহৃত লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি অংকিত মাটির সরাকে লক্ষ্মীর সরা বলা হয়। হিন্দু বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার সময় এগুলো বাজার থেকে কিনে আনা হয়। পেশাদার প্রতিমাশিল্পীরা এগুলো নির্মাণ করে। আগে হাতে বানানো রঙ দিয়ে এই সরাচিত্ব আঁকা হতো। এখন কৃত্রিম রঙ ব্যবহৃত হয়। এতে কেবল লক্ষ্মীদেবীর মুখের ছবিই নয়, তার চারপাশ ঘিরে আরো নানান বিষয় চিত্রিত হয়। ধনসম্পদের অধিকারী দেবী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, ধানের ছড়া, ধানক্ষেত প্রভৃতি চিত্রও লক্ষ্মীর সরায় পাওয়া

যায়। দুর্গাপূজার জন্য মাটির প্রতিমা ব্যবহৃত হলেও লক্ষ্মীর সরার মতো মাটির সরায় দুর্গাপ্রতিমার চিত্রও আঁকা হয়। এতে দেবী দুর্গার বাহন সিংহ, লক্ষ্মী, সরমতী, কার্তিক, গণেশ প্রমুখ দেবতা এবং অসুর নিধনের দৃশ্যও আঁকা হয়।



সরাচিন্দে দুর্গাপ্রতিমা



শখের হাঁড়ি

**শখের হাঁড়ি:** বিয়ের অনুষ্ঠানে মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার জন্য শখের হাঁড়ির ব্যবহার বেশি হয়। এছাড়া ঘরের শিকেয় রাখা হাঁড়ি কিংবা ঘর সাজানোর উপকরণ হিসেবে আজকাল শখের হাঁড়ির প্রচলন রয়েছে। মাটির হাঁড়ির গায়ে বহু রঙের ব্যবহারে ফুল, ফুল, পাখি ইত্যাদির নকশা আঁকা হয়।

প্রথমে মাটির হাঁড়ি কেনা হয়। এর উপর রঙতুলি দিয়ে ফুল, ফুল, পশ্চ পাখির ছবি আঁকা হয়। এখানেও ব্যবহৃত হয় আতপ চালের গুঁড়ো, লতাপাতার রস, তেল, হলুদ প্রভৃতি রঙ। তবে এখানেও এখন পেশাদার শিল্পীদের কারুকাজ দেখা যায়। এবং মাটির হাঁড়ি কিনে রঙ করার পাশাপাশি রঙকরা মাটির হাঁড়িও কিনতে পাওয়া যায়। হাঁড়ি-পাতিলের বানানোর কুমারই এই শখের হাঁড়ি তৈরি করে। পার্থক্য শুধু রঙ আর নকশার ক্ষেত্রে।

#### ৪. দারুশিল্প

কাঠমিস্তি বা সুতাররা প্রাচীনকাল থেকেই হাতুড়ি-বাটালি, ছেমি, ও রেঁদা দিয়ে কাঠের উপর ছবি আঁকত। বসার চেয়ার, চৌকি, শোয়ার খাট বা পালংক, আলমারি, সিঙ্গুক, বাদ্যযন্ত্রের বাঙ্গ, দরজা, ঘরের খিলান প্রভৃতির উপর নানান দৃশ্য ফুটিয়ে তেলা হয়। কেবল দৃশ্য নয়, নকশাও আঁকা হয়। এখনো দারুশিল্পের কদর রয়েছে। কাঠের বস্তির চেয়ে প্রাণ্টিক ও স্টিলের পর্ণে ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিমাণ কমেছে। শরীয়তপুরে এখনও কাঠের কাজে কাজ করা হয়। শরীয়তপুরে জেলা সদরের পুরোনা

নাম পালং শব্দটি এসেছে ‘পালংক’ থেকে, এটা ও এলাকার মানুষের ধারণা । এবং সেই পালং ছিল কারুকাজ করা, এটা ও অনুমান করা যায় ।

দারুশিল্পের যে কাজগুলোর এখনো চাহিদা রয়েছে, তা হলো— নকশা করা সোফা, খাবার টেবিল, পড়ার টেবিল, বসার টুল, তেপায়া, জলচৌকি, চেমার পূজার আসন, ঘরের দরজা, জানালা, বারান্দার রেলিং, সিডির রেলিং, ড্রাইংরুমের ছেট বড় টব, বইয়ের তাক, আলমারি প্রভৃতি ।

## ৫. নকশিকাঁথা

হস্তশিল্পের এক প্রাচীন ঐতিয় হচ্ছে নকশিকাঁথা । পালং, ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া প্রভৃতি এলাকায় নকশিকাঁথা এখনো তৈরি হয় । প্রথমে দুই তিন পরতের পুরোনো কাপড়দিয়ে কাঁথা সেলাই করে নেওয়া হয় । কেউ কাঁথাগুলোকে প্রথমে সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে



নকশিকাঁথা

কাঁথার চারপাশ সেলাই করে । তারপর কাঁথার জমিনে পাখি, হাতি, ফুল, লতা, পাতা, মোরগ, কবুতর, দোয়েল প্রভৃতি ছবি আঁকা হয় । আঁকা ছবিগুলোর উপর দিয়ে সুই সূতার সেলাই দেওয়া হয় । পশ্চপাখির বদলে নানান নকশাও তৈরি হয় । এতে দালান কিংবা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিও আঁকা হয় । মোটা সূতা, বড় সুই, সাদা কাপড় দিয়ে এসব নকশিকাঁথা বানানো হয় ।

একসময় মানুষ সৌখিন প্রয়োজনে নকশিকাঁথা তৈরি করত । এখন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নকশিকাঁথা তৈরি করা হয় । বিছানায় শুয়ে কাঁথা গায়ে জড়ানোর পদলে এখন পাতলা চাদর, কম্বল ও লেপের ব্যবহারই বেশি হয় । নকশিকাঁথা এখন

গ্রামে তৈরি হয় কিন্তু শহরের মানুষ এটি শখ করে কিনে থাকে । দেশের বাইরেও এই নকশিকাঁথার কদর রয়েছে ।

## ৬. কারুশিল্প

প্রায় সকল উপজেলায় বেশ কিছু গ্রামে বাঁশ বেতের কাজ চোখে পড়ে । এসব গ্রামের বেশ কিছু পরিবার বাঁশ-বেত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । বাঁশ বেত দিয়ে কুলা, চালুনি, ডোলা, ওড়া, খাড়ি, পুরা, কাপাইর, জাবার, হাত পাখা, আনতা, বাঁচা, পলো, চাঁই ইত্যাদি

তৈরি হয়। আবার বেত দিয়েও একই রকম পণ্য তৈরি করা যায়। এগুলোপ কারণশিল্প নামে পরিচিত।

**নির্মাণ উপকরণ:** বেতেরও নানান প্রকার আছে। বাঁশ আছে নানান প্রকার। যেমন— রফাইমূলী, ডুলু মূলী, মৃতিঙ্গা মূলী, টেট্টা বাঁশ, বাজালী/চিকন মূলী, বরাক, শিল বরাক, জাই বরাক, বাঁরী বাঁশ, মহাল, ছনাপতি, টেংরা, বুন বাঁশ ইত্যাদি। ভিন্ন প্রকার পণ্য বানাতে ভিন্ন প্রকারের বাঁশের ব্যবহার করা হয়। বাঁশশিল্পীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে বাঁশ নির্বাচন করে থাকেন।

**নির্মাণ প্রক্রিয়া :** শরীয়তপুর অঞ্চলে বেশ কিছি ধরনের বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।



বাঁশ-বেতের কাজ করছেন এক গৃহবধু

ব্যবহারের আগে বাঁশ ও বেত কেটে পুকুরে বা খালে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এভাবে মাসের পর মাস সংরক্ষণ করা যায়। নির্বাচিত বাঁশের আইকাগুলো প্রথমে ধারোলো দা দিয়ে চেঁচে-ছিলে পরিষ্কার করতে হয়। তারপর প্রায় ৪-৫ ফুট আকারে টুকরা করা হয়। পরে এগুলোকে কেটে পাতলা ফালি বা কাইমে পরিণত করা হয় এই কাইমগুলোকে আবার অনেক পাতলা করে ফালি করা হয়, যেগুলো বেতের ফালির মতো দেখায়। তারপর এইগুলোকে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিলে হালকা হয়ে যায়। এগুলো একের পর এক পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় এসব নানান প্রয়োজনীয় পাত্র। বেত দিয়ে একই প্রতিক্রিয়ায় পণ্য তৈরি করা হয়। বাঁশ বেতের শিল্পীরা বাঁশ বেতের নানা

পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করতে রাম দা (বড় কোপা দা), ছেট কোপা দা, পাতলা ছেনি, শক্ত কাঠের মুগুর, শক্ত গাছের গুড়া দিয়ে তৈরি পাটাতন প্রভৃতি ব্যবহার করে।

**বাঁশের চাঁই:** শরীয়তপুর অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ উৎপন্ন হয়। বেত গাছ, মূর্তা বা মোতা গাছও কম বেশি রয়েছে। কিন্তু সেভাবে কুটিশিল্পের কাজে এসবের ব্যবহার হয়নি। পশ্চিম অঞ্চলের মাছ ধরার পুরনো উপকরণের একটি হচ্ছে চাঁই। এই চাঁই বুনে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের মানুষ সচল জীবনযাপন করছেন। কেউ কেউ আবার চাঁই বুননের কাজে পুঁজি বিনিয়োগ করে ভালো মুনাফাৰ পাশাপাশি সুস্থি করতে পেরেছেন কর্মসংস্থানের সুযোগও। গ্রীষ্মের শুরু থেকে এ-অঞ্চলের খাল-বিল ও নদী-নলায় শুরু হয় চাঁই দিয়ে মাছ ধরা। বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁশ দিয়ে নদী-খালে, বিল-বাঁওড়ে গড়া দেওয়া হয়। ২০ ফুট থেকে শুরু একেকটি গড়া ১০০ ফুটেরও বেশি লম্বা হয়ে থাকে। এই গড়ার ৪-৫ ফিট ফাঁকে ফাঁকে বসানো হয় একটি করে চাঁই। পানিতে চাঁই বসানো হয় মূলত চিংড়ি মাছ শিকারের জন্য। তবে এতে ধরা পড়ে পুঁটি, বেলে, টেঁরাসহ সব প্রকারের ছেট মাছ।



রামকৃষ্ণপুরের চাঁইশিল্প

রামকৃষ্ণপুর গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, এই গ্রামের ১০ বছর বয়সের শিশু থেকে শুরু করে আবাল্যন্দবনিতা সবাই মিলে চাই বুনেছে। কেউ বাঁশ কাটছে, কেউ শলা তুলছে, কেউ শলা চাচছে আবার কেউবা ব্যস্ত চাঁই বোনা ও বাঁধার কাজে। ঘরের বারান্দায়, উঠানে, গাছের ছায়ায় যে যেখানে পারছে সেখানে বসেই করছে চাঁই বানানোর কাজ।

রামকৃষ্ণপুর গ্রামের প্রায় ২০০টি পরিবারের মধ্যে ১৫০টি পরিবারের অন্তত ১ হাজার ২শ শিশু, নারী ও পুরুষ জড়িত চাঁই বোনার কাজে। প্রায় ২০ বছর ধরে এই গ্রামে চাঁই বানানোর কাজ চললেও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে ৩-৪ বছর ধরে।

রামকৃষ্ণপুরের আঃ রব মাদরব, লাল মিয়া মাদরব, দুলাল সরদার, তোতা মিয়া থান, মোমিন বেপারী, ঠাণ্ডু দেওয়ান, রিপন মাদরবসহ ২০-২৫ জন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তাদের বাড়িতে চাঁই বোনার কাজ করছেন। এসব ব্যবসায়ী মূলধন খাটিয়ে গ্রামের দরিদ্র পরিবারকে সম্পত্তি করেছে চাঁই বানানোর কাজে। সঙ্গাহে এই গ্রামে ৫-৬ হাজার চাঁই বানানো হয়। চাঁইগুলো প্রতি বৃহস্পতিবার বিক্রি হয় স্থানীয় কাজীর হাটে। জেলার চাহিদা পূরণ করে মুঙ্গীগঞ্জ, চাঁদপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর ও বরিশালের পাইকারদের কাছে বিক্রি করা হয় এই চাঁই।

চাঁই তৈরির জন্য তল্লাবাঁশ সবচেয়ে বেশি উপযোগী। এই বাঁশগুলো যশোর থেকে আমদানি করা হয়। প্রতিটি বাঁশে শুটি চাঁই হয়। প্রতি ১০০টি চাঁই বানাতে খরচ হয় ১০ হাজার টাকা। বিক্রি হয় ১৫ থেকে ১৭ হাজার টাকা। শ্রমিকরা প্যাকেজ আকারে চাঁই বানানোর কাজ করে। মাপমতো বাঁশ কাটা, শলা তোলা, শলা চাঁচা, সুতা দিয়ে খেল বাঁধা, চটা বাঁধা, মুখ বাঁধা চুক্তি ভিত্তিতে করে থাকেন। এতে প্রতি শ্রমিক গড়ে দৈনিক আয় করেন ২০০ টাকা। রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বাইরেও মানিকনগর, দুবিসায়বর ও মোল্যাকান্দি গ্রামের ৩-৪শ লোক চাঁই বোনার ছুটা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে উপর্যুক্ত করছেন হাজার হাজার টাকা।

মাঘ মাস থেকে এই গ্রামে চাঁই বোনার কাজ শুরু হয়। চলে আশ্বিন পর্যন্ত। বছরের ৯ মাসই গ্রামবাসী ব্যস্ত থাকেন এই চাঁই বোনার কাজে। এক মৌসুমে প্রায় ২ লাখ চাঁই বানানো হয়। এই পন্থিতে প্রতি মৌসুমে মালিক ও শ্রমিক মিলে চাঁই উৎপাদন করে আয় করেন প্রায় ২ কোটি টাকা।

চাঁই বুনন-শ্রমিক শহিদুল কাজী ও তার স্ত্রী রঞ্জিনা বেগম বলেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে বাতদিন চাঁই বুনি। সঙ্গাহের শেষে আমরা ও হাজার থেকে ৩ হাজার ৫শ টাকা করে বিল তুলি। বছরের ৯ মাস চাঁই বোনার কাজ করে আমরা অনেক ভালো আছি। আমাদের সংসারে কোনো অভাব নেই।

নিলুফা বেগম (৩৮) বলেন, আমি প্রতিদিন ১০০টি করে পাঢ় বাঁধাই করি। প্রতিটিতে ২ টাকা করে পাই। রোজ ২০০ টাকা আয় করে আমি সচলভাবে দিন কাটাই। চাঁই বানানোর উদ্যোগে আবদুর রব মাদরব বলেন, ২ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে চাঁই তৈরির ব্যবসা করছি। সঙ্গাহে ২০০ চাঁই নামাতে পারি। এতে সব খরচ বাদ দিয়ে লাভ হয় সঙ্গাহে ১০ হাজার টাকা। তিনি জানান, তাদের উৎপাদিত চাঁই জেলার চাহিদা পূরণ করে মুঙ্গীগঞ্জ, চাঁদপুরের হাইমচর, মতলব, বরিশালের মুলাদী ও হিজলা, ফরিদপুরের সদরপুরের পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যান।

মোমিন বেপারী বলেন, আমরা কোনো রকম ব্যাংক সুবিধা পাই না। আত্মসম্বজননের কাছ থেকে ধারকর্জ করে ও সুদে টাকা এনে চাঁই বানানোর ব্যবসা করি। জ্যেষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত চাঁইয়ের চাহিদা বেশি। এ-সময়

কোনো সরকারি সহায়তা পেলে আমরা আরও লাভবান হতে পারতাম। বড়কান্দি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম সরদার জানান, রামকৃষ্ণপুর গ্রামের চাঁই তৈরির উদ্যোক্তাদের সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা করা গেল তারা আরও লাভবান হতে পারত। এই শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন বলেও তিনি জানান।<sup>৯</sup>

## ৭. নৌশিল্প

শরীয়তপুরের নিম্নাঞ্চলে কোষা নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে আবহমানকাল থেকে। বর্ষার পানি যখন খাল-বিল ও বাড়ির আশপাশে থৈ-থৈ করে তখন কোষা নৌকাই হয়ে ওঠে এখানকার মানুষের একমাত্র বাহন। ফলে এ-অঞ্চলে কোষা নৌকা নির্মাণে দক্ষ কারিগরের সৃষ্টি হয়। আর এই কোষা বেচাকেনার জন্য এ-জেলায় বেশ কিছু প্রসিদ্ধ হাট-বাজার গড়ে ওঠে। যার মধ্যে সদর উপজেলার বুড়িরহাট হচ্ছে সবচেয়ে বিখ্যাত। কোষা নৌকা বেচাকেনায় এই বুড়িরহাটের রয়েছে শতবর্ষের ঐতিহ্য।

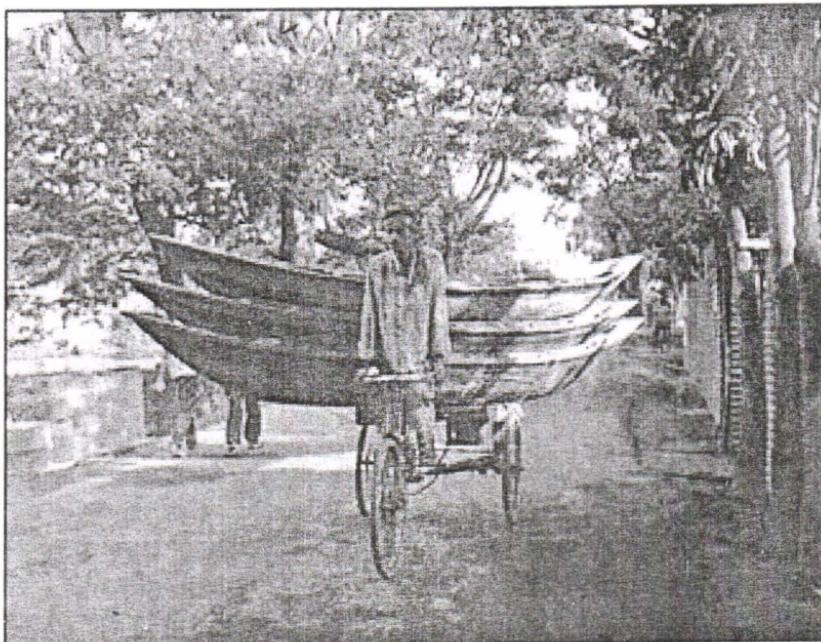
প্রতিবছর বর্ষা শুরু সঙ্গে সঙ্গে শরীয়তপুর জেলার বিশেষ কয়েকটি হাটবাজারে নৌকা বিক্রির ধূম লেগে যায়। সদর উপজেলার বুড়িরহাট ও সুবচনি বাজার, জাজিরার কাজীর হাট, ভেদরগঞ্জের সখিপুর, গোসাইরহাটের দাসের জঙ্গল বাজার ও নড়িয়া উপজেলার ভোজেশ্বর বাজারে বর্ষা মৌসুমে কয়েক হাজার কোষা নৌকা বিক্রি হয়। এর মধ্যে নৌকা বেচাকেনার হাট হিসেবে জেলার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাট হচ্ছে বুড়িরহাট। এই হাটের ঐতিহ্য শতবর্ষের। বুড়িরহাট থেকে শুধু স্থানীয়রাই নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করে বরিশাল, চাঁদপুর, মাদারীপুর ও মুনিগঞ্জের ক্ষেত্রারা এসেও কোষা নৌকা কিনে নিয়ে যায়।

তবে রাস্তাঘাট বৃক্ষি ও নদ-নদীতে পানি কমে যাওয়ায় বর্তমানে নৌকার ব্যবহার অনেক কমে গেছে। ফলে নৌকার চাহিদাও আগের মতো আর নেই। এতে নৌকার নির্মাণ শ্রমিক তথা কারিগরদের সুদিনও আর নেই। তবে এ-জেলার নিম্নাঞ্চলে কোষা নৌকার ব্যবহার হয় বলে এখানকার কারিগররা এখনো কোনভাবে টিকে রয়েছেন।

এক সময় শরীয়তপুর জেলার বাইরে থেকে পাইকাররা বড় বড় ঘাঁসি নৌকা নিয়ে বুড়িরহাটে আসতেন কোষা কিনতে। তারা একেকটি ঘাঁসি নৌকার ভেতরে, ছাদে ও এর সাথে বেঁধে শতাধিক কিলোমিটার দূরে বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কোষা নৌকা বিক্রি করতেন। এখন বাইরের লোক না আসলেও বুড়িরহাট থেকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন এসে কোষা কিনে থাকেন।

এদিকে পাপরাইল, চন্দনকর, ছয়গাঁও, পাটানিগাঁও আটেরপাড়া, মাকসাহার, ঘোড়ার ঘাট, বিঝারী, ভুবিসায়বর ও ডুবুলদিয়া গ্রামে রয়েছেন অনেক দক্ষ কারিগর বা মিস্ত্রি। তাঁরা বর্ষা শুরুর আগেই কোষা নৌকা বানানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ-সময় তাঁরা নতুন ঘর নির্মাণ বা মেরামতের কাজ করেন না।

একটি কোষা তৈরি করলে ৭শ' টাকা মজুরি পাওয়া যায়। এ-মৌসুমে তারা প্রায় একশ'টি কোষা নৌকা তৈরি করেছেন। এতে তাদের ভাল আয় হলেও চাহিদা কমে যাওয়ায় অনেক মিঞ্চিই তেমন কাজ করতে পারেননি।



বিড়ির জন্য নৌকা যাজে বুড়িরহাটে

স্থানীয় কৃষক হাজি মোসলেম খান, নাজির মুধা, জবেদালী মাদবর, সুবলকুমার দাস জানান, বর্ষাকালে তাঁদের বাড়ির চারদিক পানিতে তলিয়ে যায়। তখন কোষা ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া যায় না। হাট-বাজার করা, ধান-পাট কাটা, গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ করা, মাছধরা, ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোসহ অনেক কাজই তারা কোষার সাহায্যে করে থাকেন।

বুড়িরহাট বাজার কমিটির কর্মকর্তা ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মজিবুর রহমান খোকন জানান, প্রতি মঙ্গলবার বুড়িরহাট বাজারে ২শ' থেকে আড়াইশ' কোষা বিক্রি হয়। বছরের ৩ মাস এভাবে বুড়িরহাটে নৌকা বেচাকেনা ধূম পড়ে যায়। দূর-দূরাঞ্জ থেকেও ক্রেতারা আসে বুড়িরহাটে। তিনি আরো জানান, ত্রিটিশ আমল থেকে এই বাজারে কোষা নৌকা বেচাকেনা শুরু হয়। এক সময় চাদপুর, বরিশাল ও ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাইকাররা কোষা কিনতে বুড়িরহাটে আসতেন। এখন বিভিন্ন অঞ্চলে পানি কমে যাওয়ায় এবং ভালো কাঠ পাওয়া যায় না বলে কোষা বানানো অনেক কমে গেছে। তবুও বুড়িরহাটে প্রত্যেক মৌসুমেই কোষা উঠে অন্যান্য এলাকার দেয়ে অনেক বেশি। তাই বুড়িরহাট এখনো কোষা নৌকার হাট বলেই অধিক পরিচিত।



বুড়িরহাটে নৌকারহাট

কোষা নির্মাতারা জানান, জারুল, গোয়ারা, পউয়া ও উড়িয়া আম গাছের কাঠ কোষা তৈরির সবচেয়ে উপযোগী কাঠ। কিন্তু বর্তমানে এসব গাছ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে রেইনটি, কড়াই, চামুল ইত্যাদি গাছের কাঠ দিয়েই বেশি কোষা তৈরি করা হয়।

চন্দনকর গ্রামের কাঠমিঞ্চি সুশাস্ত মণ্ডল (৬৫) জানান, তারা জৈজ্য মাসের শুরু থেকেই কোষা তৈরির কাজ করেন। জারুল, গোয়ারা, পউয়া বা উড়িয়া আম কাঠের একেকটি কোষা তৈরি করতে সময় লাগে ২/৩ দিন। বিক্রি করা যায় ৭/৮ হাজার টাকা করে। প্রতি মঙ্গলবার বুড়িরহাটে এসব বিক্রি হয়।

ডুবিসায়বর গ্রামের আবদুল হাকিম (৬৮) ও সোহেল মির্যা (৩৫) দুইজনে মিলে কোষা নৌকা তৈরে করেন। তারা জানান, ভালো কাঠ না খাকায় তারা করই ও চামুল কাঠ দিয়েই নৌকা বানাচ্ছেন। একটি কোষার জন্য ৭০০ টাকা মজুরি পাওয়া যায়।

স্থানীয় ব্যক্তি হাবিবুর রহমান (৮০) জানান, জেলায় রাস্তাঘাট বৰ্দ্ধি পাওয়ায় এবং পানি কম হওয়ায় কোষা নৌকার নির্মাণ ও ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে। তবে বুড়িরহাট এখনো পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। বর্ষা মৌসুমে এখানে নৌকার বাজার জমে ওঠে। তাই বুড়িরহাটকে যানুষ এখনো কোষা নৌকার হাট হিসেবেই চেনে।

**নির্মাণ প্রক্রিয়া:** কাঠ ছিঁড়ে তক্তা বানিয়ো বিশেষ উপায়ে একটির সঙ্গে আরেকটি জোড়া দিয়ে থাকে। এই জোড়া দেওয়ার সময় তারা এক ধরনের ক্রিপ ব্যবহার করে থাকে। ক্রিপগুলো দিয়ে একের পর এক কাঠের তক্তা জুড়ে তৈরি করা হয় নৌকা। নৌকার চার পাশে ভালভাবে আলকাতরা গরম করে, তরল করে মেঝে দিয়ে ছেট ছেট কাঠের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়া হয়। ক'দিন ভালোভাবে রোদে শুকানো পর নৌকাটি প্রস্তুত হয়ে যায় ব্যবহারের জন্য।

**নির্মাণ প্রযুক্তি:** নৌশিল্লীরা নৌকা তৈরি করার সময় কাঠের তক্কাকে বাকানোর জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। একে বলা হয় বাইন দেওয়া। বাইন দেওয়ার জন্য কাঠের তক্কাকে হালকাভাবে আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয় তারপর কাঠের তক্কার মাঝ বরাবর লোহার শিক দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে গেঁথে কাঠের তক্কাটির দুই প্রান্তকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানা দেয়া হয়। এভাবে কয়েকদিন রেখে দেয়ার পর কাঠের তক্কাটি বাঁকা হয়ে যায় এবং নৌকা তৈরিতে এটি ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে পড়ে। কাঠের তক্কা জোড়া দেওয়ার পরও দেখা যায় কাঠের গায়ের ফাঁকে অনেক ছিদ্র থাকে যা বিশেষ কৌশলের সাহায্যে কারিগরেরা আলকাতরা দিয়ে বন্ধ করে দেয়।

**ব্যবহৃত হাতিয়ার:** কাঠের আসবাৰপত্র তৈরি কাজে যে সকল হাতিয়ার প্রয়োজন হয় তার প্রায় সবগুলোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে নৌকা তৈরিতে। হাতুড়ি, বাটাল, কুড়াত, রাঁদা, ক্লিপ, প্রাসসহ যাবতীয় হাতিয়ার।

**নৌকা তৈরির কাঠ :** নৌকা তৈরির উৎকৃষ্ট কাঠ হলো জারুল এবং শাম কাঠ।

## ৮. কাঁসা-পিতল শিল্প

শরীয়তপুর জেলার বিশেষ করে সদর উপজেলার পালং, বিলাসখান, বাঘিয়া, দাসার্তা কাঁসা-পিতলের কারিগর ছিল বেশি। এক সময় ৫ শতাধিক পরিবারে ২ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করলেও এখন ৭/৮টি পরিবারে ২০/২৫ জন শিল্পী এ-শিল্প ধরে রেখেছে। এ-শিল্পের প্রকৃত কারিগর দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছে। যাঁরা এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁরা জাতশিল্পী নন, কোনো রকমে কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছেন।<sup>৫</sup>

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে কাঁসা-পিতল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কংসবণিক সম্প্রদায় ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের হৃগলির চন্দননগর এসে বসতি গড়ে। সেখান থেকে একটা অংশ বাংলাদেশের বিক্রমপুরের লৌহজং গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। পশ্চানন্দীর ভাঙনের ফলে লৌহজং থেকে কংসবণিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ অংশ দক্ষিণপুরের অর্থাৎ বর্তমান শরীয়তপুরের দাসার্তা, বাঘিয়া, পালং, বিলাসখান, কাঁসাভোগ, মধ্যপাড়া, আংগারিয়া ও কোটাপাড়া গ্রামে এসে পুনরায় বসতি গড়ে কারখানা স্থাপন করে। পালং ছাড়াও জেলার অন্যান্য উপজেলায় বসতি গড়লেও সংখ্যায় তা কম। তবে পালং বাজারটাই ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে।

বাঘিয়া, দাসার্তা, বিলাসখান ও পালং গ্রামের বাড়িতে কারখানা গড়ে উঠলেও এসব পণ্যের ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে ওঠে পালংবাজার। কাঁসা-পিতলের ও সৌন্দর্যের কারণে এ-শিল্পের এতটাই প্রসার লাভ করে যে, বাংলাদেশের মধ্যে পালং হয়ে ওঠে কাঁসা-পিতল শিল্পের প্রধান উৎপাদন ও ব্যবসাকেন্দ্র। এখান থেকে দেশের প্রধান বিভাগীয় শহর এবং বিভাগীয় শহর থেকে বিদেশে রপ্তানি হওয়া শুরু হয়। হিন্দুদের কংসবণিক সম্প্রদায়ের জাতপেশা হলেও এর সঙ্গে এখন মুসলিম শ্রমিকরাও যুক্ত হয়েছে।

২০/৩০ বছর আগেও এ-শিল্পের সঙ্গে ৪ শতাধিক পরিবার যুক্ত ছিল। এখানে কাঁসা-পিতল শিল্পের প্রায় ২ থেকে ৩ শতাধিক কারখানা গড়ে উঠেছিল। পর্যায়ক্রমে

মুসলমানরা এ-শিল্পে শ্রম দিতে দিতে কারিগর হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক কারণে ও নানান অনিচ্ছ্যতায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হিন্দুরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে থাকলে মুসলমান কারিগররা আস্তে আস্তে কারখানা স্থাপন করে শিল্পটা ধরে রাখে। বর্তমানে জেলায় ৭/৮টি পরিবার এ-শিল্পকে ধরে রেখেছে। একসময় শুধু পালং বাজারেই ৪০টি কাঁসা-পিতল সামগ্রী বিক্রির দোকান থাকলেও এখন মাত্র ৪টি দোকান আছে।



কাঁসা-পিতলের সামগ্রী

এ-জেলায় মালা, কলসি, জগ, বালতি, বদনা, চামচ, পানদান, ডাবর, জলের গ্লাস, মগ, ধান-চাল পরিমাপের পুড়, কুপি, বিভিন্ন প্রকার প্রদীপ, পাতিল, ঘাস্টি, বিন্দাবনী, চারা, কড়াই, ধূপদানী, ছেট ঘটি (পূজার জন্য), মালসা, কোসা-কুসি, পুষ্পপত্র, করাতথাল, বাস বেড়া, বগি থাল, পঞ্চপত্র এবং নিত্যব্যবহার্য ও নানান দর্শনীয় সামগ্রী তৈরি করা হয়। এর অনেক সামগ্রীর চাহিদা কমে গেছে।

একসময় কাঁসা-পিতল সামগ্রী তৈরির কাঁচামাল ‘পাত’ কেজি ছিল ৮০ টাকা। আর এখন প্রতি কেজি পাতের দাম ৩০০ টাকা। বাজারে প্লাস্টিক, সিরামিক, মেলামাইন, সিলভার, এমনকি লোহার তৈরি পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর সহজলভ্যতা, কম মূল্যের কারণে এবং কাঁসা-পিতলে তৈরি সামগ্রীর অধিক মূল্যের কারণে মানুষ কাঁসা-পিতলের সামগ্রী ব্যবহারে অনীহ দেখায়। ফলে শিল্পীরা তাদের উৎপাদনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কাঁসা-পিতলের ধাতব মূল্য, স্থায়িত্ব বিবেচনা না করেই সহজলভ্য সামগ্রী ব্যবহারের কারণে এ-শিল্প বিলুপ্তপ্রায়। কাঁসা-পিতলের তৈরি সামগ্রীর বিকল্প হিসেবে আলুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, সিরামিক, মেলামাইন, লোহার সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে।

এক সময় আচার-অনুষ্ঠানে উপহার দিতে বা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করতে মানুষের প্রধান ও প্রথম পছন্দের তালিকায় ছিল কাঁসা-পিতল সামগ্রী। কাঁসা-পিতল

সামগ্রী ছিল অভিজাত্যের প্রকাশও। এখন একান্ত ব্যবহার্য কিছু সামগ্রী যেমন বালতি, কলস, পানদান ছাড়া আর কোনো সামগ্রীর চাহিদা নেই।

বর্তমানে ৭/৮ পরিবার এ-শিল্পকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রেখেছে। ৭/৮ টি পরিবারের মধ্যে হিন্দু পরিবারের সংখ্যা নেই বললেই চলে। পূর্বে যারা এ-শিল্পে শ্রম দিতেন তারাই মূলত এ-শিল্পকে ধরে রেখেছে। নতুন প্রজন্মের কেউ এই শিল্পে শ্রম দেয় না। ফলে এই ৭/৮ পরিবার বিলুপ্ত হলে বা পেশা ছেড়ে দিলে এই শিল্পের সংকট নেমে আসতে পারে। নতুন প্রজন্ম এই শিল্পের হাল ধরলে হয়তো আবার এই শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটতে পারে।

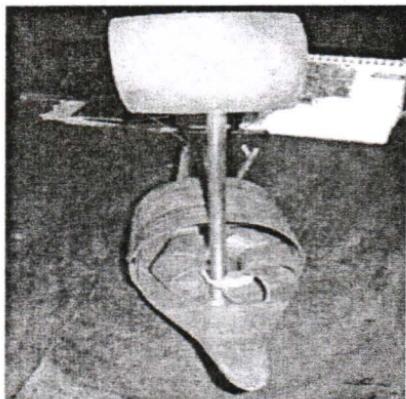
দাসার্তার শিবের বাড়ির ১০টি পরিবার এ-কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে একটি মাত্র পরিবার কাজ করে। রাষ্ট্রিকুমার কংসবণিক, শ্রীদাম কংসবণিক, বাসুদেব কংসবণিক ও শ্যামসুন্দর কংসবণিক এ-চার ভাই এখনও এ-শিল্পকে ধরে রেখেছেন। রাষ্ট্রিকুমার কংসবণিক বলেন, ভোর রাত থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কাজ হতো। হাতুড়ি-পিতলের এতই সম্পর্ক ছিল যে টুং-টাং শব্দ সাধারণ মানুষের কাছে কানে তালা লাগার মত মনে হলেও আমাদের কাছে এটা গানের মতো। এখন আর এ-শব্দ শোনা যায় না।<sup>১</sup>

কাঁসা-পিতলের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম বেপারী বলেন, ছোট বেলায় এ-শিল্পের চাহিদা এতই বেশি ছিল যে বাবা অন্য কাজে না দিয়ে কাঁসা-পিতলের কাজে দিলেন। এ-কাজ শিখেছি এখনতো আর অন্য কাজ পারি না। তাই ধরে রেখেছি। বর্তমান অবস্থা এতটাই খারাপ যে, আগে এখানকার আফিদ ট্রেড ইন্টারন্যাশনালে প্রতি সপ্তাহে ২ থেকে ৩ টন কাঁচামাল বিক্রি হতো আর এখন ১ টন মাল ১ মাসেও শেষ হয় না। এতেই বোবেন অবস্থাটা কী!<sup>২</sup>

জেলার পিতল শিল্পের কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠানের পথিকৃৎ শরীয়তপুর ব্রাস ইভাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজু নুর মোহাম্মদ কোতোয়াল। বর্তমানে উৎপাদন ও সরবরাহকারী আফিদ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাদিকুর রহমান কোতোয়াল লিটন বলেন, কাঁচামালের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি, কাঁচামাল ভারতে পাচার হয়ে যাওয়া এবং শিল্পীরা ভারতে চলে যাওয়ায় মিলটি বক্ষপ্রায়। ১৯৮৭ সালেও এখানে কাঁচামালের চাহিদা এত বেশি ছিল যে এখানে কারখানা স্থাপন করতে আগ্রহী হয়েছিলাম। মাত্র ১৫/১৬ বছরের ব্যবধানে দেখা গেল চাহিদা শূন্যের কোঠায়। শিল্প ও শিল্পী উভয়ই বিলুপ্তপ্রায়।<sup>৩</sup>

বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক অধ্যাপক এম এ-আজিজ মিয়া বলেন, শুধু জেলারই নয়, এই জেলা দেশের অন্যতম কাঁসা-পিতল শিল্পের উৎপাদক। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে পর্যায়কর্মে এই শিল্পের কারিগররা দেশ ছাড়ে। পিতলের স্থায়িভাৱে অনেক বেশি, সংরক্ষণে সুবিধা, পুরাতন হলেও এর দাম কমে না এবং পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্ভত। এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের উচিত কাঁসা-পিতলের সামগ্রী ব্যবহার করা।<sup>৪</sup>

সকাল থেকে শুরু করে কারিগররা কাজ শুরু করে রাত ১২-২টা পর্যন্ত কাজ করত । এসব এলাকার উৎপাদিত সামগ্রী দেশের বিভিন্ন শহরে ও হাট-বাজারে পাইকারী ও খুচরা বিক্রি করা হতো । দেশের দূর-দূরান্ত থেকে পাইকারীরা এসে অগ্রিম টাকা দিয়ে মাল কিনে নিত । আর মহাজনেরা মাল তৈরির শেষে নৌকা বোঝাই করে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এসব পণ্য পৌছে দিয়ে উপর্যুক্ত করত বহু অর্থ । বিশেষ করে শরীয়তপুর জেলার তৈরি কাঁসা-পিতলের সামগ্রী বিক্রি হতো বাইরে । ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, মিয়ানমারসহ খুলনা ও চট্টগ্রাম থেকে শত শত সওদাগরী নৌকা এসে রাজগঞ্জ, কোটাপাড়া, ভোজগ্রাম ও আংগুরিয়া নদীর তীরে নোঙর করে থাকত কাঁসা-পিতলসামগ্রী পাইকারী ক্রয় করে নিয়ে যাওয়ার জন্য । নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন শহর ও হাটবাজারে যেত শরীয়তপুরের কাঁসা-পিতলের সামগ্রী । কাঁসা-পিতলের কলসের চাহিদা ও ছিল প্রচুর । ফলে এক মহাজনের আওতায় ৩০-৪০ জন কারিগর কাজ করতেন । সে সময় কাজের মজুরিও ভালো ছিল ।



পিতলের নৌকা



পিতলের জলের কলস

ঝাঁঁড়া বর্তমানে পূর্বের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে ও অনেকে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিচ্ছেন একাজ । একজন ব্যবসায়ী জানান, এখন আর আগের মতো কাঁসা-পিতলের ব্যবসা নেই, চাহিদাও নেই । তখনকার দিনে নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে কাঁসা-পিতল ব্যবহার করত । আর এখন কেনে সবের বসে । তাছাড়া বর্তমানে কাঁচা মালেরও সংকট, চওড়া দাম দিয়ে এসব কাঁচা মাল সংগ্রহ করে মাল তৈরি করতে হয় । ফলে দাম পড়ে যায় বেশি । একারণে অনেকেই কিনতে পারে না । এসব জিনিসের পরিবর্তে তারা স্টিল ও প্রাস্টিক সামগ্রী কিনে থাকে । তারপরও কিছু কিছু মানুষ সবের বসে এসব সামগ্রী কিনে থাকে । তাই আমরা এ-ব্যবসা করে খুবই কষ্টে আছি ।<sup>১</sup> কোটাপাড়া গ্রামের দিলীপকুমার বলেন একাজ করে এখন আর পোশায় না । সারা দিন কাজ করে ২৫০/৩০০ রোজগার করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেয়ে পড়ে ঘেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর । কোনো কাজ থাকলে কাঁসা-পিতলের কাজ করতাম না । কাজ নেই বলে একাজ করি ।<sup>২</sup>

দাসার্তা গ্রামের দরিদ্র ইয়াছমিন বেগম বলেন, তিনি কন্যা সন্তান নিয়ে সারা দিন কাজ করে যা পাই তা দিয়ে কোন রকম খেয়ে পড়ে বেঁচে আছি। কাজের তুলনায় মজুরি পাই না। তাছাড়া আগের যত এখন কাজ ও কম। পালং গ্রামের দেলোয়ার হোসেন বলেন ২০ বছর যাবৎ একজন করি। কিন্তু সংসারে অভাব আর কমহে না। খেয়ে পড়ে থাকাই কষ্ট। তার পরও কোন কাজ না থাকায় এ-কাজ করি। তাছাড়া ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে কোন লোন দেয় না, আর আমাদের পুজি ও নেই, যেন বড় কোন ব্যবসা করব। তাই পুরনো ঐতিহ্য ধরে রেখেছি। ভাল কোন কাজ পেলে একাজ ছেড়ে দিতাম।<sup>১৩</sup>



পিতলের কারিগর

শরীয়তপুরে ১৫টি শিল্পকারখানা বাদে বাকি সবই বন্ধ হয়ে গেছে। কাঁসা-পিতলের কঁচামাল থেকে শিট তৈরির একমাত্র কারখানাটিও বন্ধ হওয়ার পথে। এই অঞ্চলে বিয়েসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কাঁসা-পিতলের সামগ্রী উপহার দেওয়ার প্রচলন ছিল দীর্ঘ-কাল ধরে। দরিদ্র পরিবার হলেও কনের বিয়ের সময় বরের বাড়িতে পাঠানো হতো একটি পিতলের কলস, পানদানি-বাটা ও বদনা। একসময় স্কুলের ক্লাস শুরু ও ছুটির সময় পিতলের ঘটা বাজানো হতো। এখন সেখানে স্থান করে নিয়েছে লোহার ঘটা। আর বর-কনেকে কাঁসা-পিতলের সামগ্রী উপহার দেওয়ার প্রচলনও বন্ধ হয়ে গেছে। উৎপাদন খরচের সঙ্গে বিক্রির ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় এ-শিল্পের বিপর্যয় হতে হতে বিলুপ্তির দ্বারপ্রাণ্তে এসে পৌছেছে।<sup>১৪</sup>

## ৯. স্বর্ণশিল্প

দক্ষিণ বিক্রমপুর ও ইদিলপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত শরীয়তপুর জেলার স্বর্ণশিল্পীদের রাকমারি স্বর্ণশিল্পকার তৈরি বা গড়ন এ-এলাকার নারী-পুরুষদের অলংকার পরিধান বা ব্যবহারের চাহিদা অন্বরত মিটিয়ে চলছে। যুগের চাহিদা পূরণ করার ক্ষেত্রে নিয়া নতুন ডিজাইনের অলংকার গড়নে শৈলিক দক্ষতা এ-অঞ্চলের স্বর্ণশিল্পীদের কোন অংশে কমতি নেই। কেউ কেউ পুরুষানুগ্রহে এ-শিল্পকর্ম পেশায় ছোট বেলা থেকেই জড়িয়ে আসছে।

এক সময়ে এ-পেশাজীবীদের দৈন্যদশা থাকলেও বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন ও জ্যোক্ষণ খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বর্ণব্যবসা এখন তুলনামূলকভাবে লাভজনক পর্যায়ে উঠে এসেছে। ফলে অন্যান্য পেশাজীবীদের সঙ্গানৱা ও এ-পেশায় ঝুঁকে পড়ছে। স্বর্ণবিগিক, পোদ্দার, কর্মকার (সোনার কর্মকার) পদবীধরী হিন্দু সম্প্রদায়ই যে এ-শিল্পকর্মের অধিকারী, তা আর নেই। বৎসর পদবীর সীমা অতিক্রম করে তা এখন সর্বজনীন শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল পদবীরই লোকজন শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে কারিগর (শিল্পী) ও স্বর্ণব্যবসায়ী হতে পারছে। ফলে সমষ্টিগতভাবে এখন এ-পেশাজীবীরা ‘স্বর্ণশিল্পী’ মর্যাদায় উপনীত হয়েছে। এ-অঞ্চলের স্বর্ণশিল্পীরা রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এমনকি বিদেশে যেয়েও যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে ও অনেক সুনাম অর্জন করেছে। এ-এলাকার প্রায় সকল স্বর্ণশিল্পীর (প্রয়াত বা জীবিত) নামের তালিকা উপজেলাভিত্তিক উপস্থাপন করা হলো।

**সদর উপজেলা (পালং):** পালং বাজার<sup>১৪</sup>: সুনীল সূত্রধর, অধিল সূত্রধর, বাদল সূত্রধর, গৌরাঙ্গচন্দ্র ভক্ত (সূত্রধর) ও তাঁর ছেলে। অম্বল্য সূত্রধর এবং এঁর ছেলে। শ্রীকৃষ্ণ সূত্রধর, সমীর পাল, কানুলাল পোদ্দার। মানিক কর্মকার, পিতা সুবল কর্মকার (ধূপ, লোহার কাজ)। কাঞ্চন পোদ্দার, পিতা শাস্তিরঞ্জন পোদ্দার। বাবলু পোদ্দার, পিতা কৃষ্ণপদ পোদ্দার। সুজন পাল, বিমল মণ্ডল, নেপাল পোদ্দার, কুবেল হাওলাদার। জসিম হাওলাদার, পিতা সোনাই হাওলাদার (কৃষক)। বিশ্বনাথ পোদ্দার, গৌরাঙ্গচন্দ্র পোদ্দার, পিতা রাধেশ্যাম পোদ্দার। মৃদুল রায় (সূত্রধর), এর ছেলে শিমুল রায়। কাজল রায় (সূত্রধর), তপন দাস, সুকুমার সূত্রধর, মুকুলচন্দ্র রায় এবং এঁর ছেলে। কানুলাল রায় (সূত্রধর), পিতা কিশোরী মোহন সূত্রধর। সজল সূত্রধর, সঞ্জয় সূত্রধর, পিতা শংকর সূত্রধর। সুধীরচন্দ্র ধর (সূত্রধর) এবং এঁর ছেলে। পক্ষজ দস্ত, বিশ্বনাথ দস্ত, পিত সত্ত্বোষচন্দ্র দস্ত (শংখশিল্পী)। হরিসাধন পোদ্দার, অনিলচন্দ্র পোদ্দার, পিতা ঘৃত ঘোহী মোহন পোদ্দার। চম্পক সূত্রধর, অভিমন্যু সূত্রধর, পিতা ঘৃত রাখালচন্দ্র সূত্রধর। সতীশচন্দ্র সূত্রধর, ঘোগেশচন্দ্র সূত্রধর, সুবলচন্দ্র সূত্রধর, মথুরা মোহন সূত্রধর, শম্ভুনাথ দেবনাথ (চন্দ্রপুর), হারানচন্দ্র দেবনাথ (চন্দ্রপুর) ও বিকাশচন্দ্র দেবনাথ (চন্দ্রপুর)। আঙারিয়া বাজার:<sup>১৫</sup> শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ এবং এর ছেলে দীর্ঘক দেবনাথ। অনিলচন্দ্র দেবনাথ, রামকৃষ্ণ দেবনাথ, রাধেশ্যাম মণ্ডল, পরীক্ষিত দেবনাথ (প্রয়াত), দুলালচন্দ্র দেবনাথ, খোকন কর্মকার, অনিলচন্দ্র কর্মকার (প্রয়াত), পলিট কর্মকার, বাসুদেব কর্মকার, সলিট কর্মকার, উত্তম কর্মকার, কানাইলাল দেবনাথ (প্রয়াত)।

গৌতম কর্মকার, নন্দগোপাল কর্মকার, গৌতম কর্মকার, নন্দ গোপাল কর্মকার, অরুণ কর্মকার, গোবিন্দ কর্মকার, মানিক কর্মকার, বাবুলাল কর্মকার, আশুতোষ কর্মকার, বাবুলাল কর্মকার। বুড়িরহাট:<sup>১৭</sup> মাধবচন্দ্র কর্মকার (প্রয়াত), রবিন কর্মকার, লক্ষণ কীর্তনীয়া, তাপস কর্মকার। ডোমসার বাজার: শ্রীহরি পাল, পিতা যামিনী পাল (মৃৎশঙ্খী)। সুভাষ পোদ্দার, পিতা রতন পোদ্দার, পিতা কানাই পোদ্দার।



সোনার মোকানির সঙ্গে কথা বলছেন শ্যামসুন্দর দেবনাথ

**উপজেলা জাজিরা:** জাজিরা বাজার:<sup>১৮</sup> প্রফুল্লচন্দ্র মণ্ডল এবং এর পুত্র প্রদীপচন্দ্র মণ্ডল। রতনকুমার মণ্ডল, পিতা নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল। খোকন দেবনাথ, দিলীপচন্দ্র মণ্ডল। মন্টুচন্দ্র মণ্ডল পিতা নারায়ণ মণ্ডল। তিমির ঘোষ, পিতা সুবলচন্দ্র ঘোষ।

**উপজেলা ডামুড়া:** ডামুড়া বাজার:<sup>১৯</sup> মিশর পাল, প্রাণকৃষ্ণ মালো, নিপুল সূত্রধর, নিরঞ্জন সূত্রধর, বিশ্বজিত সূত্রধর।

**উপজেলা নড়িরা:** নড়িয়া বাজার:<sup>২০</sup> মুকুলচন্দ্র বণিক, সহদেব পাল। চাকদহ বাজার: পর্বত কর্মকার (মণ্ডল)। ঘড়িসার:<sup>২১</sup> চন্দ্রমোহন সেন, রাজকুমার দত্ত, মেপালচন্দ্র দত্ত, কালীমোহন সেন, মহাদেব সেন, শংকর সেন, জীবনকৃষ্ণ নন্দী (জীবা), শান্ত মণ্ডল, সনাতন সেন, ছোটবন সেন এবং এর ছেলে নীলা সেন, গোপালচন্দ্র ওঝা, কমলচন্দ্র পাল, গৌরাঙ্গচন্দ্র পাল, শামিম, মিন্টু, অনুকূল দাস, যুগল পাল, সত্যরঞ্জন দত্ত, গোপালচন্দ্র পাল, অর্জন পাল, শৈলেন সেন, ভোজেশ্বর বাজার:<sup>২২</sup>

দিলীপ কর্মকার, শান্তিরঞ্জন কর্মকার, সুধীরচন্দ্র ঘোষ, অধীরচন্দ্র ঘোষ, নিতাই ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ কর্মকার, গান্ধীলাল কর্মকার, মুকুল কর্মকার।

**উপজেলা ডেরগঞ্জ:** ভেদরগঞ্জ বাজার: ২৩ উত্তমকুমার দত্ত, বিমলকৃষ্ণ দাস, অমৃতলাল মালো, অমিতকুমার মালো, সুদেব মালো, কমলকৃষ্ণ মণ্ডল, ফজলু হাওলাদার, লিটন হাওলাদার, সতীশচন্দ্র মণ্ডল।

**উপজেলা গোসাইরহাট:** গোসাইরহাট বন্দর: ৪৪ সুমন পোদ্দার, রাধেশ্যাম কর্মকার (প্রয়াত), দীপৎকর পাল, সুজন ঘোষ, সজল মালো, রাজীব সিকদার, রামপ্রসাদ মালো, মিঠুন মালো, গণেশ মালো, উজ্জ্বল মণ্ডল, সজীব মালো সিকদার, কাজল দাস, মাসুদ সিকদার, নোমান মাবি, আনন্দ, দুলাল, সাইফুল রহমান, জুলহাস, সনাতন মালো, সুভাষচন্দ্র সাহা, রাজ্জাক বেপারী, আক্তার হোসেন পাইক, নুর টেইলর, বিপুব সাহা, শামিম সিকদার, বিলাল হোসেন ঝাঁ, এমরান খান, শামিম খান, আরিফ ঘরামি, জাকির হোসেন, খায়ের সিকদার প্রযুক্তি।

## তথ্যনির্দেশ

- ১ তথ্যদাতা, কাজী নজরুল ইসলাম, দৈনিক সমকাল পত্রিকার আঞ্চলিক প্রতিনিধি, শরীয়তপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০১২
- ২ তথ্যদাতা, এসএম মুজিবুর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি, শরীয়তপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০১২
- ৩ তথ্যদাতা, আবুল হোসেন সরদার, দৈনিক সকালের খবর পত্রিকা ও আরটিভি-র স্থানীয় প্রতিনিধি, শরীয়তপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০১২
- ৪ তথ্যদাতা, কেএম মকবুল হোসেন, দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি, শরীয়তপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০১২
- ৫ তথ্যদাতা, কাজী নজরুল ইসলাম, দৈনিক সমকাল পত্রিকার আঞ্চলিক প্রতিনিধি, শরীয়তপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০১২
- ৬ তথ্যদাতা, আসাদুজ্জামান জুয়েল, আইনজীবী ও দৈনিক কালের কঠের প্রাক্তন জেলা প্রতিনিধি, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ৭ তথ্যদাতা, রঞ্জিতকুমার কংসবণিক, কাঁসা-পিতলের কারিগর, দাসার্তা, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ৮ তথ্যদাতা, আবুল কাশেম বেপারী, কাঁসা-পিতলের ব্যবসায়ী, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ৯ তথ্যদাতা, মোঃ সাদিকুর রহমান কোতোয়াল লিটন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মের্সার্স অফিস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ১০ তথ্যদাতা, অধ্যাপক এমএ আজিজ মিয়া, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ১১ তথ্যদাতা, রিয়াজ চৌকিদার, কাঁসা-পিতলের ব্যবসায়ী, পালং বাজার, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ১২ তথ্যদাতা, দিলীপ কুমার, কোটাপাড়া, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ১৩ তথ্যদাতা, আবুল হোসেন সরদার, দৈনিক কালের খবর ও আরটিভি-র স্থানীয় প্রতিনিধি, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২

- ১৮ তথ্যদাতা, রফিকুল ইসলাম, বাঘিয়া, শরীয়তপুর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
- ১৯ তথ্যদাতা: মানিক কর্মকার ও কাছেন কর্মকার, পালং বাজার, শরীয়তপুর, ও দেবপ্রসাদ সাহা, শিক্ষক, তোমসার জগচ্ছন্দ ইনসিটিউশন, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২০ তথ্যদাতা: দীপক দেবনাথ ও বাসুদেব কর্মকার, আঙ্গরিয়া বাজার, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২১ তথ্যদাতা: বিশ্বনাথ বসু ও রবিন কর্মকার, বুড়িরহাট বাজার, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২২ তথ্যদাতা: ডা. প্রফুল্লকুমার কবিরাজ, জাজিরা বাজার, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২৩ তথ্যদাতা: সুনীলচন্দ্ৰ দে, সভাপতি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ডামুড়া, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২৪ তথ্যদাতা: রতনকুমার দে, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, নড়িয়া, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২৫ তথ্যদাতা: অসিতকুমার বৰ্মণ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, পঞ্জিতসার উচ্চবিদ্যালয়, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২৬ তথ্যদাতা: জীবনকৃষ্ণ সাহা, ঘড়িসার বাজার, নড়িয়া, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২৭ তথ্যদাতা: সুনীলচন্দ্ৰ রায়, সিনিয়র শিক্ষক, মহিসার দিগন্বরী উচ্চবিদ্যালয়, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২
- ২৮ তথ্যদাতা: সুশান্তকুমার ভাওয়াল, সিনিয়র শিক্ষক, সামন্তসার উচ্চবিদ্যালয়, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২

## লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

সাধারণত শরীয়তপুর জেলায় পোশাক-পরিচ্ছদের মাঝে বিশেষ কোনো স্বতন্ত্র নেই। একসময় এ-এলাকার পুরুষেরা সবাই ধূতি, পাঞ্জাবি কিংবা কুরতা পরত। এখন আর মুসলিমরা ধূতি পরে না। হিন্দুদের মধ্যে ধূতি পরার প্রচলন থাকলেও এখন কেবল বয়স্ক হিন্দু পুরুষেরাই ধূতি পরে। নারীরা শাড়ি ব্রাউজ ও সায়া পরেন। মুসলিম নারীদের অনেকেই বোরখা পরেন। অস্তত বাড়ির বাইরে গেলে অনেক নারীকেই বোরখা পরে বেরতে দেখা যায়।

ফরায়েজি আন্দোলনের সময়ে শরীয়তুল্লাহর অনুসারীরা ধূতির কোচা ছেড়ে শরীরের চারদিকে বেড় দিয়ে পড়ত। লুঙ্গির মতো সেলাই করা থাকত না। শরীয়তুল্লাহ তাঁর অনুসারীদের ধূতির বদলে পাজামা ও লুঙ্গি পরিধানের নির্দেশ দেন। এটি হিন্দুদের থেকে আলাদা হওয়ার পাশাপাশি নামাজের সুবিধার কথাও বলা হয়েছে। ধূতি পরে সেজদা দিলে হাঁটু অনাবৃত হয়ে পড়ে, তাই লুঙ্গি বা পাজামা পরার প্রতি তিনি উৎসাহ দেন। সেই থেকে এই অঞ্চলে মুসলিম পুরুষেরা সাদা কাপড় পেঁচিয়ে পরত। তারপর একসময় সেলাই করে পরা শুরু করল এবং সাদার পরিবর্তে যে কোনো রঙের হতে থাকল এবং তারই পরিবর্তিত রূপ আজকের লুঙ্গি। তবে ধর্মীয় নেতা অর্থাৎ মাওলানা বা হজুরদের মধ্যে লুঙ্গির মতো করে সাদা কাপড় পরতে দেখা যায়। কেউ কেউ পাগড়িও পরেন।

এখন পুরুষেরা লুঙ্গি, পাজামা-পাঞ্জাবি, ফতুয়া, প্যান্ট-শার্ট, টিশার্ট, গেঞ্জি-প্যান্ট আর মেয়েরা শাড়ি, ব্রাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার, কামিজ পরে। প্রায় সবাই জুতা-স্যাঙ্গেল পায়ে দেয়। মুসলমান পুরুষেরা মাথায় টুপি দেয়। কেউ কেউ পাগড়িও পরিধান করে। সকল পরিবারই প্রায় গামছা, তোয়ালে, কুমাল ব্যবহার করে।<sup>1</sup>

সাধারণত মুসলিমরা বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানে কিছু বিশেষ পোশাক পরিধান করে থাকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন ধর্মীয় উৎসবগুলোতে পাজামা-পাঞ্জাবি-টুপি পরিধান করে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলোতে ধূতি ও পাঞ্জাবি পরিধান করে থাকে। পহেলা বৈশাখ, পৌষমেলা প্রভৃতি সর্বজনীন উৎসবে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে লোকজন পাজামা-পাঞ্জাবি, মেয়েরা শাড়ি পরিধান করে। অনুষ্ঠান ছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদের তেমন কোনো বৈচিত্র্য থাকে না।

**অঙ্গশোভা:** হিন্দু ধর্মের নারীরা বিবাহের পর সিথিতে সিদুর আর কপালে সিদুরের ফেঁটা পরে। আর দুহাতে শাঁখা পরে। এটি ধর্মীয় রীতি। সিথি বা সীমান্তেরখায় সিদুর পরা এবং শাঁখা পরা বিবাহিত হিন্দু নারীর প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতীয় ভিথিতে ভাইফেঁটার সময় ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় বোন ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফেঁটা দেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তিলকের ফেঁটা বা যজ্ঞের কাজল মাথে। বিশেষ দিনে মেয়েশিশ্ব ও কিশোরীরা কপালে টিপ পরে।<sup>2</sup>

সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণির মহিলা সাধ্যমতো অলংকার পরে। আর্থিক সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে সোনার গয়না, রূপার গয়না, নকল গয়না ও কাচের চুড়ি ব্যবহার করে। এই এলাকার মহিলারা অনেক আগে থেকেই নাকের নথ, নোলক, কানের দুল, কড়িয়া, ঝুমকা, কানবালা, মাকড়ি, গলায় হাঁসুলি, কবচ, ফুতি, হাতে বাউটি, বয়লা, চুড়ি, বাজু, শাখা, কোমরের হার, বিছা, পায়ের খাড়ু নৃপুর ইত্যাদি ব্যবহার করে। বিয়েশাদি বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মহিলারা সেজেগুজে বের হন।<sup>১</sup>

মুসলিম সমাজে উৎসবের দিনে হাতে মেহেদির রঙ লাগানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। একে সুন্মত হিসেবে গণ্য করা হত। এখন হিন্দু-মুসলিম সকলেই মেহেদি পরে। তবে আগের মতো মেহেদি পাতা বেটে লাগানোর আয়োজন একেবারেই কমে গেছে। বাজারে মেহেদির রঙ কিনতে পাওয়া যায়। যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান, জন্মদিন, গায়ে হলুদ, বিবাহ, পূজা-পার্বণ, শবে বরাত, ঈদ, বিবাহবার্ষিকীতে মেহেদি ও নখপালিশের ব্যবহার হয়। মেয়েরা খৌপা বাঁধে। খৌপায় কেউ কেউ তাজা ফুলও গুঁজে রাখে।

### তথ্যনির্দেশ

১. **সংগ্রহসূত্র:** রীনা রানী দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাজিরা ডিপ্রি কলেজ, জাজিরা, শরীয়তপুর, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১১
২. **সংগ্রহসূত্র:** আবুল বাশার, জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক জনকষ্ট, শরীয়তপুর, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১
৩. **সংগ্রহসূত্র:** নজরুল ইসলাম পলাশ, জেলা প্রতিনিধি, একুশে টেলিভিশন, মাদারীপুর, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১

## লোকসংগীত

শরীয়তপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জারি, কীর্তন, মুর্শিদি, বাটল, সারিগান, মেয়েলিগীত, পল্লীগীতি, বিয়ের গান, সুরেশ্বরীগান, ভাবগান প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে। কয়েকটি গান এখানে তুলে ধরা হলো:

### ১. মুর্শিদি গান

অধ্যাত্ম সাধনার পথে যিনি এগিয়ে নিয়ে যান তাকেই মুর্শিদ বলে। মুর্শিদের উদ্দেশ্যে নিজের আর্তি প্রকাশই মুর্শিদি গানের বৈশিষ্ট্য। এই গান আত্মবিদ্বেদনের গান, সাধনার গান। ইসলামের সুফি ভাবধারার সঙ্গে পীর মুর্শিদের যোগ রয়েছে। সুফি মতবাদে মুর্শিদকে অতি উচ্চে হ্রান দেয়া হয়েছে। শরীয়তপুর অঞ্চলে পিরের মাজার এবং খানকাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদি গানের চর্চা গড়ে উঠেছে। তেমনি কয়েকটি মুর্শিদি গান নিম্নে দেওয়া হলো:

১

জুইলা মইলামরে আমি, ও আমি পুইড়া মইলামরে  
আরে কালার জুলস্ত আগুনে  
পদ্মার চরে ভুই রাখিলা ঘরে॥  
হয় ছাওয়ালে রাঁধিয়া বাড়িয়া খায় রে ।  
আমারে কিছু দেয় নারে,  
আরে দয়াল মুর্শিদ দমের বাড়ি  
যাইতে হবে আমার রে॥  
আমি কর্তিকপুরের ঠোড়ায় যাইয়া  
ভয় লাগিল অস্তরে  
আমার মুর্শিদের বাড়ি যাইতে  
কত বছর লাগে রে  
আমি যাইব মুর্শিদের চরণে  
আগুন জ্বালাইস না তুই  
আরে আমার পোড়া গায়ে রে॥

২

হারে দয়াল হায় রে হায়  
নিগুইনার গুণ করলি ক্যান আমারে ।  
সোনা দিবার চাইছিলা দয়ালরে

লইড়া পিতল দিয়া ভুলাও ক্যান আমারে ॥  
 ঝুপা দিবার চাইছিলা দয়ালরে  
 ও কাঁসা দিয়া ভুলাও ক্যান আমারে ।  
 হয়ে দয়াল হায়রে হায়  
 নিশ্চিন্নার গুণ করলি ক্যান আমারে ॥

৩

হায় রে দয়াল হায়রে হায়  
 কোন গুইনার গুণ করলি তুই আমারে  
 ফুলা ধানে বাতাস লাগলে  
 ধান হয়ে যায় চিটা ধান মনোরায় রে  
 অন্ধ বয়সে রোগ হইলে  
 লোক হয়ে হালকারে মন মনোরায় রে  
 ফুল বাঁশে খুন লাগিলে  
 বাঁশ হয়ে যায় হালকা মন মনোরায় রে ॥

৪

আকাশেতে উঠেরে চাঁদ সঙ্গে লয়ে তারা  
 দেহের ঘধ্যে রইছে তারা মেঘে রইছে ঘেরা ।  
 মিছা মায়া জুলেরে মন কেন ভুলিয়া রইছোরে  
 পড় নবির কলেমা লায়লাহা ইন্দ্রাআন্দ্রাহ  
 জান কেন ভুলিয়া রইলিরে  
 এক ত্রাস্তি দুই ত্রাস্তি চোখের মণি কাল  
 মিছারে তোর ভবে আইসা  
 কাঁদতে কাঁদতে, কাঁদতে জনম গেলরে ।  
 দয়াল ধন গেলরে ভক্তজন  
 ঘুমাইতে কাতর, ঘুম, ঘুম যাইও না ।  
 হারাব রাত্রি আমার মিছা ছায়ায় জুলেরে  
 দেল কেন ভুলিয়া রইলি রে  
 গর বন্দে বসত কর, শয়ে থাক খাটে  
 তোমার আমার দেখা হবে হাশরেরও মাঠে ।  
 পড় লায়লাহা ইন্দ্রাআন্দ্রাহ  
 পড় নবির কলেমা মন কেন ভুলিয়া রইলিরে ।

৫

আন্দ্রাহ নবি দিন খুবি দীনের পয়গম্বর  
 অসময়ে তোরে ও আন্দ্রাহ দীনের সমানদার ।  
 দমে আসে দমে বসে দমে করে বার

দম ছাড়িয়া যাও যদি দোহাই তোর আল্লাহর ।  
 তোর আল্লার দুইটি নাম কলপিনীর সাথি ।  
 হক লাইলাহা ইল্লালাহ দেলে জুলে বাতি ।

৬

আমি থাকব আকাশে, তুমি থাকবা পাতালে  
 হারে ধড় তোমার লাইগা কাঁদে আমার মন ।  
 একলা যাতে হবে কবরেতে  
 ভাই ব্রাদার ইষ্টিকুটম কেউ যাবে না সাথে ।  
 খাওয়ান্দার করিলা আমার সেও যাবে না সাথে  
 খালি হাতে যাইতে হবে কবরেতে ।  
 ধনজন কেউ যাবে না সাথে,  
 চারি ফেরেন্সা ক্রোধ করবে কবরের ভিতরে ।  
 ইনকুল মিলকুল শামকাম চারি ফেরেন্সা ।  
 ক্রোধ করবে কবরের ভিতর ।  
 দীন ইসলামেরই কি কাজ কইবেছ তুমিরে,  
 একে একে জবাব দাও আমারে ।

মাদারীপুর জেলার কান্দিরপুর ইউনিয়নের মানিকপুর গ্রামের এফ. গোলাম মুহাম্মদ  
 শিক্ষকতাসূত্রে জাজিরায় অবস্থান করেছেন । তিনি অজস্র মুশিদি গান রচনা করেছেন ।  
 শরীয়তপুরের সুরেশ্বরী পিরকে নিয়ে লেখা তাঁর দুটি গান এখানে তুলে ধরা হলো:

৭

দেখতে চাও যদি মাবুদ মাওলারে  
 তুমি খৌজ যাইয়া ওলির দরবারে  
 ওলি আল্লাহর শিক্ষা লইয়া দেখ তাহারে॥ ঐ

মাওলানা জান শরীফ শাহ ছিলেন সুরেশ্বরে  
 নূরের বাতি জ্বালাইয়া তিনি দিয়াছেন সর্বত্তরে  
 তাহারই নূরের শতাধিক বাতি জুলে সুরেশ্বরে॥ ঐ

স্রষ্টার রহস্যের নূর মানব-ভাগারে  
 মুশিদি ধরে জেনে লও নিজের মাঝারে  
 পাইলে নিজের পরিচয় দেখতে পাবে তাহারে॥ ঐ

গোলাম মুহাম্মদের এবাব জ্ঞান হলো না রে  
 মানুষ হইয়া একবাব চিনলাম না স্রষ্টারে  
 স্রষ্টা যে আমার অন্তরালে আমি কি পাছি তাহারে॥ ঐ

৮

যদি চিনতে চাও আল্লাহরে যাও ওলির দরবারে  
 ওলি আল্লাহর খেলা যত পির মুর্শিদের বাজারে  
 বাবা জালাল নূরী ছিলেন আল্লার ওলি সুরেশ্বর মাজারে॥ ঐ

তাহারই গুণধনের ধনী বাবা জাহাঙ্গীর আল সুরেশ্বরী  
 তিনি মিলাইয়াছেন বাজার চুনকুটিয়া চৌধুরীপাড়া ঢাকার ভিতরে  
 তারারই আলোকে বাতি জুলছে বাবা জালাল নূরীর রূপ ধরে॥ ঐ

আল্লাহ তোমার লীলা জাহের আর বাতেনে  
 মানবকে জ্ঞান দাও সত্যের সন্ধানে  
 তোমার হেদায়েত বিনে মানবের সংগতি আর নাই রে॥ ঐ

বাবা জাহাঙ্গীর তুমি বাবা জালাল নূরীর ফুলের কলি  
 তোমারই ফুলের সৌরভে আসছে মানবগুলি  
 দেশে-বিদেশে ঘূরছে তারা শুনাইয়া তোমার তত্ত্ববাণীরে॥ ঐ<sup>২</sup>

## ২. জারিগান

কারবালার বিষাদঘন কাহিনিকে নিয়ে মহররম উপলক্ষে পরিবেশিত কর্মণরস ও  
 বীরসের গানকে জারি গান বলা হয়। এগুলো হাসান-হোসেনের জারি নামেও  
 পরিচিত। একটি জারি দলে গায়ক-বাদক যিলে ১০-১২ জন থাকে। দলনেতাকে  
 জারিয়াল এবং অন্যদের দোহার বলা হয়। দোহাররা তল্লা বাঁশের তৈরি ঝাঁও হাতে  
 নিয়ে চক্রাকারে নাচে এবং ঝাঁওতে বাড়ি দিয়ে ঝনঝন আওয়াজ তোলে। কিন্তু এই  
 ধরনের জারিগান এখন আর হয় না।

### সুরতলাল কল্যান জারি

১  
 দিন গেল রে খোদার বান্দা  
 অধর হলো বেলা॥  
 এমন হাট আর মেলবে না  
 যার নামটি শ্রী খোলা॥  
 হাট কর বাজার কর ভাই  
 কেনো বেচো যাও  
 নিরবধি পাগল মনো  
 আল্লার নামটি লও।

এমন যে আল্লাজির নাম  
 নাম করিও হেলা॥  
 গোনাগার হবা বান্দা  
 ঘট্টেরও বেলা॥  
 সেই জম নাহি কম যার  
 পাঠাইয়াছেন সাঁই  
 আল্লার হকুম পাইয়া  
 ধরে নিবে ছোট বড় নাই॥

২

আল্লার হকুম পাইয়া  
 ধরে নিবে কেবা ছোট বড়  
 একিন মনে ভাই সবেরা  
 নফল নামাজ পড়॥  
 মরিলে সমন্ব নাই  
 ঘরের বাহির করে  
 আনো আনো বইলে ডাকে  
 যে থাকে যেখানে॥  
 মায়ে কান্দে জনম জনম  
 বুনে কান্দে ছয় মাস  
 ঘরেরও রমণী কান্দে  
 দিনেক দুই চার পাঁচ॥  
 কেন্দে কেন্দে বলে আমি  
 চোখ ক্যানে খোয়াব  
 মরে গেছে কুহড়ের কুড়ে  
 আমি ভাল সোয়ামি॥

৩

সতী নারীর পতি যেমন  
 পর্বতেরই চূড়া  
 অসতীর পতি যেমন  
 ভাঁগা নায়ের গুড়া ।  
 বাড়ির শোভা বাগ বাগিচা  
 ঘরের শোভা ডোয়া  
 নারীর শোভা সীতার সিন্দুর  
 নদীর শোভা খেওয়া ।  
 মন্ত্র গুণে তন্ত্র বাড়ে  
 বীজের গুণে গাছ

ওন্তাদ গুণে সাগরেদ বাড়ে  
পানির গুণে মাছ ।  
পানি যদি হয় ভাল  
তার মৎস্য লাগে মিঠা  
ওন্তাদ যদি হয় ভাল  
তার শাইগরাদে পায় দিশা॥

৪

এ-সমস্ত বলতে আমার  
হবে অনেকক্ষণ ।  
একটা সুরতলালের জারি হচ্ছে  
তাই করেন শ্রবণ ।  
তবে হানেফ খাড়া ঘোড় সোয়ারি  
কয় নানজির ঠাই  
হকুম কর নানা নবিজি  
মীল কোমলে যাই  
রাসুল বলে ওগো হানিফ  
তোমায় করি মানা॥  
নীল কোমলে শহরে হানিফ  
তুমি ঘেরেও না॥  
জংকু নামেতে রাজা তারা সাত ভাই  
আছে আসমান রাজার বি॥

৫

তাহার সঙ্গে লড়বা হানিফ  
সাধ্য রাখ কি?  
রাসুল বলে ওগো হানিফ  
তোমাকে জানাই॥  
সে বড় দুরস্ত সিপাই  
কয়লাম তোমার ঠাই  
হানিফ বলে নানা নবি  
কারণ না শুনিব ।  
ওরে সাধনের ধন চিঞ্চামণি  
তোরে না দেখিলে প্রাণ বিধুরে  
কোথায় রইলি দীন মোহাম্মদ  
একবার দেও দেখা আমারে  
কোথায় তুমি কোথায় আমি  
কোথায় বা সে আরব ও ভূমি ।

নত শির হয়ে ডাকি  
একবার দেখা দেও আমারে ।  
কোথায় রইলি দীন মোহাম্মদ ?

৬

এতেক বলিয়ে হানিফ মীরে করল গমন ।  
আপন অন্দরে যাইয়া পৌছিল তখন ।  
মা, মা বলিয়ে হানিফ ডাকিতে লাগিল ।  
ফতেমা জহুরা উপস্থিত হলো ।  
তবে বরকত বলো গো হানিফ বলি যে তোমারে  
কি জন্য ডেকেছ বাবা তাই বল আমারে ।  
হানিফ বলে মা জননী বলি তব ঠাই  
হকুম কর মা জননী নীল কোমলে যাই  
আসমান রাজার ছি আছে সুরাত নাল নামে  
তারে বিয়ে করে আনব মদিনার শহরে ।  
বরকত বলে গো হানিফ বলি যে তোমারে—

৭

আল্লা নবির কৃপায়  
লড়াই যেন হয় ফতে  
দুধের ও পেয়ালা আমি  
রেখে দিলাই ঘরে  
লাল রং দেখলে বিপদ  
বুবিব অন্তরে ।  
এতেক বলিয়া হানিফ মীরে  
সাজিতে লাগিল ॥  
নয়শ' চুয়ান্ত্রিশ মণের  
লোহার জামা গায়ে তুলে নিল ।  
বাইশ মণ লোহার জুতা  
পায়ে তুলে নিল  
হাজারও মনের গুর্জ  
বোগলে দাবিল  
চৌদ্দ মনও ছোরা নিল  
কোমরে গুজিয়া ॥  
ছয় ছয় কোস্ কোস্ অমির  
হামজার তলোয়ার  
নিল খালেতে পুরিয়া ॥

৮

আমির হামজার জল নিল  
 পৃষ্ঠতে করিয়া ।  
 আনিয়া দুল দুলি ঘোড়া  
 জিন বন্দি করে ।  
 জিন বন্দি করে ছান্দি  
 ঘোড়া সাজাইল ।  
 চৌদ্দ রেকাব সোনা  
 ঘোড়ার গলায় নিল  
 মণিমুক্তার মালা দিল  
 ঘোড়ার মুখতে  
 থেকে থেকে যেন  
 বুম বুম করে ।  
 সোনারও লাগাম দিল  
 ঘোড়ার মুখতে  
 জিন গদি পরাইল  
 ঘোড়ার পৃষ্ঠতে॥  
 লোহার হীরা জড়িত লাল  
 পরাইল ঘোড়ার পায়ে॥

৯

বিসমিল্লাহ বলে হানিফ  
 ঘোড়ার ছোওয়ার হয় ।  
 ধীরে ধীরে হানিফ মীরে  
 রাহেতে চলিল  
 পঞ্চম দক্ষিণ কোণে  
 ঘোড়া ছাইড়া দিল  
 রাইতে দিনে চলে মর্দ  
 কিছু নাহি খায় ।  
 ওরে এই রকম ছয় মাস  
 গুজরিয়া যায় ।  
 বিষম সাগর হানিফ  
 দেখিতে পাইল ।  
 সাগর দেখে হানিফ মীরে  
 কান্দে জারে জার  
 এই সাগর পার হয়ে  
 যাইব কেমনে ?

১০

হানিফ বলে দুলদুলি ঘোড়া  
 বলি যে তোরে ।  
 চল ফিরে যাই আপনারও দেশে ।  
 দুলদুলি বলে হানিফ  
 কইয়ে বুঝাই তোরে  
 দুইড়ি ভাই বুনে আমরা  
 জন্মিলাম এক ওরসে  
 ভাইর নাম ছিল আমার  
 নামে হামাগুড়ি ।  
 আমার নামটি রাখলো  
 তোর বাবা খুড়ি দুলদুলি ।  
 কত দেও দানব তুললো  
 তোর বাবা আমার পৃষ্ঠে পরে  
 রঞ্জে যাইয়া হারি নাই  
 কেন কালে ।  
 চিন্তা কইরো না হানিফ মীরে  
 কইরা বুঝাই তোরে  
 এখন তোরে নিয়া যাব  
 সাগরেরও পারে ।

১১

বিসমিল্লা বলে ঘোড়া  
 জলে মুখ দিয়া দিল  
 একেবারে নদীর পানি  
 চুমুক দিয়ে খেলো ।  
 ধীরে ধীরে হানিফ মীরে  
 মেলা দিয়া যায়  
 সাগরের ও পারে যাইয়া  
 উপস্থিত হয় ।  
 আল্লা বলে মেছের জিবরিল  
 যাওগে মেলা দিয়ে  
 আমার জলা জন্ম মারা গেল  
 পানি অর্ধেক দেও গে ছেড়ে ।  
 জিবরাইল বলে ঘোড়া  
 কইয়ে বুঝাই তোরে ।  
 জলা জন্ম মারা গেল  
 পানি অর্ধেক দেও গে ছেড়ে ॥

১২

এতেক বলিয়া দুল দুলি ঘোড়া  
 অর্ধেক দিল ছেড়ে  
 জলা জন্তু উঠিল বাঁচিয়া ।  
 পঞ্চিম দক্ষিণ কোনে  
 দেখা যাচ্ছে আগুনেরও কেল্লা  
 সেই দিক ছাড়িল ঘোড়া  
 বলে আল্লা আল্লা ।  
 হানিফ বলে ঘোড়া,  
 বলি যে তোমারে  
 দাউ দাউ করে জুলে আগুন  
 কিসেরও কারণে ।  
 ঘোড়া বলে হানিফ মীরে  
 বলি যে তোমারে  
 আলি র কারণে অগ্নি রাখে জ্বালাইয়া  
 আসিবেনও আলি শাহা  
 কুহরও তৃঢ়িতে ।

১৩

এতেক বল দেলে পাইয়া আসমান রাজা  
 লাকড়ি-খড়ি দিয়ে রাখে  
 অগ্নি জ্বালাইয়া ।  
 ঘোড়া বলে হানিফ মীরে  
 তুমি আমার কথা মানো  
 অর্ধেক পানি ছেড়ে আসি  
 অগ্নি নিবাইব ।  
 ধীরে ধীরে দুল দুলি ঘোড়া  
 করিল গমন ।  
 পাহাড়ের ওপারে যাইয়া পৌছিল তখন  
 পাহাড় পার হয়ে যখন ওপারেতে গেলো ।  
 মন্ত্র এক শহর তখন ওপারে দেখিল ।  
 ধীরে ধীরে দুল দুলি ঘোড়া করিল গমন ।

১৪

শহরের মসজিদে যাইয়া  
 পৌছিল তখন ।  
 ফুলেরও বাগান এক

দেখে তাকাইয়া  
মন্ত এক সাপ আছে  
সে বাগানেরও পিছেতে ।  
হানিফ বলে ঘোড়া চরিত যাও তুমি  
ওজু বানাইয়া আছরের নামাজ  
পড়ে আসি আমি ।  
ফুলের বাগানে যাইয়া  
হানিফ দেখিতে পাইল  
ফুল তরু লতা কত ধরিয়াছে ।  
বেশ মজার ফুটেছে ফুল  
সুগন্ধে হই বুলবুল ।  
চাপা আলি ভুমি অলি—

১৫

গোলাপ চাঁপা, গেন্দা, মন্দা ফুল  
সুগন্ধে হই বুলবুল ।  
অন্দরেতে বিবি সুরাত লাল  
দাসিকে বলিল ।  
চল দাসি আমরা ফুলের বাগানে  
হাওয়া খেতে যাই ।  
হস্তির 'পরে সওয়ার হয়ে  
বিবি করিল গমন ।  
ফুলের বাগানে যাইয়া  
পৌছিল তখন ।  
ফুলের ও বাগানে বিবি  
ঘূড়িয়া বেড়ায়  
অজু বানাইয়া হানিফ যীরে  
নামাজ পড়িতে যায় ।

১৬

কানা দাসি হেসে পড়ে  
নয়া দাসির গায় ।  
ঐ বেটার দেখ দিদি  
পেটে বেদনা হয় ।  
আর এক দাসি বলে দিদি  
শুইনা আমার কাছে ।  
একবার উঠে একবার পড়ে  
এইবার বুঝি মরে ।

বুড়া দাসি উঠা বলে  
 শুইনশা আমার কাছে  
 মক্কাইয়া নেড়ে ওরা নামাজ পড়তে গেছে ।  
 সুরাত লাল বলে দাসি  
 বলি যে তোমারে ।

১৭

কেমন কইরে আসলো পাইড়া  
 নীলকোমল শহরে ।  
 উহাকে নিয়া দিব বলি  
 মা জয় কাঙীর দুয়ারে ।  
 এই কথা বলিয়া সুরাত লাল  
 গোষ্ঠাতে জুলিল ।  
 বারুদের ঘরে যেমন  
 আগুণও লাগিল ।  
 সুরাত লাল বলে দাসি  
 বলি যে তোমারে ।  
 এখনি গৃহে যাইয়া  
 বাপেরও আগে কইয়া ।  
 জহর আলুদা বাপ মরিব  
 উহারও বুকেতে ।

১৮

নামাজ আদায় করিল মীরে  
 খোদারও দরগায় ।  
 পশ্চিম দিকে যাইয়া মীরে  
 দেখিবারে পায় ।  
 দুইটা সূর্য যেন অন্ত চলে যায় ।  
 হানিফ বলে ওগো আল্লা  
 এ-হলো কেমন ?  
 দুই সূর্য অন্ত গেল  
 কিসেরও কারণ ?  
 উত্তর দিকেতে যখন বিবি চলে যায় ।  
 হানিফারও নজর তখন পড়িল সেথায় ।  
 ধীরে ধীরে হানিফ মীরে করিল গমন ।

১৯

বিবিরও নজদিকে যাইয়া  
পেছিল তখন ।  
বিবি বলে ওগো ছোঢ়া  
তোর বাড়ি কোন শহর?  
কোন শহরে বাড়ি তোমার  
কোন শহরে ঘর ।  
কি নাম তোমার মাতা পিতার  
কি নামটি তোমার?  
তাই বল আমারে ।  
মদিনাতে বাড়ি আমার  
মদিনাতে ঘর ।  
হজরত আলির বেটা আমি  
হানিফ আমার নাম  
হাসেন হোসেনও ভাই  
রসূলেরও নাতি ।

২০

মিথ্যা বলিব না আমি রসূলেরও নাতি ।  
এই কথা বলে হানিফ হাসিয়া উঠিল ।  
হানিফারও সুরাত দেইখ্যা  
বিবি বেহঁসও হইল ।  
কেহ আনে তেল কেহ আনে পানি  
সুরাত লাল বিবিরে লইয়া  
লাগলো টানাটানি ।  
থোরা খুড়ি বাদে বিবি চেতন পালে  
চেতনও পাইয়া বিবি উঠিয়া বসিল ।  
উঠিয়া বসিয়া বিবি ঘখন হাসিয়া উঠিল ।  
বেহঁস হইয়া হানিফ মীরে জামিনে ঘিরিল ।

২১

অঞ্জ বইসে ছেমড়ী  
হেলে পড়ে গায়  
যৌবন জোয়ারের ঢেউ লাগিল হিয়ায় ।  
ছিমড়ার কথাতে মোর  
মন কাঁচা হয়  
যৌবন জোয়ারের ঢেউ  
লাগিল হিয়ায় ।

গায়ে হস্ত দিয়ে বিবি  
চেতনও করিল ।  
চেতনও পাইয়া হানিফ মীরে  
উঠিল বসিয়া ।  
বিবিরও আগে বাত কহে বুঝাইয়া  
তোমার নাম যখন,  
শুনিলাম কানেতে ।

২২  
বিদ্বিল প্রেমেরও তীর  
আমারই অন্তরে ।  
দেশ ছেড়ে এসেছি বিবি  
তোমারও তালাশে ।  
বিবি বলে ওগো ছোঁড়া  
কইয়া বুঝাই তোরে  
আমারও সমান কুলীন  
না পায় ধুইড়ে  
হানিফ বলে ওগো বিবি  
তোমাকে জানাই  
আমরা তো মুসলমান জাতি  
কুলীন মন্দ নই ।  
বিবি বলে হানিফ মীরে  
শোন সে কারণ ।

২৩  
তোমরা তো মুসলমান জাতি  
আমরা তো ব্রাহ্মণ  
এক্ষেত্রে বিয়ে হবে একথা কেমন?  
ও বিদ্যাশী বঙ্গুরে  
তুই যাইস না ফেলে  
হারে তোর জন্যে মোর  
প্রাণ কান্দে ।  
তুমি তরু আমি লতা  
থাকিব জড়িয়ারে  
তোর জন্যে মোর প্রাণ কান্দে ।  
ফুলেতে আছে মধু  
তুমি পান করিবা বইসে  
ভূমির জানে মধুর মর্ম

অন্যে কি তা জানেরে  
ও বিদেশি বঙ্গু রে তুই যাইস না ফেলে ।

২৪

তুমি এখন চল ছোড়া  
আমার অন্দর মহলে  
খিলাইব খানা আমি  
আপনার হস্তেরে  
তোর জন্য আমার প্রাণ কান্দেরে ।  
এই কথা শুইনা হানিফ মোহিত হইল  
ওরে বিবিরও পিছনে মর্দ হাটিয়া চলিল ।  
ধীরে ধীরে চলে গেলো  
সেই অন্দরও মহলে  
তোর জন্যে আমার প্রাণ কান্দেরে ।  
বাজতকে বসাইস হানিফাকে পয়ারে ।  
বাপের আগে সুরাত লাল  
দিল খবর পৌছিয়া ।

২৫

সুরাত লাল বলে শোন  
বাপু মহাশয় ।  
মক্কা নগরের আলি পাইডের ছেলে  
আমায় বিয়ে করতে চায় ।  
এতেক শুনিয়া আসমান রাজা  
গর্জিয়া উঠিল ।  
বারুদের ঘরে যেন আগুনও লাগিল ।  
কোথায় আছে আলি নাউড়ার ছেলে  
তাই আমায় বল ।  
সুরাত লাল বলে বাবা  
বলি যে তোমারে  
ছলনা কইরে নাইড়েকে  
এনেছি অঙ্করে ।  
এতেক শুনিয়া আসমান রাজা  
হৃকুমও করিল ।

২৬

জহর আলুদা বান ধনুকে জুড়িল  
কত লোক গেল সেই বান আনিবার ।

সাতশো লোক মরিল  
 সেই বান আনিতে ।  
 এতেক শুনিয়া আসমান রাজা  
 গোস্বাতে জুলিল  
 জহর আলুদা বান ধনুকে জুড়িল ।  
 বান নিয়া গেল রাজা  
 হানিফার নর্জাদকে  
 বাও পাও ভর দিয়া  
 বান দিল ছাড়িয়া ।  
 বানেরও আঘাত লাগিল  
 হানিফার বুকেতে ।  
 বেংসও হইয়া মর্দ ফিরিল জমিনে ।

২৭  
 আল্লা বলে মেছের জিবরাইল  
 তুমি যাওগে মেলা দিয়ে ।  
 হানিফারও নিঃশ্বাস তুমি  
 দেওগে বঞ্চো করে ।  
 বেংস হইয়া হানিফ  
 জমিনে ঘিরিল  
 মা মা বলে হানিফ  
 কান্দিতে লাগিল ।  
 ওরে পরোয়ার তোমার বিনে  
 ভরসা নাই আমার ।  
 হাসেনও হোসেন ভাই  
 না হলো দেখা রে ।  
 ওরে পরোয়ার তুই বিনে  
 ভরসা নাই আমার ।

... ( জারির শেষাংশ )

৪৬  
 তখনেতে আলি শাহা  
 উঠিল গর্জিয়া ।  
 হায়দারি হাঁক এক দিল যে ছাড়িয়া  
 শুনিয়া হাকের আওয়াজ  
 সৈন্য সব আতঙ্ক হলো ।

বিজলীর কড়কে সৈন্য  
কাটিতে লাগিল ।  
বাম হাত দিয়া সব হাতির  
শুঁড় ধরিয়ে  
ফেলাইয়া দিল সব সাগরেরও নিচে ।

আসমান রাজার সৈন্য সব  
ভাগিয়া চলিল ।  
পিছে পিছে আলি শাহা,  
সব খেদাইয়া যায় ।

৪৭

জংকু রাজা ধরা পଡ়িল তথায়  
জংকু রাজার দৃহস্ত বেঁধে  
দিলো হানিফারও কাছে ।  
একে একে আসমান রাজার  
ছয় ভাই ধরা পড়ে গেলো ।

গোপ্যানার নিচে আসমান রাজা  
পলাইয়া ছিল ।  
পিছে পিছে আলি শাহা  
ধইয়া গেল ।  
বাইশ হাত লোহার কেওড় ছিল  
ঘরেরও দূয়ারে ।  
কুঞ্জি তালা দিয়া  
দূয়ার দিল আটকাইয়া ।  
গোপ্যা ভরে মারে লাথি  
দূয়ারেরও উপরে ।

৪৮

খান খান হইল কেওড়  
ভাসিল তখনি ।  
দেখে যে আসমান রাজা  
আছে গোপ্য খানায় বেঁচে ।

বাইশ হাত টিকি ছিল  
মাথারও উপরে ।  
ধরিল টিকি তার আংগুলে

শোন বলি আসমান  
কহরে বুঝাই তোরে ।

ঈমান যে আন তুমি  
ইসলামেরও পরে  
আশক যে আছে আমার ছেলে  
তোমার কন্যার উপরে !  
তাহাদের শুব বিবাহ দেহো পড়াইয়া  
তাহলে এ-দেমে করিবে বাদশাই ।<sup>১</sup>

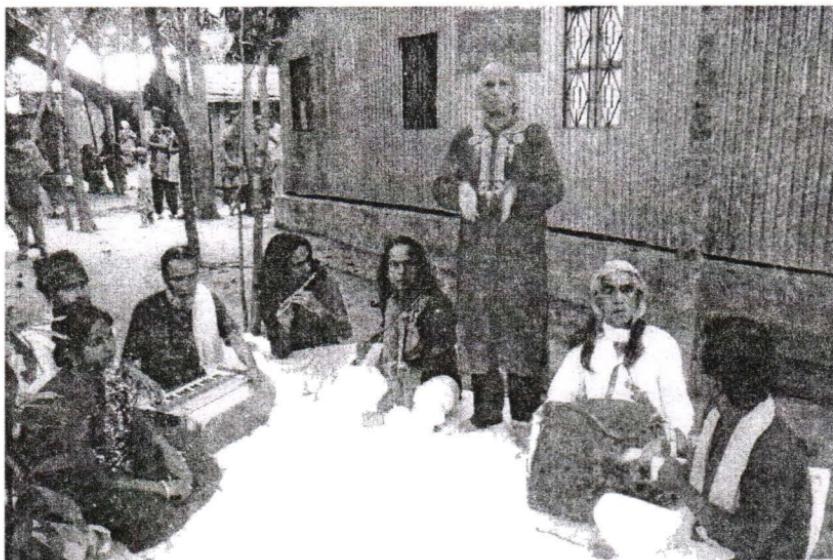
তবে জারির আঙ্গিকে সমবেতভাবে গাওয়া হয়, এমন গানের প্রচলন রয়েছে। এতে হাসন-হোসেনের বিষাদময় কাহিনির পরিবর্তে সাম্প্রতিক সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা যেতে পারে জারিগানের জনপ্রিয়তাকে অবলম্বন করে ধ্রামবাসীকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের জারি রচিত ও পরিবেশিত হয়। কবি মফিজুল ইসলাম রচিত এধরনের কয়েকটি জারি তুলে ধরা হলো:

**জীবনের জারি**  
ধন্য জীবন তারি রে ভাই ধন্য ঘোলো আনা  
মাটির বক্ষ চিরে যে জন ফেলায় শস্য দানা ।  
ধন্য জীবন ...ঘোলো আনা॥

খেলা করে নিত্য মাঠে ধূলা কাদার সনে  
কাটায় বেলা গাছের সাথে মধুর আলাপনে  
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুচ্ছ করে গুানি  
ফলায় ফসল ভক্ষণে তা বাঁচে সকল প্রাণি  
ঠিক সময়ে যে দেয় চাষ সময় মতো রোপে  
খামার ভর্বা হাঁস মুরগি কইতর আছে খোপে,  
আমার ভীষণ ইচ্ছা করে কইব তারে নানা ।  
ধন্য জীবন ...ঘোলো আনা॥

গোয়াল ভরা দামড়া গরু, আছে দুধের গাই  
পুরুর ভরা মাছও আছে তার তুলনা নাই,  
আলসেমিকে খেড়ে ফেলে চমে পতিত ভুই  
আঙ্গিনাতে ফলমূল-সবজি জাঙ্গলায় সাধের পুই ।  
কলা, পেঁপে, কচু বারো মাস, কাঁচা মরিচ তোলে নিত্য  
কলমি শাক আর ধনিয়া পাতা নাচে, নাচে গিন্নির চিঞ্চ,  
নাম দস্তখত করতে পারে, দেয় না তো টিপসই  
হিসাব নিকাশ করতে পারে পড়তে পারে বই,

আহা দুয়ে দুয়ে চার করে যে গড়ে সংসারখানা ।  
ধন্য জীবন ...ষোলো আনা॥<sup>৪</sup>



জারি পরিবেশন করছেন কবি মহিজুল ইসলাম, কর্ণফুর, পালং  
গাছ লাগানোর জারি

আসুন আমরা গাছ লাগাই  
গাছ আমাদের পরম বন্ধু  
এমন বন্ধু আরতো নাই  
আসুন আমরা গাছ লাগাই ।

সকল জীবের বাঁচার জন্য  
সতত চাই অক্সিজেন  
অক্সিজেন তো দেয় বৃক্ষ  
আমরা করি তা গ্রহণ,  
তাইতো বলি শুনুন ভাই  
জীবজগতের বাঁচার জন্য  
গাছপালার বিকল্প নাই  
আসুন আমরা গাছ লাগাই ।

খাদ্য বন্ধু বাসস্থান  
 উঙ্গিদই তা দেয় যোগান  
 ওষুধ-পথ্য সবই ভাই  
 উঙ্গিদ হতে আমরা পাই  
 এর যে কোনো তুল্য নাই  
 আসুন আমরা গাছ লাগাই ।

হিন হাউজ প্রতিক্রিয়া  
 বাড়বংগা জলোচ্ছাস  
 টর্নেডো খরা নার্গিস সিডর  
 বিপর্যস্ত পরিবেশ  
 এ-দুর্যোগে রক্ষা পেতে  
 বৃক্ষের কোনো জুড়ি নাই  
 আসুন আমরা গাছ লাগাই॥

কৃষক ভাইদের পরম সাথী  
 কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি,  
 কাগজ-বোর্ড শিক্ষার বাহন  
 আসবাবপত্র যানবাহন  
 এ-সব কিছু তৈরি করতে  
 মূল উপাদান কাঠ চাই  
 আসুন আমরা গাছ লাগাই॥

রান্নাবান্নার জ্বালানী পেতে  
 গাছ লাগাব শতে শতে,  
 ভূমি ক্ষয় রোধে এবং  
 উর্বরতা বৃদ্ধি করতে  
 দেশজুড়ে গাছ থাকা চাই,  
 মানব কুলের উপকারী  
 পশ্চপাখিদের দিতে ঠাই  
 আসুন আমরা গাছ লাগাই॥<sup>৫</sup>

### পাটের আবাদের জারি

দ্রুত বর্ঘনশীল অঁশ ফসল পাট, তার অনেক গুণ আমরা পাই  
 আমরা চাষী গ্রামবাসী পাটের আবাদ করি তাই॥

আশাব্যঙ্গক অঁশ পাওয়া যায় আধুনিক উপায়ে করলে চাষ

তার সাথে অনেক পাটখড়ি আর শুকনা পাতা বারোমাস-  
অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়, আরো কত উপকার পাই॥  
আমরা চাষী ... করি তাই॥

জমি উর্বর করতে পাট বেশ অবদান রাখে জানি সবাই  
ঘরা পাতা নিজে পচে ঘাসও পচায়, আরো জানাই-  
পাট কাটার পর গোড়া ও শিকড় যা থাকে সব পচে ভাই  
উর্বরতা বাড়ে তাই।  
আমরা চাষী ... করি তাই॥

খাদ্য শক্তি আমিষ, ক্যারোটিন,  
ক্যালসিয়াম, লৌহ, সি-ভিটামিন  
এইসব উপাদান সহজে পেতে পাটের কচি পাতা খাই,  
ও ভাই আমরা সবাই পাট শাক খাই।  
আমরা চাষী ... করি তাই॥

কচি পাটশাক খুব পুষ্টিকর,  
আহা! কচি পাটশাক খুব পুষ্টিকর সর্বত্র এর কদর তাই  
সবজির জন্যে সব মৌসুমে পাট চাষ চলে তথ্য পাই,  
পাটের আবাদ করি তাই॥  
আমরা চাষী ... করি তাই॥

দেশি পাটের পাতার রসে,  
আমাশয়, জ্বর, অস্ত্র নাশে,  
ও ভাই, দেশি ও তোষা উভয় জাতেই নানান ঔষধি গুণ যে পাই।  
আমরা চাষী ... করি তাই॥

কার্বনডাই অক্সাইড শোষণ করে পাট বায়ুমণ্ডল করে শোধন,  
অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে সে বাতাসকে করে শোধন  
ও ভাই, ফ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া রোধে তার সহায়তার ক্ষমতি নাই।  
আমরা চাষী ... করি তাই॥

পলিথিন আর প্লাস্টিক দ্রব্য অপচনশীল পণ্য যে,  
পরিবেশের ক্ষতিকারক হিসাবে এরা গন্য যে,  
ও ভাই, পাটজাত পণ্য পরিবেশবন্ধন এর তুলনা নাই রে নাই।  
আমরা চাষী ... করি তাই॥

বীজের জন্য চিন্তা নাই ওরে বীজের কোনো চিন্তা নাই  
 ভদ্র-আশ্চর্যে বীজ বুনিয়া নাবী পাটের বীজ ফলাই  
 আমরা নিজেই নিজের বীজ ফলাই, এ ভাই, নাবী পাটের বীজ ফলাই  
 আর খরচ বিনে একই সাথে বাড়তি ফসল সবজি থাই।  
 আমরা চাষী ... করি তাই॥

সোনালি আঁশ হারানো গৌরব,  
 ও ভাই, সোনালি আঁশ হারানো গৌরব, সেই গৌরব ফিরে পেতে চাই,  
 হারানো গৌরব ফিরে পেতে আজ চাই সকলের চেষ্টা চাই।  
 আমরা চাষী ... করি তাই॥<sup>৫</sup>

### কৃষির জারি

শোনেন দেশবাসী ভাই আমরা কৃষির গান গাই,  
 কৃষি ছাড়া এই দেশতে বাঁচার উপায় নাই।  
 শোনেন দেশবাসী ভাই।  
 কৃষক দেশের মেরুদণ্ড, কৃষি দেশের প্রাণ!  
 কৃষি ছাড়া এই দেশতে রচা যায় কি গান?  
 কৃষি হলো মায়ের মত এর তুলনা নাইরে নাই।  
 শোনেন দেশবাসী ভাই।

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য সবাই জানি ভাই  
 অনেক দেশেই আলু খায় এই তথ্যও পাই,  
 পেট ভরে আমরা যারা খাই ভাত ও গম  
 আলু খাওয়া লোকের চেয়ে স্বাস্থ্য কেন কম?  
 এর কারণ বলছি তো ভাই এখন সবার কাছে  
 খাদ্যোপাদান ভাতের চাইতে আলুতে বেশি আছে।  
 আরো লাভ আছে শোনেন সকল ভাইবোন চাষী  
 হেষ্টের প্রতি আলুর উৎপাদন ধানের চেয়ে বেশি।  
 আলুর আবাদ বাড়িয়ে আসুন ভাতের ওপর চাপ কয়াই।  
 শোনেন দেশবাসী ভাই।  
 কৃষি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি  
 অধিক ফসল উৎপাদনে দরকার উর্বর মাটি,  
 জমির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শস্য বিন্যাস মেনে  
 শস্য পর্যায় চাষ আবশ্যিক এই কথা নিন জেনে।  
 ধান, পাট, আখ, তৈল বীজ, ডাল ও গমের চাষ  
 লাগসই যুক্তি প্রয়োগ করলে পুরবে মনের আশ।  
 অধিক লাভ পাইতে সারেন সুষম মাত্রার জুড়ি নাই।

শোনেন দেশবাসী ভাই ।

আমরা জানি আমিষ-প্রোটিন আছে মাংশ-মাছে  
 ডিম, দুধ, পনির, ছানা, মাখনেও আছে  
 এই সবই প্রাণীজ আমিষ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কয়  
 প্রাণীজ আমিষে হৃদরোগ ও রক্তচাপের ভয়,  
 উদ্বিদ আমিষ পাওয়া যায় সর্ব প্রকার ডালে  
 হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ কম হবে তা খেলে,  
 ঝুঁকিমুক্ত আমিষ পেতে খাবেন প্রচুর ডাল  
 দেহ গঠন হবে এবং বাড়বে গায়ে বল;  
 তাইতো বলি শোনেন ভাই—  
 অধিক আমিষ পেতে আসুন ডাল ফসলের চাষ বাঢ়াই ।  
 শোনেন দেশবাসী ভাই ।

ডাল ফসলের আছে জানবেন হরেক রকম গুণ  
 একে একে বলছি এখন শোনেন দিয়া মন-  
 অজৈব সার ক্রমাগত ও বেশি ব্যবহারে  
 দিন দিন জমি জমার স্বাস্থ্য যায় পড়ে;  
 এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া ডাল ফসলের মূলে  
 নাইট্রোজেন তৈরি করে যাবেন না তা ভুলে,  
 এ-ছাড়াও বাড়া-পাতা-অন্যান্য উপজাত তার-  
 ব্রাউন ম্যানিউর, জমিতে মিশান উৎকৃষ্ট এই সার  
 উর্বরতা বাড়বে মাটির, তাইতো বলি ভাই—  
 জমির স্বাস্থ্য রক্ষা করতে ডাল ফসলের আবাদ চাই ।  
 শোনেন দেশবাসী ভাই ।<sup>১</sup>

### স্বনির্ভরের জারি

কৃষি আমাদের জীবন রে ভাই কৃষক দেশের কারিগর  
 কৃষির উন্নয়ন করে আমরা হইব স্বনির্ভর,  
 আমরা হইব স্বনির্ভর ।

মানসম্মত অধিক ফসল কম খরচে ভাই—  
 পরিবেশ আর স্বাস্থ্য রক্ষা তাও করতে চাই  
 আধুনিক চাষ করার জন্য বুদ্ধি দেয় কৃষি দণ্ডের  
 লাগসই প্রযুক্তি কলাকৌশল যোগান দেয় কৃষি দণ্ডের  
 আমরা হইব স্বনির্ভর ।

এই জগতে বাঁচার জন্য মৌলিক প্রয়োজন  
কি কি আছে একটু বলি শোনেন দিয়া মন,  
ক্ষুধার জন্য খাদ্য যেমন-ভাত গম তরকারি  
মাছ-মাংস-ডিম, শাকসবজি-দুধ, ফলমূল রকমারি  
ডাল ফসলের আবাদ করে জমিকে করব উর্বর।  
আমরা হইব স্বনির্ভর।

হরেক রকম বস্ত্র প্রয়োজন লজ্জা নিবারণে  
গরম কাপড় আবশ্যক ভাই শীত নিবারণে  
নিরাপদে থাকতে হলে দরকার মজবুত বাড়িয়র  
এইসব কিছুর জন্য সবাই নির্ভর করি উদ্ভিদের 'পর।  
আমরা হইব স্বনির্ভর।

রোগ হলে চিকিৎসা দরকার কেবা নাহি জানি  
উদ্ভিদ হতে ঔষধ তৈরি এই কথাও মানি  
কাগজ কলম শিক্ষার বাহন উদ্ভিদেরই দান  
বিদ্যা শিক্ষা করলে ভাইরে বাড়ে যে সম্মান,  
খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা আর চিকিৎসা ভাই  
বাঁচার জন্য মৌলিক প্রয়োজন কার তা জানা নাই?  
এই মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্ভর করি উদ্ভিদের 'পর  
উদ্ভিদ আমাদের পরম বস্তু উদ্ভিদ পরম সহচর,  
ও ভাই, মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্ভর করি কৃষির 'পর।  
আমরা হইব স্বনির্ভর।  
কৃষি দণ্ডের আছে ভাই  
তার উপদেশ আমরা চাই  
লাগসই প্রযুক্তি লয়ে ভাই  
চলো কৃষি কাজে যাই।  
খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় চাই,  
চলো কৃষি কাজে যাই।  
শিক্ষা আর চিকিৎসা চাই। চলো...  
টাঙ্গাইল শাড়ী কিনতে চাই। চলো ...  
বড় শিল্প কৃষি ভাই। চলো ...  
স্বনির্ভর দেশ গড়তে চাই। চলো ... ৮

### বাংলা ভাষার জারি

মায়ের জর্ঠর থেকে পৃথিবীর বাতাস ও  
আলোর ছো�ঁয়ায় নতুন শিশুর চিৎকারে

আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

পাঠশালায় যেতে উদ্যত শিশুর আস্তিন ধরে  
পকেটে সেন্দু ডিম গুঁজে দেওয়া মায়ের কঠে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

পাতার ঠোঁটে চুমু খেয়ে ঝড়ে পড়া শিশিরের শব্দে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

এ-মায়ের মোহন বুকে বয়ে যাওয়া  
আঁকাৰাকা নদ-নদীৰ কলতানে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

জ্যেষ্ঠের খরতাপে সোনালী আঁশের ক্ষেতে  
ঘামে ভেজা কিষাণের একটানা সুরে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

পউমের হাড়কাঁপা শীতে পাতার কাঁথা মুড়ি দিয়ে  
উম পাওয়া পাখিদের উচ্চারণে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

সবুজ-শ্যামলিমায় মধুময় ফুলে  
নৃত্যে পাগল মৌমাছিদের গুণগুণ থেকে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

মাঘ মাসে দুপুরে মধ্য পুকুরে পতিত নাও এর গলুইয়ে  
কল্পা উঁচু করে চুপচাপ বলে থাকা কচ্ছপের  
আচমকা লাফ দিয়ে পড়ার শব্দে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

শ্রাবণের ঢিড়া কোটা ভোরে  
কিষাণী-বধূৱ কঠের সূর আৱ টেকিৰ শব্দে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

বায়ান্নের পিচালা পথে ফিনকি দিয়ে ছোট  
ভাইয়ের বুকেৰ তঙ্গ রুধিৰেৰ উদ্দীপন থেকে  
আহা পেয়েছি যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।

পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর হন্দয় জুড়ে  
চেতনার উদ্ভাস ছড়ায় যে ভাষা সে আমার ভাষা বাংলা ভাষা ।  
আহা বাংলা ভাষা আহা বাংলা ভাষা আহা বাংলা ভাষা ॥

**বয়াতী আবদুল আজিজ দেওয়ান (১৯৭১):** গ্রাম মাকসাহার । পিতার নাম আলী আহমদ সরদার । মাতা জয়মননেসা । চারশত গান রয়েছে । সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক লোকসংগীত পরিবেশন করেন । ২০০৩ সালে জেলা তথ্য অফিস থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত । পালাগান এবং বৈঠকী গান পরিবেশন করেন । প্রতিপক্ষ হিসেবে গান করেছেন মাদারীপুরের নজর আলী বয়াতী, মাদারীপুরের ফরিদা পারভীন, শিবচরের রহুল আমিন বয়াতী, ঢাকার শাহ আলম সরকার প্রমুখ । তাঁর ২টি জারিগান এখানে তুলে ধরা হলো ।

### ১. শরীয়তপুর জেলার জারি

বাংলাদেশের গর্ব আমার সোনার শহর শরীয়তপুর-  
ওগো দেখতে ভালো লাগে সুমধুর ॥

হাজী শরীয়তুল্লাহর নামে  
শরীয়তপুর নাম রেখেছে  
মসজিদ মাজার স্কুল, কলেজ রইয়াছে প্রচুর ॥  
মন্দিরে ঘণ্টা বাজে মনসা বাড়ি আর রাম সাধুর ॥

শরীয়তপুর সাতটি থানা  
যোগাযোগে আনা গোনা  
বাবুর বাড়ির মঠ আজো রইয়াছে পড়ি  
আছে পৌরসভা কের্ট কাচারী  
গড় গড়াইয়া চলে গাড়ি পলকে যাই অনেক দূ ॥

আছে পদ্মা নদী কীর্তিনাশ  
আছে অনেক পীর আউলিয়া  
সুরেশ্বরে জানু মিলাইছে মেলা ॥  
বাউল কবি আবদুল হালিম,  
রথীন ঘটক সাকিমালী জন্ম তাদের শরীয়তপুর ॥

শরীয়তপুরের কিছু তথ্য গানে বলছি  
কিঞ্চিৎ মাত্র আমি যেখানে যাই এ জেলার গর্ব করি ।  
ধন্য বাংলাদেশের মাটি

সোনার ফসল ফলায় চাষী  
দেওয়ান আজিজ ভেবে পায় না কূল॥

## ২. নারীর প্রতি সহিংসতার জারি

শোনেন শোনেন দেশবাসী সবাকে জানাই  
নারীকে সমান অধিকার আমরা দিতে চাই।

আল্পায় বানাইল পুরুষ ও নারী  
কেন নারীর প্রতি দ্বন্দ্ব ভারি ॥  
নারী নির্যাতিত সারি সারি আমরা দেখতে পাই॥

নারী-নির্যাতনের পটভূমি  
সবার কাছে বলি আমি  
কত ঘোরুকের কারণে নারী- যাচ্ছে মারা ভাই॥

নারী পাচার এসিড নিক্ষেপ  
ওগো আরো কত জানের আক্ষেপ  
কত নারী ধর্ষণ অর্ধেক বেতন- নারীর মূল্য নাই॥

মেয়ে বাল্যকালে বিয়ে দিলে  
ওগো নারীর জীবন যায় বিফলে  
সরকারি আইন মেনে চলুন দেওয়ান আজিজ বলে যাই॥

## ৩. কীর্তন

সৃষ্টিকর্তার গুণগান করাকেই কীর্তন করা বলে। দুইধরনের কীর্তন হয় এই অঞ্চলে।  
অনেক আগে থেকেই এ-প্রথা প্রচলিত।

**নামকীর্তন গান :** ‘হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ; কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম;  
রাম রাম হরে হরে’ কেবল এই অংশটুকুই বিভিন্ন সুরে  লালে রাগে বিরতিহীনভাবে  
গাওয়া হয়। একজন মূল কীর্তনিয়া থাকলেও এটি সমবেত সংগীত। তিন থেকে পাঁচটি  
দল বা সম্প্রদায় পালাকারে অঞ্চলে (১ দিন ১ রাত), ঘোল প্রহর, চবিশ প্রহর  
এমনকি বাহাতুর প্রহরও নামকীর্তন পরিবেশন করে।

**পদাবলী কীর্তন পালা :** কীর্তনগান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরে নতুন রূপ পায়।  
এটি হয়ে তাঁর ধর্মান্দেশের মাধ্যম। গোড়া অঞ্চলে প্রচলন বলে একে গোড়ীয়কীর্তনও  
বলা হয়। ছোট ছোট কাহিনীতে ‘পালা’ থাকে বলে একে ‘পালাকীর্তন’ও বলা হয়।

এখন পদাবলি কীর্তন পরিবেশন একটু কমে গেছে। কারণ এটি একই সঙ্গে সংগীত এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রচার। সেই ধরনের সংগীতসাধকের সংখ্যা দিনদিন কমে গেছে। তাই পদাবলি কীর্তনের পরিবর্তে নামকীর্তনের প্রচারই বেশি এখন। নাম কীর্তনের মূল রূপটি হলো—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ  
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে  
হরে রাম হরে রাম  
রাম রাম হরে হরে।

একই পঙ্কজিকে বিভিন্ন রাগে পরিবেশন করা হয়। খোল বা মৃদঙ্গ এবং জুড়ি করতাল সহযোগে কীর্তনের আসর বসে।



নামকীর্তন গানের আসর

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে এ-অঞ্চলেও নামসংকীর্তন বা নামযজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। প্রথম দিকে এলাকার ভক্তরা মিলে একাধিক দল গঠন করে পর্যায়ক্রমে খোলকরতাল বাজিয়ে আসরে নামকীর্তন পরিবেশন করে। পরবর্তীকালে অন্য জেলা থেকে দল বায়না করে এনে নামকীর্তন পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। কালক্রমে এ-এলাকারই কৃষ্ণভক্ত সংগীতশিল্পীদের মধ্য থেকে বহিরাগত দলের সাথে থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এক সময়ে দক্ষ বা ওস্তাদশিল্পী নামকীর্তন পরিবেশনকারী দল-সংঘ-সম্প্রদায় গঠন করে, এক একটি দলে দশ-বারোজন করে

শিল্পী থাকে । ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরবর্তী ও বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন সময়ে দেশ ত্যাগ, দক্ষ বা ওস্তাদ শিল্পীর মৃত্যুবরণ ও চাহিদা অনুযায়ী নতুন শিল্পী সৃষ্টি না হওয়ায় কোনো কোনো কীর্তনীয়া সংহের বিলুপ্তি ঘটে । আজও নতুন নতুন দল ও সৃষ্টি হয়েছে । শরীয়তপুরের কয়েকটি কীর্তনীয়াদলের নাম উল্লেখ করা হলো: <sup>১০</sup>

(১) **শ্রীশ্রীশ্যমসুন্দর সম্প্রদায়:** প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রীবকুলকৃষ্ণ আচার্য, বাধিয়া, পালং । বকুল ঠাকুরের দেশত্যাগের পর পরিচালকের দায়িত্ব পড়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের (কীর্তনীয়া) উপর । কয়েক বছর হলো কৃষ্ণদাস কীর্তনীয়া পরলোকগত হলে এ-দলটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না ।

(২) **শ্রীশ্রীরমেশ সম্প্রদায়:** প্রতিষ্ঠা পরিচালক ডা. শ্রীরমেশচন্দ্র মণ্ডল, ওস্তাদ মুদঙ্গ বাদক, পালেরচর, নড়িয়া । প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুতে দলটি বিলুপ্ত ।

(৩) **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সম্প্রদায়:** প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক শ্রীগোপালকৃষ্ণ অধিকারী (ওস্তাদ সঙ্গীতশিল্পী) কোয়ারপুর, ডোমসার, পালং থানা । গোপাল ঠাকুরের মৃত্যুর পর পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে তাঁর অনুজ শ্রীনন্দিগোপাল অধিকারী ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি সুনামের সঙ্গেই চালিয়ে যাচ্ছেন ।

(৪) **শ্রীশ্রীরামঠাকুর সম্প্রদায়:** ডিঙামানিক, নড়িয়া, শরীয়তপুর । পরিচালক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কীর্তনীয়া ।

(৫) **মাতৃশৃঙ্খলি সংঘ:** কানুরগাঁও, নড়িয়া, শরীয়তপুর । পরিচালক মাস্টার রমণী মোহন সিকদার, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৩ ।

(৬) **শ্রীশ্রীহরিঠাকুর সম্প্রদায়:** চরসোনামুখী; রূদ্রকর ইউনিয়ন, সদর শরীয়তপুর । পরিচালক শ্রী সুবলচন্দ্র মণ্ডল ।

(৭) **শ্রীশ্রীগৌরনিতাই সম্প্রদায়:** পরিচালক লক্ষ্মণচন্দ্র বৈদ্য, হলুইপাটি, নাগেরপাড়া ইউনিয়ন, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর ।

(৮) **শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রদায়:** পরিচালক শ্রীবন্দুলাল । মণ্ডরা, ভোজেশ্বর ইউনিয়ন, নড়িয়া, শরীয়তপুর ।

## ৪. সারি গান

শরীয়তপুর জেলার কীর্তনাশা, দায়ুদিয়া, আড়িয়ালখা নদে নৌকাবাইচ হতো । নৌকা নিয়ে ঘাট থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় এবং ফেরার সময়ে মাল্লারা বা বাইচারা সারিবদ্ধ বসা অবস্থায় যে গান পরিবেশন করে থাকে, তাকে সারিগান বলা হয় । সারি গান কর্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত । এই ধারার গানের মধ্যে ছাদ পেটানোর গান কিংবা ফসল তোলার গানকেও যুক্ত করা যায় । ৩০-৪০ জন শখের বাইচা একত্রে বসে বৈঠা টানে । বৈঠা টানার শ্রম লাঘবের উদ্দীপনামূলক এই ধরনের গান গাওয়া হয় । নিমাই সন্ধ্যাস, গোষ্ঠগমন, দেহতন্ত্র, নরনারীর লৌকিক প্রেম-বিরহ, রাধা-কৃষ্ণ, রঞ্জ-তামাসা ইত্যাদি বিষয় সারিগানের বিষয়বস্তু ।

সাধারণত হিন্দুপূর্বে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে কোনো কোনো স্থানে স্থানীয় উদ্যোগে পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমেও নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়।

বাইচের আগের দিনেই নৌকা রঙ দিয়ে সাজোনো হয়। নৌকার গলুবীয়ে থাকে পিতলের ময়ূর, ঝাড়, পিতলের শাপলা ফুল, পিতলের সাপ। অনেক নৌকায় পিতলের কলসও উপড় করে বেঁধে রাখা হয়। নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসাবে কলস পেলে এমনভাবে দেখানো হয়।

সাধারণত নৌকার মাঝিরা একই ধরনের পোশাক পরে। তাদের বৈঠাও একই রঞ্জে রঙিন হয় এবং টিকারা ও কাশি এ-দুই বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে মাঝিরা বৈঠা চালায়। নৌকার পিছনে একজন দক্ষ মাঝি হালের বৈঠা ধরেন যিনি ঠিকভাবে নৌকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। নৌকার মাঝে চার-পাঁচজন সারিগানের শিল্পী থাকে যাদের হাতে থাকে লাঠি, পায়ে শুঙ্গুর, টিকারা-বাঁশির বাদ্যের তালেতালে এরা নাচে আর সারিগান গায়।

নৌকা সাজানোর সময় নৌকা সাজানোর গান, নৌকা ছাড়ার সময় বন্দনা গীত গাওয়া হয়। নৌকা ছাড়ার সময় সিঁদুর, ধান, দূর্বা দিয়ে নৌকাকে বরণ করে বিদায় দেয়া হয় এবং বিদায়ের পর নৌকা বাইচের স্থানে যাবার সময় গোঠে যাবার গান করা হয়। এ-গানগুলো রাধা-কৃষ্ণের বিছেদ, বিষ্ণুপ্রিয়ার আক্ষেপ, নিয়াইয়ের সন্ন্যাসযাত্রার বিষয় নিয়ে হয়। এছাড়া নৌকা বাইচ শেষ করে যখন তারা বাড়ি ফিরে আসে তখন ফিরাগোঠের গান করা হয়। এ-গানগুলো সাধারণত বিছেদ গানই হয় তবে মাঝে মাঝে শৃঙ্গার রঙ্গাত্মক গানও পরিবেশন করা হয় যাতে বাইচারা কাজে বেশি করে উদ্বিষ্ট হয়।

## ১.

[বন্দনা গীত]

বন্দন গো মা দেবীর চরণ॥  
 পুরেতে বন্দনা করি  
 সূর্য দেবের পায়,  
 একদিকে উদয় ভানু  
 চৌদিকে পাশায়।  
 উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,  
 যাহার হাওলায় নড়ে এ-গাছের পাথর॥ এ  
 পশ্চিমে বন্দনা করি ঠাকুর জগন্নাথ,  
 যাহার প্রসাদ বাজারে বিকায় ভার॥ এ  
 দক্ষিণে বন্দনা করি  
 ক্ষীর নদী সাগর  
 যে গাঙ্গ দিয়া বাইয়া চলে

সাধু মহাজন॥ এ  
 স্বর্গেতে বন্দনা করি সরস্বতীর পায়  
 গায়ে দে মা বলশক্তি  
 মধুর স্বর গলায়॥ এ  
 পাতালে বন্দনা করি বাসুকির চরণ  
 গান্তী ক্লপ ধরিয়া মা-ধন  
 দাও হে দর্শন॥ এ  
 তারপর বন্দনা করি  
 মা বাবার চরণ  
 যাহার প্রভাবে এ-দেহ গঠন॥ এ  
 তারপর বন্দনা করি  
 শিক্ষা গুরুর পায়  
 যে শিখাইয়াছে ডান আর বায়॥ এ  
 চৌদিকে বন্দি আমি মধ্যে করলাম স্থির॥ এ

২

[নৌকা সাজানো গান]

সাজায় রানী নীলমণি  
 অধিক বেলা গগনে  
 মাগো বিদায় করো  
 যাব আমরা গোঠেতো॥  
 সাজাইয়া কাজাইয়া রানী  
 দিল নৃপুর পায়  
 সামনে আসিয়া দেখ রে তোরা  
 বাহা কেমন দেখা যায়॥ এ  
 উহারে রে রে বোল আর না বলিব  
 ঠাকুর দাদা বলে কাঙ্ক্ষে করে নেব॥ এ  
 সাজাইয়া কাজাইয়া রানী দিল মুখে পান,  
 ঘর থেকে বাইরায় যেন পূর্ণিমার চান॥ এ

৩

[গোঠে যাবার গান]

ও তোরা জয় দে  
 তোরা সব সবী সনে,  
 গোপাল যাবে গোচারণে॥  
 ও দেখে যা তোরা নয়নে ।

ও ক্ষীণস্বরে দৃঢ়খনীরে  
কে আর ডাকবে মা বলে॥ এই  
ও দৃঢ়খনীরে নাবান দেবে  
চুমুক দেবে বদনে॥ এই

৪

[বিচ্ছেদ- নাচাড়ি ছন্দ]

ও আয় সব সখী গনে  
ওই যমুনাতে জল কেলিতে॥  
ওই দেখ যমুনাতে নামলো ছেরি  
কূলে হইল বসন চুরি,  
ও আমরা তাই দেবিয়া  
লজ্জায় মরি  
হায় কি করি চায়না বসন দিতে॥ এই  
ওই দেখ কন্দম ডালে বংশীধারী  
সে নিল সব বসন গুলি  
ও আমরা উঁচু করে বিনয় করি  
রাই কিশোরী  
চায়না বসন দিতে॥ এই

৫

[দৈত]

ছেড়ে দে কলসি আমার যায় বেলা হে নাগর  
ছেড়ে দে কলসি আমার যায় বেলা॥  
আরে হে জলভর রাই বিরহিণী জলে দিয়া ঢেউ  
হাস্য মুখে কওগো কথা ঘাটে নাই রে কেউ॥ হে নাগর...এই  
কেমন তোমার মাতা পিতা কেমন তোমার হিয়া  
একলা পাঠাইয়াছে ঘাটে কলসি কাঁহে দিয়া॥ হে নাগর...এই  
ভাল আমার মাতা পিতা ভাল আমার হিয়া  
একলা পাঠাইয়াছে ঘাটে ধর্মের দিক চাইয়া॥ হে নাগর...এই  
বিয়া নাহি কর নাগর বিয়া নাহি কর  
পরের রমণী দেইখা জুইলা পুইরা মরো॥ হে নাগর...এই  
কোথায় পাব টাকা পয়সা কোথায় পাব মাইয়া  
তোমার লাহান সুন্দরী পাইলে আমি করতাম বিয়া॥ হে নাগর...এই  
বিয়া নাহি করো রাখে বিয়া নাহি করো,  
গলাতে কলসি দিয়া জলেতে ডুবে মরো॥ হে নাগর...এই

কোথায় পাব দড়ি-কাছি কোথায় পাব হাঁড়ি  
তুমি হও যমুনার জল আমি ডুবে মরিঃ॥ হে নাগর...ঐ

৬

[ফিরা গোষ্ঠ]

তুমি শোন দাদা ভাই,  
তোমার বউয়ের সনে  
গহন বনের নদের কানাই॥  
তুমি যাও বাথানে গো দাদা  
বউরে রেখে বাড়ি  
তোমার কৃত্তি দাদা আমি বলতে পারি  
দুঃখে প্রাণ আর বাঁচে না রে॥ ঐ  
কালার সনে রস রঙে  
বলছে নানা কথা  
এমন সুবুর আহাদি বট  
তুমি পাইলা কোথা  
দুঃখে প্রাণ আর বাঁচে না রে॥ ঐ  
মন ভুলানো মন্ত্র দাদা  
তোমার বউয়ে জানে,  
তোমার মনে গোসা হইলে  
সেই মন্ত্রতে সারে  
দুঃখে প্রাণ আর বাঁচে না রে॥ ঐ

০৭

[ধ্যা]

যখন জন্মিল নিমাই  
নেমু তরু তলে  
হইয়া যদি মরতা নিমাই  
না লইতাম কোলে  
আহা বেশ বেশ বেশ॥ ঐ  
কোথা থেকে আসলো গুরু  
বসতে দিল ঠাই  
তারপর নিমের মুখে  
মা বোল ডাক আর নাই  
আহা বেশ বেশ বেশ॥ ঐ  
বৈরাগী না হইও নিমাই

সন্ধ্যাসী না হইও  
 নগরে মাগিয়া দিব  
 ঘরে বইসা খাইও  
 আহা বেশ বেশ বেশ॥ এই  
 কুলের কামিনী পাইয়া  
 নিমাইরে করাইলাম বিয়া  
 ঘরেতে রইলো না নিমাই  
 দিল ঘর ছারিয়া,  
 আহা বেশ বেশ বেশ॥ এই  
 মায়ে কান্দে পুত্র পুত্র  
 বুইনে কান্দে ভাই  
 ঘরের রমণী কান্দে  
 হারাইলাম গোসাই  
 আহা বেশ বেশ বেশ॥ এই

৮

তোর জুলায় প্রাণ গেল রে প্রাণের বন্ধু  
 তোর জুলায় প্রাণ গেল ।  
 ও বন্ধু রে গেল জাতি কুলমান  
 তবু তোমায় ছাড়বে ক্যান  
 আমার দেওয়া প্রাণ  
 কারে দিব বলো॥ এই  
 ও বন্ধু রে গলেতে ফুলের মালা  
 নাচে যত কুলবালা  
 ও তোর কূল ভঙ্গিয়া গেল ও বন্ধু রে॥ এই  
 ও বন্ধু রে আমি  
 সকল কিছু পারি ভুলতে  
 পারি না তোর বাঁধন খুলতে  
 কি মায়ায় বাঁধিয়া গ্যালা মোরে॥ এই

৯

গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খ্যালে রে বুবুজান  
 গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খ্যালে  
 উন্নরেতে ম্যাধ করিল রে বুবুজান  
 মুখ থুমা থুমা করে  
 ছইয়ার তলে বইসা বুবু  
 কোরান শরিফ পড়ে  
 ও ঘোর বুবুজান॥ এই

আগা দিয়া আসে ঢেউ পাছা দিয়া সরে  
 মোর বুবুজান  
 গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খ্যালে  
 মোর বুবুজান  
 গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খ্যালে ওলো বুবুজান  
 গঙ্গায় তরঙ্গ ঢেউ খ্যালে॥ ঐ

### ছাদ পেটানো গান

১

এদিকে তরঙ্গ ভারি  
 বেলা আছে দণ্ডচারি  
 পূর্বের বেলা পশ্চিমে গেল  
 শুরু বলে প্রেমের বাদাম তোল॥ ঐ  
 সুবাতাসে ধরলাম পাড়ি  
 তালে তালে চলবে তরী  
 শুরু বলে প্রেমের বাদাম তোল॥ ঐ  
 অনুরাগের ছোয়ায় তুমি  
 কইসা লাগাও ভক্তি রশি  
 শুরু বলে প্রেমের বাদাম তোল॥ ঐ

২

কালা মাইয়ার নিষ্ঠা কইরো না  
 ওলো চান্দুর মা॥  
 কালা মাইয়া যার ঘরে  
 মায়ে বাপে ভাবনা করে  
 আমার মাইয়া কেউ নেবে না  
 ও চান্দুর মা॥ ঐ  
 কালা মাইয়া বিয়া দিতে  
 ধরা লাগে পাও  
 টেহা দিয়া পয়সা দিয়া  
 মাপ নাই তাও  
 ওলো চান্দুর মা॥ ঐ

৩

সুজন সবী আড়ে আড়ে চায়  
 কলসি কাঁখে যমুনাতে জল আনিতে যায়॥

যখন কালা বাজায় বাঁশি  
 তখন আমি রাস্তে বসি  
 রান্ধা বাড়া ত্যাজা করে  
 কেমনে বাইরে আসি॥ এ  
 মুখখানা ছিল যে তার  
 ফুলে হাসাহাসি  
 নাকখানা ছিল যে তার  
 কানাইর হাতের বাঁশি॥ এ

৪

আমার কালো বিয়াইন লো  
 তোর পিরিতি ভাল লাগে না॥  
 খাটো খুটা বিয়াইন আমার  
 মাথায় লম্বা ক্যাশ  
 তোর মায়ায় ছাইড়া আইলাম  
 মা বাপের দ্যাশ॥ এ  
 খাটো খুটা বিয়াইন আমার  
 মানজা তার সরু  
 তোর মায়ায় ছাইড়া আইলাম  
 বার হালের গরু॥ এ  
 বিয়াইন যে পাক করে  
 চালে ওঠে ধূমা  
 মনে লয় উইডা গিয়া  
 গালে দেই চুমা॥ এ

৫

সোনাইর মায় বলে লো  
 আমার সোনাই রূপে গুণে ভাল  
 ভাতের পাইলার চেয়ে মাইয়া  
 কিছু একটু কালো॥  
 সোনাইর মায় বলে রে  
 আমার সোনাই ডাইল রাঙ্কিতে পারে  
 ডাইলের মধ্যে আড়ু পানি  
 বিলাই কাঁপ মারে॥ এ  
 সোনাইর মায় বলে রে  
 আমার সোনাই কিছু নাহি খায়  
 তিন স্যার চাউলের ভাত  
 পান্তাতে উড়ায়॥ এ

সোনাইর মা বলে রে  
 আমার সোনাইর কপাল বড় টান  
 বিয়া না অইতেই কোলে  
 আইসে সোনার চাঁচা॥ এ

০৬

পরান বঙ্গু রে  
 গত কাইল ছিলি কার ঘরে॥  
 আসবে বইলা চইলা গেল  
 না আসিল ফিরে  
 কত পদের মিষ্টি বানাই  
 সাজাই তোর তরে॥  
 আষাঢ় গেল শ্রাবণ আইলো  
 গাঙ্গে নতুন পানি,  
 আমার যৌবন তোর তরে  
 করে আনাগুনি॥  
 শ্রাবণ মাস চইলা গেল  
 হইয়াছি মাতাল  
 ভদ্র মাসে গাছের তলায়  
 ঝাইরা পড়ে তাল॥  
 তালের পিঠা বানাইয়া  
 কারে বা খাওয়াই  
 এদিক উদিক চাইয়া দেখি  
 মনের মানুষ নাই ।  
 আশ্বিন মাস চলিয়া গেল  
 এল রে কর্তিক  
 যৌবনের জুলা আমার  
 বাড়লো রে অধিক॥  
 অয়ান মাসে চারিদিকে  
 পাকলো আমন ধান  
 কোথায় রইছে পরান বঙ্গু  
 আমার কালাঁচা॥  
 পোষ মাসে আসতো যদি  
 না লাগিত কাঁথা  
 কুলি পিডা বানাই দিতাম  
 কইতাম প্রাণের কথা॥  
 মাঘের শীত বাঘের গায়  
 পরান বঙ্গু বিনে,

রাইতের বেলা ঘুম আসে না  
 নিদ্রা যাই দিনে॥  
 ফাল্লুন মাস চইলা গেল  
 আইলো চৈত্র মাস  
 ঘরের ধান ফুরাইয়া গেল  
 থাকি উপবাস॥ এ

### ৫. মারফতি গান

মারফত শব্দের অর্থ মাধ্যম। যোগাযোগের মাধ্যম। মারফতি গানে সৃষ্টিকর্তার কাছে  
 নিজের আর্তি প্রকাশ পায়। এই গানে মরমি সাধকেরা অনেক প্রতীকী শব্দ ব্যবহার  
 করেন। সুফিসাধনায় বিশাসীরা এই ধরনের গানের চর্চা করে। শরীয়তপুর অঞ্চলে  
 প্রচলিত কয়েকটি গান তুলে ধরা হলো।

তনিতায় হিরচাঁদের নাম কয়েকটি গানে উল্লেখ রয়েছে।

১

এবার অনুরাগ যার মনে উদয় হয়॥  
 সুধা বলে গরল দেখে পান করে সদায়॥  
 তার প্রমাণ দেখ ভাই, মৃত্তিকা ন্যায়  
 কত মিষ্ট ফল হচ্ছে জন্ম লোহা জেরে যার॥  
 যে জন অনুরাগী হয় মিষ্টফল তার কৃষ্ণ কথা বলতেছে সদায়॥  
 গরু পদে নয়ন দেয় রিপু কার জয়  
 ভব নদীর মাঝে, সদায় উজান তরী বায়॥  
 করে গোপী আশ্রয়, ব্রজ গোপীর ভাবলৱে  
 যে চৈতন্য ভজয়, করে মাধুর্য আশায়  
 পুণ্য মুক্তি নাহিচায় পঞ্চ বিধায় মুক্তি ছেড়ে  
 রূপে নয়ন দেয়॥  
 তার ভক্তি নিষ্ঠা হয় এই সরাপে সহজ মানুষ ধরেছে নিষ্য  
 তার শমন জ্বালা নাই, যেন রসিক মহাশয়  
 হিরচাঁদ কয় পাঞ্চের তোর শুধুই হায় রে হায়॥

২

কী আচার্য হায় রে ত্রিভঙ্গ সিঙ্গুনীরে॥  
 জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে জগৎ মাতায় রে॥  
 ক্ষণে ক্ষণে লুকায় নিরাসেরে,  
 নিরাকারে নিরঞ্জন কুলে বারাম  
 গগনের পরপারে কুলের মূল নিগম শহরে,  
 দৈব ঘোগে কুল বিকশিত পাতালে উদয় রে

চতুর্দশে কিরণ উদয় শড় দলে হয় গন্ধময়  
 অমাবশ্যার পূর্ণচন্দ্র যে কুলে দেখায় রে॥  
 কুলেতে উৎপত্তি প্রণয়, অমূল্য গুণ প্রকাশে তায়  
 যে রশ্মিকে যে কুল ধরে, সমন জ্বালা নায় রে॥

৩

জ্যান্ত হয় সেই মর্ম যেই কুলে আছে ধর্ম॥  
 গরল হয় সুধামৃত সাধন অতি গর্ম॥  
 যে কুলে ত্রিজতের মূল  
 মায়া মুঘ জীবের হয় ভুল  
 নচিতে তার পাবে কূল  
 বৃথা যাবে জন্ম॥  
 কোমল পুল্প হিংগুল বর্ণ, জীবের কাছে হয় অগণ্য  
 মহাদেব বলি ধন্য, ধ্যানে পায় সব ধর্ম॥  
 সাধন বলে সে রত্ন ধন,  
 বুকে দিলে শক্তির আসন  
 যুগলের নীর নিরপণ, জীবের চক্ষুচর্ম॥  
 ছেড়ে পাঞ্জু খুঁটিনাটি, নিষ্ঠা কইরে ধর আটি  
 হিরুচাঁদ বলে খাঁটি যে ফুলে সধর্ম॥

৪

ত্রিবেণীর তীর সুধারে জোয়ার এসে সুখ সাগরে  
 মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥  
 উজানে সুধাসিঙ্গ, সুধারে সুধাবিন্দু  
 সুখময় সিঙ্গুজলে হৃলে সাঁতার খেলে,  
 এ-জীব নিষ্ঠারিত জোয়ার এসে  
 অধর মানুষ যায় গো ভেসে॥  
 আমাবশ্যার তিথি পান্তি  
 জোয়ারে তিথির উক্তি,  
 অমাবশ্যায় প্রতিপদে দিতীয়ার তিন দিন চলে  
 মন ধরবি যদি অধর মানুষ  
 থাক নদীর কুলে বইসে  
 জোয়ারের ভাটার শেষে  
 মানুষ যায় অচিন দেশে  
 কিছুকাল গমন করে,  
 গোপনে তিন ঘোজা কোটে  
 যেদিন স্বরূপেতে কিরণ দিয়ে  
 মানুষ যায় গোলোকে মিশে

অনুরাগী যে হইবে,  
ত্রিবেণীর রূপ দেখিবে  
সহজে অধর ধরে যাবে ঐ চরণে মিশে॥  
সাঁই হিরচাঁদ কয় মানুষ খুইজে মইলে দেশে বিদেশে॥



পালাগান পরিবেশন করছেন আবদুল আজিজ দেওয়ান

৫  
যে জানে ব্রজ গোপীর মহাভাব॥  
জ্যান্ত মইরে কৃষ্ণপ্রেমের করিতেছে আলাপন॥  
অনুরাগেরই জোরে বিধির কলম নাহি সে মানে  
বেদ বেদান্ত দূরে রেখে করে প্রেম আলাপ॥  
গোপীর মনে গোপী হয়ে,  
রিপু ইন্দ্র করে স্মরণ নিষ্ঠ কইরে  
ডোবে প্রেমের তরঙ্গে, ও কাম কুমির ধরে,  
পঞ্চবানে তারে সংহারে,  
রামরতি দিবা রতি করে তোলমাল।

বারো তিথির কারুনীতি, যোগেশ্বরীর মহাযোগ  
আধারে মূলাধার মিলা রে রসেরই ভিয়ানে

পাত্র অঙ্গের নিয়ে কৃত, পাক যে রসিক করে,  
ও সে গুরুর আত্ম শিষ্য আত্ম মিলান॥  
অটল হয়ে কৃষ্ণ সেবা, মানে না যে দেবদেবী  
প্রেমে মন্ত হয়ে থাকে নি হেতু নেহা রে  
সাঁই হিরু চাঁদে কয়, সে প্রেম যারে তারে হয়  
পাঞ্জির মুখের কথা, গেল না স্বভাব॥

৬

আআ চিঙ্গ মিনু মোকামে  
লাহুত লাজুন মালকুত জমরুত  
তত্ত্ব জানো মোকামে হাউলুজ  
সাকার ঝাপে বিরাজ করে  
সে যে ও মানুষ  
দিব্য জ্ঞানে দেখতে পাবি  
যেন হইস না রে বেছঁশ ।  
সাদা মোকামে পানির কারবার  
ঐ জলে ঢেউ খেলে  
আগুন জলে বিকাজ মোকামে  
চোখের মতি তার ধরা পড়ে  
দেখ মজুরে ।  
তব খেলা বন্ধ হবে  
সেই আগুন নিভিলে॥  
এই কালো নয় কলিমন  
তার কি হবে জীবন মরণ  
ভজ গুনো মনির চরণ  
মনো আশা পূর্ণ হবে  
যদি থাকে মন ।  
ভেজাল বলে দেখতে পাবি  
ও তুই নিত্য বৃন্দাবন ।

৭

আর তৈয়ার কলেমাৰ  
শরিয়ত দিলাম পরিয়ে  
কলেমা তাওহিদ তারিকতি রয়  
কলেমা তমজিদ দেখ তুমি  
তরী বটে বয় ।  
শাহাদৎ কলেমা মারফতি  
আমি দিলাম পরিচয়॥

আর সে সময় নবি দেখ  
 শবে মিরাজ যায়  
 নফল নামাজ পড়ে সে সময়  
 শবে মিরাজে গেল নবি  
 এ দিন দয়াময় ।  
 সেই দিন হলো নফল নামাজ  
 আমি বলিলাম সভায় ॥  
 নয়তুওয়ান উছলিয়া লিঙ্গাহে তায়ালা কয়  
 রাতেন নামাজের নিয়ত হয়  
 ওয়াক্ফ সেরে নামাজ পড়ে  
 এ নিয়ত বাঁধতে হয় ।  
 ভেজাল বলে পড় নামাজ  
 ভেবে আল্লা দয়াময় ॥

## ৮

আল্লারও নূরে পয়দা  
 ইয়া মোহাম্মদ ইয়া রাসূল  
 মেওয়া পয়দা আর বুলবুল  
 বেহেস্তের বাগিচা পয়দা  
 করলেন এ না মালেকুল ।  
 না না রংগে সেই বাগিচা  
 ফুটিয়াছে ফুল ॥  
 ছিলা মালেকুম আলেকুম ছিলাম  
 মুনুত ফরজ কয়  
 ও তা দলিলেতে রয়  
 আদাবও জানাইলে পারে  
 উত্তর দিতে হয়  
 তাহা দেখ, না করিলে  
 বেজারও খোদায় ।  
 আক বাতাস যাক বাতাস  
 এই দেখ চার ওজুত  
 দিয়া আদম করলেন সুমতি  
 বুঝে দেখ এ-ভবের পর  
 মা, বাপের দুই অজুত  
 তাইতে জন্মিয়ে ভেজাল  
 ওপার বড় জুত ।

নীল ফুলেতে ঐ নিরাঞ্জন  
 লাল ফুলে হলো ফতেমা  
 ও রে তুমি জান না  
 হোসেনের কাটা জের নামাজ পড়ে  
 আমি তার করি বর্ণনা ।  
 অমাবশ্য লাগলে পারে  
 চাদ থাকে আলোকায় ॥  
 বিনা পুরুষে জন্ম নিলো  
 ঐ ইসা নবি  
 আমি সভাতে বলি  
 বল্লাম কথা প্রকাশ করে  
 তুমি বুঝ অমনি  
 এ-হলো তার বেদ বেদান্ত  
 আমি সভাতে বলি ॥  
 ছিলাম ফুল ভাগে ভাগে  
 উহার মন্তকে আসিলাম  
 শেষে মায়ের উদরে গেলাম  
 ত্রিবেণীর ঘাট পার হয়ে  
 আমি আইলাম সংসারে  
 ভেজাল বলে সত্যকার  
 আমি বলি সভাতে ।

গোলাম মুহাম্মদের একটি গানও এখানে উল্লেখ করা যায়:

১০  
 ও রে মানুষ হয়ে বেহশ আছ কী প্রকারে  
 মানুষ হইয়া একবার চিনে লও স্রষ্টারে  
 নিজ সুরাতে বানাইয়া মানুষ আছেন তার ভিতরে ॥ ঐ

প্রাকৃতিক গঠনে মানুষরূপ থাকিলে রে  
 তারে কি আর মানুষ বলা চলে রে  
 যার ভিতরে মানবিক কার্যকলাপ নাই রে ॥ ঐ

স্রষ্টার সৃষ্টি জীব আর মানুষ যত প্রকার  
 সর্বঘটে বিরাজিত সাঁই মানুষেতে প্রসার  
 মানুষরূপে তিনিই মানুষ স্রষ্টাতে যে দিদার কারে ॥ ঐ

গোলাম মুহাম্মদ এবার ভেবে বলে রে

মানুষের ভিতরে আছেন সাঁই দেখ ধ্যানের ঘরে  
নিজের পরিচয় জানিলে ধরা যাবে সেই স্মৃতিরে॥ ঐ॥

## ৬. ভাটিয়ালি

সারিগানের মতো নদীতে নৌকার মাঝির মুখে এই গান শোনা যেত। তবে এটি কর্মসংগীতের মতো উদ্দীপনামূলক নয়। ভাটির টানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে মনের সুখে কিংবা দুঃখে মাঝির মনে যে সুর উদয় হয়, তা একটা টানাসুর, কখনো বা ধীর লয়। কয়েকটি ভাটিয়ালি গান তুলে ধরা হলো:

১. উজান দেশের মাঝি ভাই ধন  
ভাটির দেশে যাও  
বাজানেরে কইও খবর  
দেখা যদি পাও ।  
নদের চোখে বিষ হইয়াছি ।  
শাতড়ির চোখে শাল (মর্মাণ্ডিক দুঃখ)  
ডাইনের কপাল বাঁয়ে গ্যাছে  
আমার দুঃখের কাল ।  
আমার কানতে (কাঁদতে) কানতে জনম গ্যাল  
পথের দিগল (দিকে) চাইয়া  
এই না গাঞ্জে দিয়া রে মাঝি  
এই না গাঞ্জে দিয়া  
কত নাও (নৌকা) আইয়ে ও যায়  
আমি থাকি চাইয়া  
এবার যদি না নেয় নাইওর  
নায়ে ছইয়া দিয়া  
কয়দিন বাদে আইবার কইও  
বাঁশের পালং লইয়া  
আমি নাইওর যাবার সাধ মিটাব  
বিষের বড়ি খাইয়া॥

## ৭. মেয়েলি গীত

নারীমনের আবেগানুভূতি তাদের পাওয়া-নাপাওয়া, সুখ-দুঃখ, হাসি-ঠাণ্ঠা প্রকাশ করে গানের মাধ্যমে। বিয়ের সময় নারীদের গান গাওয়ার রীতি আছে বলেই বিয়ের গান বলে আলাদা ঘরানা তৈরি হয়েছে। বিয়ের গান বাদে, সাধারণ যে গানগুলো নারীমনের

আবেগে রচনা করে, সুর দেয় এবং ঘরোয়া আড্ডায় পরিবেশন করে। শরীয়তপুর  
জেলায় প্রচলিত কয়েকটি মেয়েলি গান এখানে তুলে ধরা হলো:

১

মাচার তলে দুধের হাড়ি  
মাছি ভ্যানভ্যান করে  
রসো ছাওয়াল নেও কোলে॥

কিবা নেব ছাওয়াল কোলে  
সীতার দরদে মরি  
চাকা গনে আনব সিন্দুর  
পিন্দাব তোমারে  
রস ছাওয়াল নেও কোলে॥

কিবা নিব ছাওয়াল কোলে  
মানজার দরদে মরি  
ভূষণা গুনে আনব শাড়ি  
পিন্দাব তোমারে  
রসো ছাওয়াল নেও কোলে॥

২

কানছি কোনা হোগলা বোন  
সেইখানে জন্মিল সোনাতন  
সোনাতনের বাবজান যদি হয়॥

সোনার অংগোরী দিয়া  
কোলে তুলে লয়॥

সোনাতনের দাদিজান যদি হয়  
সোনার হার দিয়া কোলে তুলে লয়॥

সোনাতনের চাচাজান যদি হয়  
তালুক জমি দিয়া কোলে তুলে লয়॥

৩

নতুন কাচা কাইটাছি  
গুয়া নারকেল লাইগাছি  
আমও তো বোলাইছে

গুয়াও তো চুমুরাইছে  
 কঁঠালে ফেলিয়া গেল  
 মোচা লো বিবি ।  
 এ না কঁঠাল কাটিতে  
 এ না পাশা খেলিতে  
 লাইগ্যা গেল ঠাণ্ডা পানির  
 ল্যায়স লো বিবি ।  
 লাইগ্যা গেল শীতল পানির  
 প্যায়স লো বিবি ।  
 এ খানে না দাঁড়াইয়া  
 এ খানে না খাড়াইয়া  
 শোন দুলাল আমার মদনের  
 কথা রে দুলাল ।  
 তোমার মাদনের কথা  
 যেমন বাউল মরিচের  
 ঝাল ও লো বিবি  
 সেই না কথার আয়াসে  
 সেই না কথার কায়াসে  
 কান্দে ফুলাল ঘোড়ার গলা  
 ধইরা লো বিবি ।  
 কান্দে ফুলাল রোমাল মুখে  
 দিয়া লো বিবি ।  
 ইহার শোধও নিব রেবি  
 আমার দ্যাশে নিয়া ।  
 এ খানে না দাঁড়াইয়া  
 এ খানে না খাড়াইয়া  
 শোন দুলাল আমার চাচি  
 জানের কথা রে দুলাল  
 শুনছি শুনছি তোমার  
 চাচিজানের কথালো বিবি  
 তোমার চাচিজানের কথা  
 যেমন বিচ মরিচের ঝাল  
 ওলে বিবি ।  
 সেই না কথার আয়াসে  
 সেইনা কথার কায়াসে  
 কান্দে দুলাল ঘোড়ার গলা  
 ধইরা লো দুলাল ।  
 কান্দে দুলাল রোমাল মুখে  
 দিয়া লো বিবি ।

8

হাল চষিতি যাবা তুমি  
 ভাত রান্দিয়া খাব আমি  
 বাটুরিয়া রায় রায়॥  
 ভাত রান্দিয়া খাবা তুমি  
 ফুটা ধইরা দেখকো আমি  
 বাটুরিয়া রায় রায়॥

ফুটটা ধইরা দ্যাখকা তুমি  
 কুলাদ্যা ডাককো আমি  
 বুলাদ্যা ডাকফ্যা তুমি  
 চুল ধইরা কিলাব আমি  
 চুল ধইরা কিলাবা তুমি  
 ভাই বাড়ি যাব আমি  
 বাটুরিয়া রায় রায়॥

ভাদু বাড়ি যাবা তুমি  
 চুল ধইরা আনব আমি ।  
 চুল ধইরা আনবা তুমি  
 ধুলাদ্যা দিয়া গৌড়াব আমি  
 ধুল্যাদা দিয়া গৌড়াবা তুমি  
 কোলে কইরা আনব আমি  
 কোলে কইরা আনবা তুমি  
 কোল ভরিয়া হাগবা তুমি  
 কোল ভরিয়া হাগব আমি  
 বাটুরিয়া রায় রায়॥

বাইল্যা ঘাটে ধোব আমি  
 বাইল্যা ঘাটে ধোবা তুমি  
 বাইল্যা টাকি হব আমি  
 বাইল্যা টাকি হবা তুমি  
 পোলো দিয়া চাবাব আমি  
 পোলো দিয়া চাবাবা তুমি  
 ঘুণ হইয়া উড়ব আমি  
 ঘুণ হইয়া উড়বা তুমি  
 বাটুরিয়া রায় রায়॥  
 সরদ্যা কোবাব আমি  
 বাটুরিয়া রায় রায়॥

୫

କୁମଡ଼ାର ଫୁଲେର ପକ୍ଷଡାଳ  
 ଏକୁଶ ମିଲାବ କତ କାଳ ।  
 ବହରେ ବହରେ ମିଲାବ ବାଜାର ।  
 ଧୂତରାର ଫୁଲେର ମଧ୍ୟଥାଳ ।  
 ଏ-ଫୁଲ ମିଲାବ କତ କାଳ ।  
 ବହରେ ବହରେ ମିଲାବ ବାଜାର ।  
 ଆନ୍ଦ୍ରା ମିଏଣ୍ଟ ଚାଇହେନ ଫୁଲ ।  
 ସାଙ୍ଗି ଭଇରା ଦିବ ଫୁଲ ।  
 ଆର ଏକୁଲେର ଜଳ ତୁମି  
 ହେଓଯାଇଯା ଦେଓ ।

୬

ଚାଲେର କଦୁ ବିଲିର ମାଛ  
 ଧରାଳ ମୁନଦା ଛାଓଯାଳ ଧର  
 ଆମାର ନାଚନ ଉଇଠାଛେ  
 ନାଚଲି କୁଚଲି ବ୍ୟାବାର ପାଇଲକି?  
 ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସୀତାର ସିନ୍ଦୁର  
 ବ୍ୟାବାର ପାଇଯାଛି ।  
 ଚାଲେର କଦୁ ବିଲେର ମାଛ  
 ଧରଲୋ ବିଯାଇ ଛାଓଯାଳ ଧର ।  
 ଆମାର ନାଚନ ଉଇଠାଛେ  
 ନାଚଲି କୁଚଲି ବ୍ୟାବାର ପାଇଲି କି  
 ଆହୋ ଆହୋ ମାନଜାର  
 ଶାଢ଼ି ବ୍ୟାବାର ପାଇଯାଛି ।

୭

ଶଇରତପୁରା ଡାଳା ରେ ତାର  
 ଯାଇବ ନା ଯାଇବ ନା ଆଯନା  
 ଆମାର ଡାଳା ଖୁଲିଲ କେ?  
 ଆମାର ଡାଳାର ମାଝେ ରେ  
 ଆମାର ବାବଜାନ ରଇଛେ ବାନ୍ଦା ରେ ॥

ଶଇରତପୁରା ଡାଳା ରେ  
 ତାର ଖେଇବା ନା ଥିବା ନା ଆଯନା

আমার ডাল খুলিল কে  
 আমার ডালার মাঝে রে  
 আমার চাচা জান বইছে বান্দা রে ॥  
 শইরতপুরা ডালা রে  
 তার যইপনা যইপনা আয়না  
 আমার গলা খুলিল কে  
 আমার ডালার মাঝে রে  
 আমার মিএঁও ভাইজান রইছে বান্দা ।

৮

বালিরে বিয়া দিলাম  
 পালং টুংগীর ঘর  
 বালি আবার ঘুরিয়া  
 নাচোন করো ।  
 বালির নাচন দেইখ্যা  
 দফাদার ময়না ঘর ।  
 বালি আবার ঘুরিয়া নাচোন করো ।  
 বালিরে যে বিয়া দিলাম  
 পালংটুংগীর ঘর  
 বালি আবার ঘুরিয়া  
 নাচোন করো ।  
 বালির নাচন দেইখ্যা  
 বালির ভাসুর ময়না ঘর  
 বালি আবার ঘুরিয়া নাচোন করো  
 বালিরে যে বিয়া দিলাম  
 পালংটুংগীর ঘর ।

৯

চিকোন কালা বৈরাগী  
 বৈরাগীর ঐ ঝোলার মরমি  
 চিকোন কালা বৈরাগী  
 ও তোর ঝোলার মরধি  
 শুন্ধ সোনার জেওর রে  
 ঐ জেওর পরব আমি  
 চিকোন কালা বৈরাগী  
 বৈরাগীর ঐ ঝোলার মরধি  
 রাম মরবি কেলারে  
 ঐ বেলা খাব আমি

ঐ বেলা যাব আমি ।  
চিকোন কালা বৈরাগী॥

১০

কোদালে কাটিয়া মাটি  
মগ্ন পাইয়া সাধু রে  
তাল তেঁতুল লাগাইলো  
অঞ্চলও কাটিয়া কাগজ বানাইলো  
বানাইলো কাগজ রে ।  
আংগুল কাটিয়া  
বানাইলো কলম  
চক্ষের পানি দিয়া বানাইলো কালি ।

### ৮. বিয়ের গীত

বিয়ের গান নিছক পল্লিবাঙ্গলার মেয়েলি গীত । নিরক্ষর নারী এই গান রচনা করে । নারীর মুখেমুখে এই গান বহুকাল ধরে চলে আসছে । প্রতিবেশী নারীরা একত্রে গোল হয়ে মুখোমাথি বসে এই গান পরিবেশন করে । এতে কোনো বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না ।

শরীয়তপুরের পালং থানার রঞ্জকর ইউনিয়নের রঞ্জকর গ্রামে গিয়ে গানগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছেন কবি রঞ্জন বিশ্বাস ।<sup>১২</sup>

১.  
নীলের মৌবন দেখে  
নীলের সুরত দেখে  
ঐ যে আমার বনের বাওই  
পাগল কী না রে...

ওসে নাচিয়া নাচিয়া কেনে  
বাছিয়া বাছিয়ো কেনে রে  
কেনে নীলা বিবির নাকের  
নাক ফুল রে...

আঙ্গারীর হাটে সুবচনী বাজারে  
ঐ যে রে বাওই কেনে  
বিবির সিংহির সিঁদুরও না রে..

মনোহর বাজারে আঙ্গুরীর হাটে  
 এ যে ও বাওই কেনে  
 বিবির বিয়ার শাড়ি ও না রে...

২.  
 পিঁড়ির ভিতরে বইসা রে হেনা  
 কান্দে জারে জার রে...  
 কে আমায় গোছল করাবে রে- ॥২  
 এমন সময় চারজন নানী  
 আইসা বলে রে  
 আমরা তোমায় গোসল করাব রে ॥২

পিঁড়ির ভিতরে বইসা রে হেনা  
 কান্দে জারে জার রে  
 কে আমায় সাজনও করাবে রে ॥২  
 এমন সময় চারজন ভাবী  
 আইসা বলে রে  
 আমরা তোমায় সাজনও করাব রে ॥২

পিঁড়ির ভিতরে বইসা রে হেনা  
 কান্দে জারে জার রে  
 কে আমায় কাপড় পরাবে রে ॥২  
 এমন সময় অজনা ভাবি আইসা বলে রে  
 আমি তোমায় কাপড় পরাব রে ॥২

৩.  
 ছি ছি খেলাবার গোছিলাম বাবা  
 এ স্কুলের মাঠে ।  
 এখানেতে দেইখা আইছি বাবা গো  
 সুন্দরী বেলায় গোসল করে ।  
 এ রকম সুন্দরী দেখিয়া বাবা গো  
 আমারে করাইবেন বিয়া ।  
 টাকা নাই মোর পয়সা নাই বাবা গো  
 কি দিয়া করাইব বিয়া  
 হালের গরু বেচিয়া বাবা গো  
 আমারে করাইবেন বিয়া

বিয়া যদি না করাও আমি কি  
যাব বৈদাশ ছাইরা ।  
ডুগডুগি খেলিবার গেছিলাম বাবা গো  
এ ক্ষুলের মাঠে

সেইখানে দেইখা আইছি মাজান গো  
সুন্দরী বেলায় গোছল করে ।  
ঐরকম সুন্দরী দেখিয়া মাজান গো  
আমারে করাইবেন বিয়া॥  
টাকা নাই ঘোর...  
কি দিয়া করাইবেন বিয়া  
মাঠের জমিন বেচিয়া মা জনা গো  
আমারে করাইবেন বিয়া॥

## ৪.

ঘরের পাশে মরিচ পাছটিরে  
ও চেরল চেরল কী মেন্দির পাতা রে...  
তারই নিচে বইসা অঞ্জনা রে  
খেলে খেলে কি রঙের পাশা  
একখান পাশা হারাইয়া অঞ্জনা রে  
কান্দে কান্দে কি মনে মনে রে ।  
অঞ্জনার নানীরে বক্ষ না ধুইয়া রে  
কেনবো রঙের পাশারে  
ঘরের পাশে মরিচ পাছটি রে  
ও চেরল চেরল কি মেন্দির পাতারে  
তারই নিচে বইসা অঞ্জনারে  
খেলে খেলে কি রঙের পাশা  
একখান পাশা হারাইয়া অঞ্জনারে  
কান্দে কান্দে কি মনে মনে রে ।  
অঞ্জনার বাপরে গোলাম কি থুইয়ারে  
কেনবো রঙের পাশা রে...

## ৫.

বাবা আমার নিদারণ বিয়া দিছে  
বাবা কোন কারণ ।  
আমারে যে দিছে বিয়া ছয় ছয় মাসের পথে না রে ।  
আমারে না দিছে বিয়া কালা কুটুইরার সাথে না রে॥

ଘରେ ଆଛେ କାଠଖଡ଼ି  
ଧିରେ ଧିରେ ଜ୍ଞାଲାୟ ଶାଶ୍ଵତି  
ଆମାରେ ଯେ ଦିଛେ ବିଯା ଛୟ ଛୟ ମାସେର ପଥେ ନାରେ ॥

ବାବା ଆମାର ନିଦାରଣ ବିଯା ଦିଛେ  
କୋନ କାରଣ-  
ଆମାରେ ଯେ ଦିଛେ ବିଯା କାଳା କାମାରେର ସାଥେ ନା ରେ... ॥

ଘରେ ଆଛେ କାଠଖଡ଼ି  
ଧିରେ ଧିରେ ଜ୍ଞାଲାୟ ନନଦୀ  
ଆମାରେ ଯେ ଦିଛେ ବିଯା ଛୟ ଛୟ  
ମାସେର ପଥେ ନା ରେ ॥

୬.

ପାନ ଦେଲୋ ଚେରଲ ଚେରଲ  
ସୁପାରି ଦେଲୋ ରତି ରତି  
କେନେ ଲୋ ମାଇୟାର ମା ତୁଇ  
ଡାକ ଦିଛିଲି ॥

ଆମରା ହଇଲାମ ପଥେ ସଥି  
ମାଇୟାର ମା ହଇଲ ଏକଳା ଦାସୀ  
କେନେ ଲୋ ମାଇୟାର ମା  
ଡାକ ଦିଛିଲି ॥

ପାନ ଦେଲୋ ଚେରଲ ଚେରଲ  
ସୁପାରି ଦେଲୋ ରତି ରତି  
କେନେ ଲୋ ମାଇୟାର ବାପ  
ଡାକ ଦିଛିଲି ॥

ଆମରା ପଥେ ସାଥୀ ଆଇଲାମ  
ମାଇୟାର ବାପେ ଏକଳା ଗୋଲାମ  
କେନେ ଲୋ ମାଇୟାର ବାପ  
ଡାକ ଦିଛିଲି ॥

୭.

ନନ୍ଦୀର ଏଇ କୂଳେ ରେ ସାଲାତ ଫୁଲେର  
ଗାଛଟି ରେ ଓକି ଆହାରେ  
ରୋଦେ ଝଲମଳ ଝଲମଳ କରେ ରେ, ଓକି ଆହା ରେ...

বাতাসে হেলিয়ে দুলিয়ে পরে রে॥ নদী ঐ...

তারই নিচে বইসা রে মোল্যার বেটি অঙ্গন  
বাতাসে হেলিয়ে দুলিয়ে পরে রে  
রোদে ঝলমল ঝলমল করো॥ ওকি আহা রে নদীর...

৮.

গুন গুন সুরে কানছ ডালিম  
ভাঙ্ছু গলার বাশি রে  
ও সোনার ডালিম রে  
কালকে সোনা যাইবারে ডালিম  
পরেরও না দেশেতে  
ও সোনার ডালিম রে

পরে মাকে মা বলিলে  
ফিরে যাইব ঘরে রে  
আপন মাকে মা বলিলে  
তুইলা লইয়া কোলে রে  
গুনগুন সুরে কানছ ডালিম  
ভাঙ্দু গলার বাশি রে  
কালকে...

পরের বাপকে বাপ বলিলে  
ফিরে যাইব ঘরে রে  
ও সোনার ডালিম রে  
ডনজের বাপ কে বাপ বলিলে  
তুইলা লইব কোলে রে।  
গুন গুন সুরে...

৯.

বত্রিশ ধারের পানসি মইরম রে  
ঘাটে রইছে বান্দা রে  
একটু দেরি করল পানসি রে  
আমি মা জানরে বুঝাইয়া আস রে॥

মাজান গেছে দূরের ঘাটে রে  
আমি তারে বুঝাইয়া আসি রে।

মাজানের আছে তোলা কাপড় রে  
আমি তাইতে দিয়া আসি রে॥

আমি বাপ জান রে বুঝাইয়া আইসিরে  
বাবাজান গেছে দূরের হাটে রে  
আমি তারে বুঝাইয়া আসিরে  
বাপজানের আছে তোলা লুঙ্গিরে  
আমি তাইতে দিয়া আসিরে॥  
বক্ষি ধারের...

১০.

বাগুন লাগাইলাম সারি না সারি ধরে বালি  
বাগুন ধরে রে ভাই ।  
এমন সময় দুইটি পাঞ্চি বাগুন  
ঠুকিয়া খায় ।  
বাগুন লাগাই লাম সারি না সারি ধরে বালি  
বাগুন ধরে রে ভাই ।  
এমন সময় রাজার ছেলে লো বালি  
সাইকেল দৌড়াইয়া যায়  
ওরে ছোকরা পিট পিঠাইয়া চায় ।  
বাগুন লাগাইলাম...

শরীয়তপুর জেলার ভেদরঞ্জে উপজেলার ছয়গাঁও ইউনিয়নের ছত্রমুড়িয়া গ্রাম থেকে  
কয়েকটি মেয়েলী গীত এখানে হৃষ্ণ তুলে ধরা হলো । বর যখন কোনো মেয়েকে দেখে  
পছন্দ করে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যখন শত বিপদ হলেও তা অতিক্রম করে  
বিয়ের সিদ্ধান্তে অটল থাকে এরকম দুটি গীত: ১৩

১.

ছয়ও মাসের বুইলারে সাধু ,  
ফিরে নদীর কূলে,  
খেয়াও তো নাইকারে সাধু ,  
পার অইবা কিসে নারে—  
সাঁতার যদি জানরে সাধু ,  
সাঁতার দিয়া এসো ,  
স্নোতে যেন ভাসাইয়া নেয় না  
তোমার হাতের ঘড়ি নারে—  
নেক নেক হাতের ঘড়ি ,  
হাতের বালাই লাইয়া

তবুও আমি বিয়া করুম  
মাঝি বাড়ি চাইয়া ।

২.

আমি যাইমু- লীলা আমি যাইমু-  
চাকারও শহরে লীলা থাকবা-  
থাকবা কি একলা ঘরে  
লীলা থাকবা-থাকবা কি একলা ঘরে ।  
আমার কথা- লীলা আমার কথা-  
মনে কি পড়ল গো লীলা  
কইবা- কইবা কি আংটির সুরে  
লীলা কইবা- কইবা কি আংটির সুরে ।  
আসি হাতে- লীলা আসি হাতে  
আয়না কি জুলে গো লীলা  
জুলে- জুলে কি মোমের বাতি-  
লীলা জুলে- জুলে কি মোমের বাতি ।

মেয়ে যখন বুঝতে পারে তার স্বামীর ঘরে যেতে হবে তখন তিনি কীভাবে যেতে চান  
এরকম গীত:

৩.

বাবাজান পালকিতে সাজাইয়া দেন মোরে,  
বাবাজান ডোলসায় ভরিয়া দেন মোরে  
মাইয়া যখন হইছিলে বাবাজান (২বার)  
পরে যাইব লইয়া-  
বাবাজান পালকিতে সাজাইয়া দেন মোরে  
বাবাজান ডোলসায় ভরিয়া দেন মোরে ।  
পোলা যদি হইতামরে বাবাজান (২ বার)  
থাকতাম হাপনার গলায়-  
বাবাজান পালকিতে সাজাইয়া দেন মোরে  
মিয়া ভাই, ডোলসায় ভরিয়া দেন মোরে ।  
বইনাই যখন হইছিলে মিয়া ভাই (২ বার)  
পরে যাইব লইয়া-  
মিয়া ভাই, পালকিতে সাজাইয়া দেন মোরে  
মিয়া ভাই, ডোলসায় ভরিয়া দেন মোরে ।  
ভাইয়া যদি হইতামরে মিয়া ভাই (২ বার)  
থাকতাম হাপনার পাশে-  
মিয়া ভাই, পালকিতে সাজাইয়া দেন মোরে  
চাচাজান, ডোলসায় ভরিয়া দেন মোরে ।

ভাগনি যখন হইছিলে মামা (২বার)  
 পরে যাইব লইয়া—  
 মামাজান, পালকিতে সাজাইয়া দেন মোরে  
 চাচাজান, ডোলসায় ভরিয়া দেন মোরে।

8.

তোমারি বাবাজি করছিল কি বড়াই গো শারমিন  
 তোমারে না দিব বিয়া গো শারমিন  
 তোমারে না দিব বিয়া।  
 সোটকেছ ভরা কাপড় না ঝোলে গো শারমিন  
 তোমারে হাইদ্যা দিছে বিয়া গো শারমিন  
 তোমারে হাইদ্যা দিছে বিয়া।  
 সোনার খড়ম পায়ে না দিয়া গো শারমিন  
 ঐ যে মেনদির বাগান ঘোইরা গো আস  
 তোমারও মামাজী করছিল কি বড়াই গো শারমিন  
 তোমারে না দিব বিয়া গো শারমিন  
 তোমারে না দিব বিয়া।  
 কুড়ই ভরা যায়েনা জিনিস গো দেইখ্যা  
 তোমারে হাইদ্যা দিছে বিয়া গো শারমিন  
 তোমারে হাইদ্যা দিছে বিয়া।

কনে যখন তার চির পরিচিত বাবা-মা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন ফেলে স্বামীর ঘরে  
 যেতে চায় না তখন কনে কে সান্ত্বনা দিয়ে গীত:

৫

চল চল চল গো বিবি  
 চল যাই হাপনার দেশে গো বিবি (২ বার)  
 তোমার দেশে গেলে রে সাধু  
 বাপও যে বোলাইয়ু-কারে রে সাধু  
 মাও যে বোলাইয়ু-কারে রে সাধু।  
 আমার আছে বিন্দু কাইল্যা মাও গো  
 তারে যে বোলাইবা মাও গো বিবি॥ (২ বার)  
 এক গাছের বাকল যে সাধু  
 আরো যে গাছেতে লাগে রে সাধু॥ (২ বার)  
 চল চল চল গো বিবি  
 চল যাই হাপনার দেশে গো বিবি॥ (২ বার)  
 তোমার দেশে গেলে রে সাধু  
 বাপও যে বোলাইয়ু কারে রে সাধু

আমার আছে বিন্দু কাইল্যা বাপও গো  
 তারে যে বোলাইবা বাপও গো বিবি॥ (২ বার)  
 এক গাছের বাকল যে সাধু  
 আরো যে গাছেতে লাগে রে সাধু॥ (২ বার)  
 চল চল চল গো বিবি  
 চল যাই হাপনার দেশে গো বিবি॥ (২ বার)

এছাড়া আরো কিছু গীত বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা এখানে তুলে ধরা  
 হলো:

১  
 হাতি চলে নিমিরে ঝিমি  
 ও রাজার ঘোড়া চলে বনে ।  
 তারিপরে বসে রাখরে  
 হাওই বাজি ছাড়ে ।  
 এ্যাক বাজি ছাড়ে রাম  
 কইন্যার বুনির চলে  
 তা দেখে কইন্যের বুনি  
 কাঁপে থরে থরে॥  
 আমার বুনরি দিছি বিয়া  
 দারুণ বাঘের সাথে  
 হাতি চলে নিমিরে ঝিমি  
 ও রাজার ঘোড়া চলে বনে ।  
 তারি পরে বসে রাখরে  
 ব্যাঙ বাজি ছাড়ে ।  
 এ্যাক বাজি ছাড়ে রাম  
 আশে আর পাশে,  
 আরেক বাজি ছাড়ে রাম  
 কইন্যের মায়ের গালে ।  
 তা দেখে কইন্যের মায়ে  
 কাঁপে থরে থরে॥  
 আমার মারে দিছি বিয়ে  
 দারুণ বাঘের সাথে  
 হাতি চলে রিমিয়ে ঝিমি  
 ও রাজার ঘোড়া চলে বনে ।  
 তারি পরে বসে রাখরে  
 তারা বাজি ছাড়ে ।  
 এ্যাক বাজি ছাড়ে রাম

ଆଶେ ଆର ପାଶେ,  
ଆରେକ ବାଜି ଛାଡ଼େ ରାମ  
କହିନ୍ୟେର ମାସି ଚଲେ ।

ତା ଦେଖେ କଳ୍ପନାର ମାସି  
କାଁପେ ଥରେ ଥରେ  
ଆମାର ବୁନବି ଦିଛି ବିଯେ  
ଦାରୁଣ ବାଘେର ସାଥେ ।  
ହାତି ଚଲେ ନିମିଯେ ବିମି  
ଓ ରାଜାର ଘୋଡ଼ା ଚଲେ ବନେ ॥

୨

ବାପେରୋ ଯେ ଉଠାନେ  
ନାରକେଲେରେ ଗାଛଟି,  
ତାର ଆଗାର ଡାଲେ  
ବସେ ଦାରୁଣ କୋକିଲାଟି ।  
ଶୁନ ବଲି ଓ ଦରଜେର ବାପଧନ  
ତୁମି ଗୁରଳ ମାରେ ଉଡ଼ୋଏ ଦାରୁଣ କୋକିଲରେ  
(କୋକିଲ) ଗରୁଳ ମାରଲେଓ ଓଡ଼ବ ନା,  
ତୀର ମାରଲେଓ ଯାବ ନା,  
ନିଯେ ଯାବ ତୋମାର ଶିଶୁ କହିନ୍ୟା ଦେଶେରେ ॥  
ମାମାରୋ ଯେ ଉଠାନେ  
ଗାବେ ରୋ ଯେ ଗାଛଟି ।  
ଓ ତାର ଆଗର ଡାଲେ  
ବସେ ଦାରୁଣ କୋକିଲରେ ।  
ଶୁନ ବଲି ଓ ଦରଜେର ମାମା  
ତୁମି ଉଡ଼ୋଏ ଦାରୁଣ କୋକିଲରେ ।  
ଗୁରଳ ମାରଲେଓ ଓଡ଼ବ ନା,  
ତୀର ମାରଲେଓ ଯାବ ନା,  
ନିଯେ ଯାବ ତୋମାର କାଚା ଭାଗିନି ଦ୍ୟାଶେରେ  
କାକାରୋ ଯେ ଉଠାନେ  
କଦମ୍ବରୋ ଗାଛଟି  
ଓ ତାର ଆଗର ଡାଲେ  
ବସେ ଦାରୁଣ କୋକିଲରେ ।  
ଶୁନ ବଲି ଓ ଦରଜେର କାକା  
ତୁମି ଉଡ଼ୋଏ ଦାରୁଣ କୋକିଲରେ ।  
ଗୁରଳ ମାରଲେଓ ଓଡ଼ବ ନା,  
ନିଯେ ଯାବ ତୋମାର ଶିଶୁ ଭାଇଜି ଦ୍ୟାଶେରେ ॥

দাদারো যে উঠানে  
 জামেরো যে গাছটি ।  
 তার আগর ডালে  
 বসে দারুণ কোকিলরে ॥  
 শুন বলি ও দরজের ভাইধন  
 তুমি গুরুল মারে উড়োও দারুণ কোকিলরে  
 গুরুল মারলেও ওড়ব না,  
 তীর ছুড়লেও নড়ব না,  
 নিয়ে যাব তোমার আদুরে বুনভি দ্যাশেরে ।  
 আজারো যে উঠানে  
 বকুলে রো গাছটি  
 তার আগর ডালে বসে দারুণ কোকিলটি ।  
 শুন বলি ও দরজের আজ  
 তুমি গুরুল মারে উড়োও দারুণ কোকিলরে ॥  
 গুরুল মারলেও ওড়ব না,  
 তীর মারলেও নড়ব না,  
 নিয়ে যাব তোমার শিশু নাতনি দ্যাশেরে ॥

৩

শুন বলি ও দরজের চাচা  
 তুমি কাগচ কেটে  
 ঘোরো সোনার বাঢ়ি রে ।  
 শনিবারের দিনি রে,  
 রাজার বেটা আসপে রে,  
 নিয়ে যাবে তোমার শিশু ভাইয়ি দ্যাশে রে ॥  
 কলা তলায় যাব না,  
 ধুলা খ্যালা খ্যালব না  
 ভাঙ্গে নেবে তোমার কলাতলার খ্যালা রে  
 শুন বলি ও দরজের মামা রে  
 তুমি তার কাটাদে  
 ঘোরো সোনার বাঢ়ি রে ।  
 শনিবারের দিনেরে,  
 রাজার বেটা আসপে রে  
 নিয়ে যাবে তোমার  
 শিশুর ভাগী দ্যাশে রে ॥  
 কদম তলায় যাব না,  
 শিশু খ্যালা খ্যালব না,  
 ভাঙ্গে নেবে তোমার

কদম তলার খ্যালা রে॥  
 শুন বলি ও দরজের দাদা  
 তুমি ব্যাড়ি দিয়ে  
 ঘেরো সোনার বাড়ি রে।  
 শনিবারের দিনে রে,  
 রাজার বেটো আসপে রে,  
 নিয়ে যাবে তোমার  
 শিশু বুনডি দ্যাশে রে।  
 বকুল তলায় যাব না,  
 ছেলে খ্যাল খ্যালবোনা,  
 ভাঙ্গে নেবে তোমার  
 বকুলতলার খ্যালা রে॥

শুন বলি ও দরজের জ্যাঠা  
 তুমি কাচ কেটো ঘেরো সোনার বাড়ি রে  
 শনিবারের দিনে রে  
 রাজার বেটো আসপে রে  
 নিয়ে যাবে তোমার  
 অবলা ভাইঝি দ্যাশে রে॥  
 কলা তলা যাবনা  
 রান্না বান্না খ্যালবোনা  
 ভাঙ্গে বেনে তোমার  
 কলাতলার খ্যালা রে॥

৮  
 শুন বলি ও দরজের বাপৰ্ধন  
 তুমি নারে যেইও  
 উন্নর সমাজিতার মাঝে রে।  
 উন্নর সমাজিতে গিছিলে,  
 পানের লোভী হইছিলে,  
 পানের লোভী হইয়ে তুমি  
 ছাড়লে অব নারীর মায়া রে॥

শুন বলি ও দরজের জ্যাঠা রে  
 তুমি নারে যেইও  
 দক্ষিণ সমাজিতার মাঝে রে।  
 দক্ষিণ সমাজিতে গিছিলে,  
 জোড়ের লোভী হইছিলে,

জোড়ের লোভী হইয়ে তুমি  
ছাড়লে শিশু ভাইজির যায়া রে॥  
জোড়ের লোভী হইলি,  
ছেলে দেখে দিছি॥

শুন বলি ও দরজের মাঝারে  
তুমি নারে যেইও  
নতুন সমাজিতার মাঝে রে।  
নতুন সমাজিতে গিছিলে,  
হৃকার লোভী হইছিলে,  
হৃকার লোভী হইয়ে তুমি  
ছাড়লে তুমি শিশু বালীর মায়া রে॥  
হৃকার লোভী হইলি  
বাঢ়ি দেখে দিছি॥  
শুন বলি ও দরজের আজারে  
তুমি নারে যেইও  
পশ্চিম সমাজিতের মাঝে রে  
পশ্চিম সমাজিতে গিছিলে,  
পানের লোভী হইছি রে,  
পানের লোভী হইয়ে তুমি  
ছাড়লে নাতনীর মায়া রে।  
পানের লোভী হইনি,  
ছেলে দেখে দিয়াছি॥

## ৫

মাঠে সাঙ্গাল কড়ে বাঙ্গাল  
বাঙ্গাল সারি সারি রে।  
তারির পরে বসে কানাই  
বাজায় মোহন বাঁশি।

তোরো বাঁশির বোলে কানাই আমার  
মা-ধন কান্দে ঘরে।  
শিগগির করে সাজো রে সমেলা  
যাইতে হবে দ্যাশে  
মাঠে সাঙ্গাল কড়ে সাঙ্গাল  
সাঙ্গাল সারি সারি রে॥

তারির পরে বসে কানাই

বাজায় মোহন বাঁশি ।  
 তোরো বাঁশির বোলো শুনে  
 আমার বাপধন কান্দে গেছে ঘরে ।  
 শিগগির করে সাজোলো সমেলা  
 গাঙ্গে উজান ভাটি ।  
 আমার বাপধন গেছে যজ্ঞ দেখতে  
 কারে বলে আমি॥  
 ঘড়ে আছে তালের পাখা  
     তাইতি লিখে আসি ।  
 বাপধন যহন দ্যাখপে পাখা  
     তহন পড়বে মনে রে॥  
 মাঠে ঝাঙ্গাল কড়ে ঝাঙ্গাল  
     ঝাঙ্গাল সারি সারি রে,  
 তারির পরে বসে কানাই  
     বাজায় সানাই বাঁশি ।  
 বাঁশির বোলে কানাই আমার  
     বুনধন কান্দে ঘরে ।  
 শিগগির করে সাজোলো সমেলা  
     যাইতে হবে দ্যাশে ।  
 আমার বুনধন গেছে জল আনতে  
     কারে বলে আসি ।  
 ঘরে আছে ঘরের কপাট  
     তাইতে লিখে আসি ।  
 বুনধন যহন দেখবে কপাট  
     তহন পড়বে মনে রে ।

মাঠে ঝাঙ্গাল কড়ে ঝাঙ্গাল  
     ঝাঙ্গাল সারি সারি রে  
 তারির পরে বসে কানাই  
     বাজায় তালের বাঁশি  
 বাঁশির বোলে কানাই আমার  
     খুড়ায় কান্দে ঘরে ।  
 শিগগির করে সাজোরে সমেলা  
     যাইতে হবে দ্যাশে ।  
 আমার খুড়ায় গেইছে উত্তর বিলি  
     কারে বলে আসি ।  
 ঘরে আছে জল চোছি  
     তাইতি লিখে আসি ।

খুড়ায় যহন বসবে তাতে  
তহন পড়বে মনে॥

৬

রাম কয় রে বিয়েরে করিতে  
তেলি পাড়া দিয়ে ।  
তেলির মেইয়ে রঞ্জনা করে  
তেলের কড়ি দিয়ে একি রামরে ।  
ছাড়ে দে রে তেলির মেইয়া  
বিয়ে করে আসি,  
পিণ্ডি ব্যালায় দিয়ে যাব  
তোরো তেলে কড়ি  
কি রাম রে॥

রাম যায় রে বিয়ে করিতে  
ঝৰি পাড়া দিয়ে ।  
ঝৰির মেইয়ে রঞ্জনা করে  
কুলোর কড়ি দিয়ে  
একি রাম রে॥

ছাড়ে দে রে ঝৰির মেইয়ে  
বিয়ে করে আসি ।  
পিণ্ডি ব্যালায় দিয়ে রে যাব  
তোরো কুলের কড়ি ।  
কি রাম রে॥

রাম যায় রে বিয়েরে করিতে  
ঝুলা পাড়া দিয়ে ।  
ঝুলার মেইয়ে রঞ্জনা করে  
তাদের কড়ি দিয়ে  
একি রাম রে ।

রাম যায় রে বিয়ে করিতে  
বামন পাড়া দিয়ে ।  
বামনের মেইয়ে রঞ্জনা করে  
শাঁখা সিন্দুর দিয়ে  
একি রাম রে॥

ছাড়ে দে রে বামন মেইয়ে  
বিয়ে করে আসি ।  
আমি পিণ্ডি ব্যালায় দিয়ে রে যাব  
তোরো শাঁখা সিন্দুর কড়ি ।  
কি রাম রে॥

৭

ও রে ছেট ব্যালায় বাপধন  
 আমায় দিয়ে ছিল বিয়ে  
 এই রামচন্দ্র সাথে রে ।  
 ও রে শিশু ব্যালায় খণ্ডের মশায় রে  
 দিয়েছিল বনরেবাসে  
 লক্ষণের দ্যাশে যাব রে না ।  
 ও রে অন্ন বিনা খায়ও সীতা  
 খায়ও গাছের ফল  
 ওকি লক্ষণ রে॥  
 ও রে শার্জবিনা লয়ও সীতা  
 লয়ও গাছের নতা ।  
 ও রে বন্ত্র বিনা পরে সীতা  
 পরে গাছের ছাল  
 ও ভাই লক্ষণে ।  
 ও রে তেলো বিনা হয়ও সীতা  
 হয়ও জটোধারী  
 ও কি লক্ষণ রে ।  
 ও রে সিন্দুর বিনা পরে সীতা  
 রামের পদধূলি ।  
 ও ভাই লক্ষণ রে॥

৮

কিসির বাদ্য বাজে রে বাপধন  
 শ্বীরোই নদীর কূলে ।  
 তোমারে যে দিছি বিয়ে  
 সেই না বাদ্য বাজে ।  
 সেই না কথা শুনে রে ময়না  
 উঠল বাপের কোলে ।  
 বাপের কোলে উঠে ময়না  
 কান্দে বিনয় করে ।  
 আচকের রাতো রাখো রে বাপধন  
 তোমার বুকের মাঝে সেরে,  
 কথা দিছি জবাব দিছি ময়না  
 তোমায় ক্যামনে রাখপো সেরে॥  
 কিসির বাদ্য বাজে রে খুড়োধন  
 শ্বীরোই নদীর কূলে,

তোমারে যে দিছি বিয়ে  
 সেই না বাদ্য বাজে ।  
 সেই কথা শুনে ময়না  
 উঠল খুড়োর কোলে,  
 খুড়োর কোলে উঠে ময়না  
 কান্দে বিনয় কোরে ।  
 আচকের রাতো রাখো খুড়োধন  
 তোমার হিসল কোঠায় সেরে ।  
 কথা দিছি জবাব দিছি ময়না  
 ক্যামনে রাখপো সেরে ।  
 কিসির বাদ্য বাজে রে সাধন  
 শ্বীরোই নদীর কূলে,  
 তোমারে যে দিছি বিয়ে  
 সেইনা বাদ্য বাজে ।  
 সেই কথা শুনে ময়না  
 কান্দে অবিরত  
 আচকের রাতো রাখো রে মা-ধন  
 তোমার ধানের গোলায় সেরে ।  
 কথা দিছি জবাব দিছি ময়না  
 ক্যামনে রাখপো সেরে ।  
 কিসির বাদ্য বাজে রে জ্যাঠাধন  
 শ্বীরোই নদীর কূলে  
 তোমারে যে দিছি বিয়ে  
 সেই না বাদ্য বাজে ।  
 সেই কথা শুনে ময়না  
 কান্দে রাত্রি দিনে,  
 আচকের রাতো রাখো রে জ্যাঠা  
 তোমার রাক্ষন ঘরে সেরে ।  
 কথা দিছি জবাব দিছি মান  
 ক্যায়নে রাখপো সেরে॥  
 কিসির বাদ্য বাজে রে আজা-ভাই  
 শ্বীরোই নদীর কূলে  
 তোমারে যে দিছি বিয়ে  
 সেই না বাদ্য বাজে ।  
 সেই কথা শুনে ময়না  
 উঠল আজাৰ কোলে ।  
 আজাৰ কোলে উঠে ময়না  
 কান্দে ফুলে ফুলে

আচকের রাতো রাখো রে আজা  
তোমার গোলা ঘরে সেরে ।  
কথা দিছি জবাব দিছি ময়না  
ক্যামনে রাখপো সেরে ॥

### ৯. পল্লিগীতি

পল্লির মানুষেরাই ভাটিয়ালি গায়, মুশিদি গায়, মারফতি গায়, তারপরেও সে গ্রামের  
প্রকৃতির বন্দনা করে, প্রেম-বিরহের অনুভূতি প্রকাশ করে সুরে সুরে । এসব গান নিয়েই  
জন্ম হয়েছে পল্লিগীতির । কয়েকটি পল্লিগীতি এখানে তুলে ধরা হলো ।

১

বাঙ্গলাবাসী শোন ভাই আজ তোমাদের নতুন গান শোনাই  
• আমি পাড়া গাঁয়ের কৃষক ছেলে আপনাদের সালাম জানাই ।

আজ তোমাদের নতুন গান শোনাই ।

মাঠের উপর মাঠ গড়েছে, ফলছে খাবার ধান  
ক্ষেতে নেমে সুমিষ্ট ফল হাতে দে মোরা ছিড়ে খাই

আজ তোমাদের নতুন গান শোনাই ॥

নদীর জলে রঙিন পালে চলে মাঝির দল

ঘাটে নেমে কুলবধূর দল ভরে কলসির জল ।

এমন মায়া মাখা মধুর চাহনী কোন দেশে আর আছে ভাই ॥

এক মাঠেই লাঙল চৰি একমাঠেই খেলি

এক সাজেই ঘুরি ফিরি দেখি তীর্থের মেলা

এক গাছের ফল এক মাঠের জল পাকে একটু ভিন্ন খাই ।

আজ তোমাদের নতুন গান শোনাই ॥

আমার মাতা তোমার মাতা ভিন্ন কিছু নাই

আমার বাবা তোমার বাবায় বলে পড়শী ভাই ।

হাকিম বলে হিংসা ত্যাগ মনের ময়লা ফেল ভাই

আজ তোমাদের নতুন গান শোনাই ॥

২

আমার গানের তরী ভাসিয়ে দেবো

প্রেমের সিক্কু নীরে ।

ভাবের বাদাম তুলব টেনে

ভাষায় ভরা ভরে ॥

ছন্দ দিয়ে গড়ব রে হাল

মনকে করে মাঝি

আনব আমি তোমার হাটের  
পালের দড়ি খুঁজি ।  
কল্পলোকের আলোক মালায়  
সমুখ দেব ঘিরে॥  
তোমার নামের রঞ্জিবজা  
মাস্তুলে উড়াইয়া  
স্নোতের বুকে ভাসব আমি  
আনন্দে গান গেয়ে ।  
(তোমার) প্রেমের পরানা একে যাবো  
উভয় তীরে তীরে॥

৩

আমি যাই গানের তরী বেয়ে  
আমার সুর ভেসে যায় বাঁধনহারা  
দখিন হাওয়ার পরশ পেয়ে॥

ভাসিয়েছিলেম যখন তরী থানি  
উষা তখন রঙিন আলোয় ভরা  
পাখির গানে ছিল সে মুখরা  
দুলে ছিল কুসুমগুলি  
গন্ধব্যাকুল মন্দ বায়ে॥

যখন পালে লেগেছিল হাওয়া  
ভোবেছিলেম সফল হোল বুঝি  
আমার তরী বাওয়া  
ছটেছিলেম স্নোতের টানে  
মেতেছিলেম নিজের গাওয়া  
গানের তানে॥  
না জানি হায় কখন এলো  
কাজল মেখে আকাশ ছেয়ে॥

৪

আমি এমনি করে যাব রে ভেসে  
বেসুর সুরে বাজিয়ে বাঁশি  
আপন মনে কেন্দে হেসে !

চন্দ্ৰ সূর্য দিবস রাতি  
আমার অচিন দেশে চলার সাথী রে

তারা আনন্দেতে রইবে মাতি রে  
আমার গানের সুরের বেশে॥

হালছাড়া মোর ভাঙা তরী  
দিশাহারা স্নোতের টানে  
কোথায় গিয়ে ধরবি পাড়ি  
কোন সুন্দরে কেউ না জানে।

পাগলা হাওয়া বাদল রাতে  
কহিবে কথা আমার সাথে রে  
আশিস সম আকাশ হতে  
বাদল ধারা পড়বে এসে॥

৫

সেদিন আমার সব সাধনা সফল হবে  
যেদিন আমার নীরব বাঁশি  
বাজবে আবার মধুর রবে।  
যেদিন আমার কাতর ডাকে  
দেবের প্রাণে জাগবে সাড়া  
বইব চেয়ে সজল চোখে  
বেদীর পানে পলক হারা।  
যখন পাব দেবের বাণী  
গাইব আমি সে গানখানি।  
শেষ না করা সেই রাগিণী  
অবাক হয়ে শুনবে সবে  
যেদিন আমার নীরব বাঁশি  
বাজবে আমার মধুর রবে॥  
দুর্কুল ভেঙে উতল নদী  
ব্যাকুল হয়ে আসবে ছুটি  
নিদাঘ তাপে তণ্ড মরুর  
নীরস বুকে পড়বে লুটে।  
চেউয়ের তালে মধুর তানে  
উঠবে মেতে যিলন টানে  
বাধার বাঁধন টুটিবে যবে,  
যেদিন আমার নীরব বাঁশি  
বাজবে আবার গভীর রবে॥

নিশা আমার জীবন ঘিরে  
 বারেবারে আসবে জানি  
 তুমি আপন হাতে জুলিয়ে দিও  
 প্রদীপখানি, প্রদীপখানি॥

আঁধার ঘরে জুলবে আলো  
 দূর হবে গো সকল কালো  
 সেই আলোকে হেরব তোমায়  
 শুনব তোমার অমিয় বাণী॥

মদির আবেশে মধুর বাসে  
 নিদ যদি আসে নয়ন পাতে  
 বাঁশিটি তোমার বাজায়ে প্রিয়,  
 নয়নের ঘূম ভাঙিয়ে দিও,  
 হৃদয় আমার রাঙিয়ে দিও  
 তব প্রেমের পরশ তুলিকা টানি॥

৭  
 এ গান আমার শেষ করে দাও  
 শেষ করে দাও গো  
 তোমার গানে হৃদয় ভুবন  
 দাও ভরে দাও গো॥

তোমার সুরে কষ্ট মম  
 উঠুক বেজে মধুর তম  
 হৃদয় আমার কুসুম সম  
 দোলাও দোলাও গো॥

আমি গেয়ে যে যাই আপন মনে  
 কত বেসুর গান  
 আজি হোক না তার চিরতরে  
 চরম অবসান।

যে গান আজো হয়নি গাওয়া  
 যে দান আজো হয়নি পাওয়া  
 তাই দিয়ে মোর সকল চাওয়া  
 পুরাও পুরাও গো

৮

আমার জীবন নদী ঘূমিয়ে পড়ে  
গভীর আলস ভরে  
তখন যেন তোমার বাঁশি  
বাজে ব্যাকুল সুরে ।

শ্রান্তিভরা নয়ন মেলি  
হেরব তোমার রূপ দীপালি  
তোমার বাঁশির সুর-কাকলী  
হৃদয় দেবে ভরে ॥

জীবন আমার যাক বয়ে গো  
সাগর রণের মাঝে  
আমার নভে নবীন রবি  
সদাই যেন রাজে  
তোমার প্রেমের শহর লাগি  
হৃদয় আমার রইবে জাগি ।  
মরণ হারা সুধার ধারা  
পড়ুবে ঝরে বরে ॥

৯

তুমি গানে গানে দাও খুলে মোর  
হৃদয় দুয়ারটিরে ।  
আসুক আলো, আসুক হাওয়া  
আঁধার মিলাক দূরে ।

কুলিশ কঠোর আঘাত হানি  
দাও ভেঙে গো আগলখানি  
মুক্ত প্রাণে তোমার বাণী  
শোনাও ধীরে ধীরে ॥

তোমারই গান তোমার কথা  
মুছাক আমার সকল ব্যথা  
মনের মলিন আবিলতা  
ধোয়াও নয়ন নীরে ॥

বনের বিহগ যে গান গাহে  
ব্যাকুল পবন সে গান বহে

সে গান যেন সদাই রহে  
আমার জীবন ঘিরে॥

১০

দুখের দিনে শুধু ডাকি হে তোমারে  
সুখের দিনে ভুলে যাই।  
দুঃখ পেলে দুষি ভাগ্যবিধাতারে  
সুখে করি পৌরষের বড়াই॥

দুখের অঞ্চলীরে বক্ষ যায় ভেসে  
সুখের দিন কাটে শুধু হেসে হেসে।  
কেন দুখে সুখে বিষাদে হরয়ে  
তোমারে হৃদয়ে নাহি পাই॥

পারের আশায় বসি খেয়াধারে  
পার কর বলি ডাকি কাঞ্চীরে  
পারে গিয়ে তারে ভুলি একেবারে  
রাহি না তিলেক ধরি ঠাই।

দুখে যদি তোমায় পাই হে মরমে,  
দুঃখ দিও আমায় জনমে জনমে  
চাহি না সে সুখ জীবনে মরণে  
যে সুখের মাঝে তুমি নাই॥

১১

মন রে আমার কোথায় রে তোর ঘর  
আমি তোরই পিছে মিছে ঘুরি নিরস্তর॥

তুই কোন দেশেতে বেঁধে বাসা  
কোথায় করিস যাওয়া আসা  
ঘুরিস রে তুই কিসের আশায়  
দেশ দেশাস্তর॥  
তুই রবি-শশী গ্রহ-তারায়  
ছুটিস একা একা  
আমি সারাজীবন পিছন ধেয়ে  
পেলাম না তোর দেখা  
ও রে অবুব জানাই তোরে

এবার আয় ফিরে তোর আপন ঘরে  
 রইব মোরা প্রীতির ডোরে  
 বেঁধে পরম্পর॥

১২

যেন কতকালের ভালবাসা  
 আছে রে তার সাথে  
 তাই সাথে সাথে ফেরে আমার  
 সুখে দুখে দিন রাতি ।

সে যেন মোর কত চেলা  
 সদাই করে আনাগোনা গো  
 হৃদয় মাঝে বাজায় বীণা  
 আমার ব্যথা বেদনাতে॥

হয়ে আমার পথের সাথী  
 আমার আঁধার পথে জুলায় বাতি গো  
 তার মতো আর ব্যথায় ব্যথী  
 কেবা আছে এই ধরাতে॥

তারে দেখতে নারি ধরতে নারি  
 সে খেলে সদাই লুকোচুরি গো  
 মিছে বাইরে তারে ঝুঁজে মরি  
 সে থাকে মোর অন্তরেতে॥

## তথ্যনির্দেশ

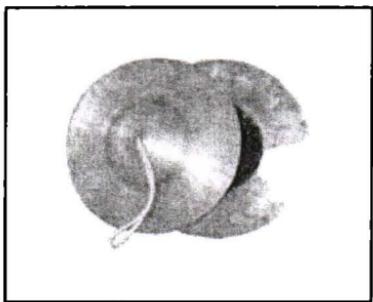
১. গীতিকার গোলাম মুহাম্মদ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, সরকারি পঞ্চিম সেনের চর প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাজিরা, শরীয়তপুর, ১১ ডিসেম্বর ২০১২
২. গীতিকার গোলাম মুহাম্মদ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, সরকারি পঞ্চিম সেনের চর প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাজিরা, শরীয়তপুর, ১১ ডিসেম্বর ২০১২
৩. শরীয়তপুর জেলার কলেশ্বর নিবাসী আবদুর রশিদ সাহেবের নিকট থেকে 'সুরত লালের জারি' সংগ্রহ করেছিলেন বাংলা একাডেমির নিয়োজিত সংগ্রাহক গোপালগঞ্জ জেলা রাজপাট নিবাসী মো. নূরুল হক মোস্তা।
৪. মফিজুল ইসলাম, কবিকুঞ্জ, সৰ্বংঘোষ, পালং, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১১
৫. মফিজুল ইসলাম, কবিকুঞ্জ, সৰ্বংঘোষ, পালং, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১১
৬. মফিজুল ইসলাম, কবিকুঞ্জ, সৰ্বংঘোষ, পালং, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১১

৭. মফিজুল ইসলাম, কবিকুণ্ঠ, বর্ণঘোষ, পালং, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১১
৮. মফিজুল ইসলাম, কবিকুণ্ঠ, বর্ণঘোষ, পালং, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১১
৯. মফিজুল ইসলাম, কবিকুণ্ঠ, বর্ণঘোষ, পালং, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১১
১০. শ্যামসুন্দর দেবনাথ, পালং, শরীয়তপুর, ১৭ ডিসেম্বর ২০১১
১১. গীতিকার গোলাম মুহাম্মদ, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, সরকারি পঞ্চিম সেনের চর প্রাথমিক বিদ্যালয়, জাঙ্গিরা, শরীয়তপুর, ১১ ডিসেম্বর ২০১২
১২. সংগ্রহ-স্তূতি, রহিমা বেগম, মাতা কাজল রেখা, পিতা নুরুল হক সর্দার, কুন্দুকর, পালং, শরীয়তপুর, ১২ ডিসেম্বর ২০১১ [কবি রঞ্জনা বিশ্বাসের মাধ্যমে সংগৃহীত]
১৩. সংগ্রহস্তুতি: বাবুল মাঝির বাড়িতে তার বড় মেয়ে শারমিন আক্তারের গায়ে হলুদ এবং বিয়ের অনুষ্ঠান, ছত্রমুড়িয়া, ছয়গাঁও, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর, ২৭ নভেম্বর ২০১১ এবং ২৮ নভেম্বর ২০১১

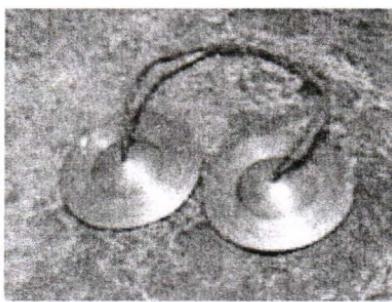
## ଲୋକବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ର

ଶ୍ରୀଯତପୁର ଅଥ୍ୱଳେ ଯେ ସମ୍ମ ଲୋକବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟେ ରଖେଛେ ଏକତାରା, ଦୋତରା, ସାରିନ୍ଦା, ବାଁଶି, ଶଞ୍ଚ, ମନ୍ଦିରା, କରତାଳ, ଢାକ, ଢୋଲ, ଡୁଗଡୁଗି, ବମକ, ଖଞ୍ଜନି ଇତ୍ୟାଦି । ହାରମୋନିଆମ କିଂବା ତବଲାକେ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ର ହିସେବେଇ ଚିହ୍ନିତ କରା ଯାଏ । ଲୋକବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ରଙ୍ଗଳେ ଯେ ଏଲାକାରରେ ହୋଇ ତାର ଉପକର ଏକଇ । ଶ୍ରୀଯତପୁର ଜେଲାର ଲୋକବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ରର ନିଜସ୍ତ୍ର କୋନୋ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ । ସାରାଦେଶେର ମତୋ ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଙ୍ଗଳେଇ ଏଥାନେ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ । କହେକଟିର ବିବରଣ ଦେଉଯାଇଲୋ:

**କରତାଳ ଓ ମନ୍ଦିରା :** ଏଟି ପିତଳେର ତୈରି । ଦେଖିବେ ଦୁଟି ଥାଲାର ମତୋ । ପ୍ରତିଟି ଚାକତିର ଠିକ ମାଝଖାନେ ଛିଦ୍ର କରେ ସୃତା ଚୁକିଯେ ତା ଆଙ୍ଗୁଲେ ପେଂଚିଯେ ଏକଟିର ସଙ୍ଗେ ଆରେକଟିର ଆଘାତ କରେ ବାଜାନୋ ହୁଏ । ଖେଲାର ମାଠେ ବା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରାଶାଯ ଏକସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାତ୍ରାର ସମୟ ଏଟି ବାଜାନୋ ହୁଏ । ଏର ଛୋଟ ଆକାରଟିକେ ମନ୍ଦିରା ବଲେ । ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ତାଦେର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ପୂର୍ଜାର୍ଚନା କରାର ସମୟ ମନ୍ଦିରା ବାଜିଯେ ଥାକେ । କରତାଳକେ କଥନ୍‌ସ୍ଟଟାଲ, ଘଟତାଳ, କରତାଳି ଇତ୍ୟାଦି ନାମେଓ ଡାକା ହୁଏ ଥାକେ ।



କରତାଳ



ମନ୍ଦିରା

**ମୃଦୁଙ୍କ:** ମୃ+ଅଙ୍ଗ=ମୃଦୁଙ୍କ । ଏର ମୂଳ କାଠାମୋ ତୈରି ହୁଏ ମାଟି ଦିଯେ । ବାଦିକେର ଆଯତନ ଡାନେର ଆଯତନେର ଦିଗୁଣ । ଡାନ ଦିକେ କ୍ରମଶ ସରକ ହତେ ଥାକେ, ଭେତରେର ଅଂଶ ଫାପା । ନଳାକୃତିର ଦୈହିକ କାଠାମୋର ଦୁ'ପାଶେ ଚାମଡ଼ା ଲାଗାନୋ ଥାକେ । ଚାମଡ଼ାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର ସଙ୍ଗେ ଲାଗାନୋ ଥାକେ ଫିତା ଜାତୀୟ କତଙ୍ଗଳେ ସବୁ ଚାମଡ଼ା ଯେଗୁଲାକେ ଟେନେ ସୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ହୁଏ ଥାକେ ।

**କାଂସର:** ଏ-ଅଥ୍ୱଳେ ପ୍ରଚଲିତ ଏକଟି ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ର । ଏଟି ଏକଟି ଧାତବ ବାଦ୍ୟସ୍ତ୍ର, ଯା କାଂସି ନାମେଓ ପରିଚିତ । ଏ-ସ୍ତ୍ରିଟିର ଏକଟି ଅଂଶ ଥାକେ ଧାତବ ଥାଲାର ମତୋ

অন্য অংশটি ভেতরের দিকে বাকানো থাকে। একটি মোটা সুতার নেতি দিয়ে একে বেঁধে রাখা হয়। এর সঙ্গে থাকে একটি মোটা মাথাওলা ছোট কাঠের দণ্ড। এটি দিয়ে যন্ত্রটির পিঠে আঘাত করা হলে শব্দ হয়। গ্রামীণ লোকবাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে কাঁসার বাদ্যযন্ত্র বা কাঁসার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়।

**একতারা:** একটি মাত্র তারে আঘাত করে যে যন্ত্রে সুর সৃষ্টি করা হয় একতারা বলা হয়। একটি পাকা লাউয়ের বস শুকিয়ে নিয়ে উপরের অংশ চামড়া দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। তারপর একটি চিকন বাঁশের দণ্ডের এক প্রাণ দুফালি করে কেটে দুইপাশে লাগাতে হয়। তারপর তার লাগাতে হয়। ডানহাতের আঙুল দিয়ে তারে আঘাত করে সুর সৃষ্টি করা যায়।

**আড়বাঁশি:** এটি বহুল পরিচিত এবং প্রচলিত লোকবাদ্যযন্ত্র। এটি তৈরি হয় বাঁশ থেকে। কয়লার আগুনে লোহার শিক পুড়িয়ে তৈরি করা হয় বাঁশের গায়ে ছিঁড়ি। তারপর গায়ে নানা প্রকার কাপড়ের নেকড়া পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় আড়বাঁশি। নকশা আকার পর এর গায়ে বার্নিশ করা হয়। বার্নিশ করার মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাঁশি তৈরি হয়। আড়বাঁশিকে অনেক স্থানে মূলী বাঁশিও বলে থাকে।

**চোল:** বহুল ব্যবহৃত ও সুপ্রচলিত লোকবাদ্যযন্ত্র। কাঠের গোলক আকৃতির ফাঁপা বাদ্যযন্ত্র। এর দু'পাশে চামড়া লাগানো থাকে। চোলের বেশ কয়েক প্রকার জাত লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র চোলেরই নব্য সংস্করণ বাংলা চোল। এটি কাঠের ফাঁপা খোলের দু'পাশে চামড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। বাংলা চোলের কাঠামোর ব্যাস প্রায় ১৮ ইঞ্চি হয়ে থাকে এবং প্রাপ্তি (বেড়া) ৫৫ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্যে ২৫ ইঞ্চি হয়ে থাকে।

**নাল:** প্রাচীনতম লোকবাদ্যযন্ত্র চোলের নব্য সংস্করণ নাল। ফাঁপা কাঠের গোলকের দু'পাশে চামড়া বাঁধাই থাকে। যেখানে আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয়। বাংলা চোল থেকে এই চোলের একটা আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নালের ব্যাস ৮ ইঞ্চি, এর বেড়া ৩৫ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘ্য সাধারণত ৩৫ ইঞ্চি হয়ে থাকে। তবে কোথাও কোথাও নালে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেড়ের তারতম্য লক্ষ করা যায়।

**ঢাক:** গ্রামীণ লোকবাদ্যযন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্র হল ঢাক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পূজাপার্বণ বিশেষ করে দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি পূজায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢাকের ব্যবহার চোখে পড়ে, মূলত ঢাক ব্যতীত এসব লোকউৎসবগুলো নিতান্ত সাদামাটা উৎসবে পরিণত হয়।

**খমক:** বাউল সংগীতের একটি অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র হিসেবে খমক বেশ সুপরিচিত। বাউল/বয়াতি নিজেই এই যন্ত্রটি বহন করে থাকেন। এবং সংগীত পরিবেশনের সময় নিজেই এই যন্ত্রটি বাজিয়ে থাকেন। কাঠের তৈরি ফাঁপা একটি কৌটার মতো আকার তৈরি করা হয় তারপর এক পাশে চামড়া লাগিয়ে এর মাঝখান থেকে সূতা বেঁধে সুতায় আঙুল নাড়িয়ে শব্দ তৈরি করা হয়।

## লোকউৎসব

অনাদিকাল থেকে নবাঞ্জ, বৈশাখী উৎসব, হালখাতা প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ লোকউৎসব শরীয়তপুরে উদ্যাপিত হয়। এর বাইরে রামঠাকুরের আশ্রমের উৎসব, সুরেশ্বরী মাজারসহ বেশ কয়েকটি মাজার ঘিরে বেশ কিছু উৎসব উদ্যাপিত হয়।

### বৈশাখী উৎসব

বৈশাখ মাসে এ-উৎসব উদ্যাপিত হয়ে থাকে। শরীয়তপুরের বিভিন্ন এলাকায় মজার মজার খাবার তৈরি হয়। নতুন পোশাক পরে লোকজন বৈশাখী উৎসব পালন করে থাকে। ভেদেরগঞ্জ, বৃত্তিরহাট, গোসাইরহাট, কার্তিকপুর প্রভৃতি এলাকায় বৈশাখী মেলা বসে। মহিমারের দিগন্ধরী দিঘির পাড়ের বৈশাখী মেলা এই জেলার সবচেয়ে বড় মেলা।

### নবাঞ্জ

এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন লোকউৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ফসল ঘরে তোলার পর ঘরে ঘরে নানা ধরনের পিঠা পায়েস তৈরির ঐতিহ্য চোখে পড়ে। নতুন ধানের গক্ষে বাড়ি মৌ মৌ করে, লোকজন পিঠা-পায়েস রান্না করে এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে তা বিতরণ করে থাকে। নবাঞ্জের সময় বাড়িতে জামাই আনা হয়।

### পৌষ সংক্রান্তি

বাংলা পৌষ মাসের শেষ দিন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন পৌষ সংক্রান্তি উদযাপন করে থাকে। এদিন লোকজন পিঠাপায়েস তৈরি করে বাড়ি বাড়ি। অন্নবয়স্ক ছেলেমেয়েরা এদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে পুরুরে মান সেবে আগুন পোহায়। এ-আগুন পোহানোর অনুষ্ঠানকে মাঘ ম্রান বলে। মাঘ ম্রান শেষে সবাই পিঠা পায়েস খায় মহিলারা দুপুরে লক্ষ্মীদেবীর পূজার্চনা করে, বাড়ির উঠানে বা মেঝেতে আলুনা আঁকে। এ-দিন প্রতিটি হিন্দু বাড়িতে বাঙালি খাবার পরিবেশন করা হয়।

### চৈত্র সংক্রান্তি

চৈত্র সংক্রান্তি বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের একটি বিশেষ লোকউৎসব। এদিন বাড়ি বাড়ি নাড়ু তৈরি করে। নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার কোনো প্রকার কমতি লক্ষ করা যায় না। দুপুরে সবাই দুধ, দই, চিড়া, মুড়ি, মিষ্টি খেয়ে থাকে। আগে চড়কপূজার প্রচলন থাকলেও এখন আর তা নেই।

## হালখাতা

সারা বছরের হিসাব চুকিয়ে নতুন বছরের নতুন খাতা খোলার উৎসবকে হালখাতা বলা হয়। ব্যবসায়ীরা এটি করে থাকে। ব্যবসায়ীগণ বছরের যাবতীয় লেনদেন মিটিয়ে আগামী বছরের জন্য তাদের সম্পর্ক আটুট রাখার লক্ষ্যে লাল পেড়ে কাপড়ে বাঁধানো মলাটো তৈরি খাতায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে রাখে। মিষ্টিমুখ করায় তার নিম্নলিখিত অতিথিদের। অতিথিবন্দও অনেক সময় তার জন্য নানা প্রকার উপহার নিয়ে আসে। এভাবে বিক্রেতাদের সঙ্গে তাদের পুরনো যাবতীয় লেনদেন মিটিয়ে ক্রেতারা নতুন সম্পর্কের বক্ষনে জড়িয়ে পড়ে।

## ঈদ উৎসব

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা। রমজান আসে এখানে মুসলিম সমাজে বিরাট আয়োজন নিয়ে। রমজানে ধর্মী-গরিব সব পরিবারে ইফতার এবং সহস্রার জন্য আয়োজন থাকে। দেশি ও বিদেশি কাপড়ের সমারোহ, আলোকসজ্জা দোকানগুলোকে উৎসবের আমেজে সাজিয়ে তোলে। ঈদের এক সন্তান আগে ভিড় জমে পাজামা পাঞ্জাবি, জুতার দোকান আর মনোহারি দোকানে। ঈদের দিন নামাজ শেষে কোলাকুলি আর এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে ছেলে-বুন্দ সবাই দিনটিকে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে। কোরবানির ঈদে স্থানে স্থানে গরম বাজার বসে। কোরবানির চামড়া কেউ বিক্রি করে আর কেউ মাদ্রাসা বা এতিমখানায় দান করে দেয়। কোরবানির ঈদের দিন গরিব মানুষের ঘরেও প্রচুর কোরবানির মাংস যায়। নানারকম খাবারে প্রতিটি পরিবারে আমন্ত্রিত হয় প্রতিবেশি, আজীয়-স্বজন।

সুরেশ্বরী পিরের অনুসারীরা সৌন্দি আরবের সঙ্গে ক্ষণ মিলিয়ে একদিন আগে রোজা রাখে এবং একদিন আগে ঈদ উদ্যাপন করে। জেলার ৪ উপজেলার ৩০টি গ্রামে আগাম ঈদুল আজহা পালন করেন। অন্তত ১০ হাজার ভক্ত এ ঈদের নামাজে অংশ নেয় বলে। মুরিদ আবদুল আলিম চৌকিদার জানান, সৌন্দি আরবের সঙ্গে মিল রেখে প্রায় একশ' বছর দরবারের সব ভক্ত ও তাদের মুরিদানেরা একই নিয়মে ঈদ উৎসব করে। নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বর, চাঁপুর, ইছাপাশা, ঘড়িবার, কদম্বগঠী, বালাখানা, নশাসন, ভূমখারা, ভোজেশ্বর; জাজিরা উপজেলার কালাইখার কান্দি, মাদবর কান্দি, সদর উপজেলার বাধিয়া, কোটাপাড়া, বালাখানা, প্রেমতলা, ডোমসার, শৌলপাড়া; ভেদরগঞ্জ উপজেলার লাকার্তা, পাপরাইল ও চৰাখগ্লের ১০টি গ্রামসহ প্রায় ৩০টি গ্রামের অন্তত এক হাজার পরিবারে মানুষ আগাম ঈদে অংশ নেয়।

## ওরশ

অলি ও দরবেশের মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে যে দোয়া ও জেয়াফতের আয়োজন করা হয় তাকে ওরশ বলে। ওরশ শরীয়তপুরে লোকজীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওরশ সাধারণত মসজিদ ও মাজারকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত শীতকালেই ওরশ বেশি সংঘটিত হতে দেখা যায়। নড়িয়ার প্রায় সর্বত্রই বার্ষিক ওরশ শরিফ দোয়া

মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ-ধরনের ওরশে সন্ধ্যা থেকেই ওয়াজ মাহফিল শুরু হয় এবং প্রায় সারারাত ধরে চলে। ওরশের আশপাশের রাস্তায় লোকজ খাবার দাবার ও মেয়েদের পরিধেয় অলঙ্কারের দোকান বসে। সাধারণত শেষ রাত থেকে ওরশের খাবার পরিবেশন শুরু হয়, কোথাও বা সকালে খাবার দেয়া হয়।

### **লোকজ সংস্কৃতি রক্ষার হানীয় উদ্যোগ**

শরীয়তপুরের পালং তুলাসার গুরুদাস উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কবি রহস্যন্ধুকান্ত ঘটকচৌধুরী সন্তাহব্যাপী কৃষি ও শিল্প মেলা এবং সাংস্কৃতিক উৎসব হয়।<sup>১</sup> এর ফলে আবদুল হালিম বয়াতি, হাজেরা বিবি ও সাকিমালী বয়াতি ঢাকা বেতারে গান গাওয়ার সুযোগ পান। ইচ্ছ.এস সিরাজ উদ্দিন, এ.কে.এম. নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মো. মেঘাই সরদার, অকবর মাদবর, আব্দুল কাদির ঢালী, আবুল কাশেম খান, আব্দুল জব্বার বেপারী প্রমুখ ব্যক্তি এই উৎসব আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।<sup>২</sup>

২০০৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর কবি মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে শরীয়তপুর কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে দিনব্যাপী মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও উৎসবের আয়োজিত হয়। হানীয় শিল্পী মিজানুর রহমানের মফিজুল ইসলামের জারিগান ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পীদের কঠে জারি-সারি-ধূয়া গান, পুঁথিপাঠ, পল্লীগান্তি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, সুরেশ্বরী, মাইজভাওয়ারী, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত, গণসংগীত, মেয়েলি গান ও লোকনাটক পরিবেশিত হয়।<sup>৩</sup> জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও পৌরসভার মেয়র মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রব মুস্তী এই উৎসব উদ্বোধন করেন। কবি হাবিবউল্লাহ সুজন, কবি গেরিলা আজাদ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ সিকদার, মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রহমান খান, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ তালুকদার, মাস্টার সুশীলচন্দ্র দেবনাথ, মাস্টার শ্যামসুন্দর দেবনাথ, ডাক্তার নজরুল ইসলাম রিপন, আজিজুর রহমান রোকন, কবি কহিনুর ইসলাম, কবি শাহনাজ লুনা এ উৎসব আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।<sup>৪</sup>

২০১০ সালের ৬ আগস্ট কবি মফিজুল ইসলাম শরীয়তপুর পৌরসভা মিলনায়তনে ‘লোকজ সংস্কৃতি: ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, প্রেক্ষাপট শরীয়তপুর’ শিরোনামে দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করেন। পৌরসভার মেয়র আবদুর রব মুস্তী এ সেমিনার উদ্বোধন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শরীয়তপুর সাহিত্য একাডেমির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজালাল মিয়া। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রভাষক পলাশ রাউত। বাংলা একাডেমির উপপরিচালক কবি তপন বাগচী প্রধান আলোচক ছিলেন। কবি মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে গোসাইরহাট উপজেলা চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান ঢালী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে, মুক্তিযোদ্ধা মো. খালেকুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন।<sup>৫</sup> অনুষ্ঠান সম্পত্তিগুলো করেন কবি খান মেহেদি মিজান। নাট্যামোদী ডা. আব্দুল মান্নান, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ সিকদার, আবদুর রহমান খান, শ্যামসুন্দর দেবনাথ, অ্যাডভোকেট আলমগীর মুস্তী, কবি কামাল মল্লিক, কবি কোহিনুর ইসলাম, শিল্পী আব্দুল আজিজ দেওয়ান ও সামসুন্দোহা খোকন, সুশীলচন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ এ সেমিনারে যুক্ত ছিলেন। সেমিনারে হানীয় শিল্পীরা

শরীয়তপুরের আঘঢলিক গান পরিবেশন করেন। একই বছর ২৫ ডিসেম্বর শরীয়তপুর কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে কবি মফিজুল ইসলামের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও উৎসব হয়। তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী এ উৎসব উদ্বোধন করেন। পৌরসভার মেয়ার আব্দুর রব মুস্তির সহযোগিতায় এই উৎসবে জেলার বিভিন্ন লোকসংগীত পরিবেশিত হয়। কবি মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক কাজী নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় শরীয়তপুর সাহিত্য একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ মাস্টার উৎসবে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। মো. শাহজালাল মিয়া, শ্যামসুন্দর দেবনাথ, আব্দুল আজিজ সিকদার, আব্দুর রহমান খান, কবি গেরিলা আজাদ, অ্যাডভোকেট আলমগীর মুস্তি, কবি খান মেহেদি মিজান, সুশীলচন্দ্র দেবনাথ, এসএম শফিকুল ইসলাম স্বপন ও কবি কামাল মল্লিক এ উৎসব আয়োজনে অঞ্চলী ভূমিকা পালন করেন।<sup>১</sup>

২০১২ সালে রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার বাউলদের ওপর দুর্বলের বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে শরীয়তপুরে মুক্তিযোদ্ধা কবি মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বাউল-কবি-শিল্পী-শুভানুধ্যায়ীদের সমষ্টয়ে মিছিলটি জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং স্থানীয় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে গিয়ে সমাবেশ হয়। এতে শরীয়তপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড শফিউল বাশার স্বপন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে, কবি গেরিলা আজাদ, বাউল আব্দুল আজিজ দেওয়ান, ‘ভাবনার কাশবন’ পত্রিকার সম্পাদক এস এম শফিকুল ইসলাম স্বপন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন কবি মফিজুল ইসলাম। শেষে প্রতিবাদী লোকসংগীত পরিবেশিত হয়।

## তথ্যনির্দেশ

১. সাক্ষাত্কার, এসএম শফিকুল ইসলাম স্বপন, সম্পাদক, ভাবনার কাশবন, শরীয়তপুর, ১৪ ডিসেম্বর ২০১২
২. সাক্ষাত্কার: আব্দুস সামাদ তালুকদার, সভাপতি, শরীয়তপুর রিপোর্টার্স ইউনিটি, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১২
৩. সাক্ষাত্কার: আব্দুল আজিজ সিকদার, উপজেলা কমাত্তার, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শরীয়তপুর, ১৫ ডিসেম্বর, ২০১২
৪. সাক্ষাত্কার: আব্দুর রহমান খান, সহকারি কমাত্তার, সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শরীয়তপুর, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২
৫. সাক্ষাত্কার: মাস্টার শ্যামসুন্দর দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক, রয়ীন্দ্র সাহিত্য পরিষদ, শরীয়তপুর, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২
৬. সাক্ষাত্কার: মাস্টার সুশীলচন্দ্র দেবনাথ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, পালং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মোঃ মিজানুর রহমান খান, সাধারণ সম্পাদক, নজরুল সংগীত শিল্পী পরিষদ, শরীয়তপুর, ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২

## লোকাচার

শরীয়তপুর অঞ্চলে কিছু নির্দিষ্ট লোকাচার রয়েছে। অঞ্চলভেদে এই সকল লোকাচারের রূপ বদলে যায়। কিছু সাধারণ আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে যা বিভিন্ন জেলায় একই রকমভাবে উদ্যাপিত হয়। সাধারণ, আকিকা, সুন্তে খঁনা, অন্নপ্রাশন, বৃষ্টি নামানো, গৃহপ্রবেশ, খিলাদ, মানত করা, সই পাতানো, হালখাতা ইত্যাদি এ-এলাকার প্রধান লোকচার। এছাড়া সৈদ, পূজা, বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি উপলক্ষ কেন্দ্র করে নানান আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

### ১. হালখাতা

আগেকার দিনে রাজা ও জমিদারগণ খাজনা আদায়ের জন্য পৃণ্যাহ পালন করতো। এদিন সাধারণ প্রজাগণ জমিদারের কাছারি বাড়িতে এসে জলপান, মিষ্টিমুখ করতেন এবং খাজনা প্রদান করতেন। এই রীতি থেকেই হালখাতার প্রচলন হয়েছে। পৃণ্যাহের অস্তিত্ব এখন নেই, তবু হালখাতাকে নড়িয়ায় এখনো পৃণ্যাহ নামেই ডাকা হয়। বর্তমান ব্যবসায়ী ও দোকানমালিকগণ খন্দেরদের নিকট থেকে তাদের পাওনা আদায়ের জন্য হালখাতা খুলে থাকেন। খন্দেরকে আলপনা করা চিঠিতে দাওয়াত দেওয়া হয়।

সাধারণ বাংলা বা ইংরেজি বছরের প্রথম দিকেই হালখাতার আয়োজন করা হয়। তাই এ-জাতীয় পঙ্কজি লেখা থাকে। এদিন দেনাদার ক্রেতাগণ তাদের সমুদয় পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। দোকান মালিক তাদের আপ্যায়নের জন্য বিভিন্ন রকম মিষ্টান্নের ব্যবস্থা রাখেন। আজকাল অনেকেই বিরিয়ানি খাওয়াতে দেখা যায়। ব্যবসায়ীগণ এদিন মাইকের মাধ্যমে মারফতি, দেহতন্ত্র, জারি, নারী পুরুষকেন্দ্রিক বিচার গান ইত্যাদির অডিও বিনোদনের ব্যবস্থা করেন।

### ২. সাধারণত

নড়িয়ার আঞ্চলিক ভাষায় একে হাদি বা সাধী বলা হয়। সাধারণত সাত মাসের গর্ভবতী নারীকে নিয়ে এই আচার গড়ে উঠেছে। তবে তা ৮ বা ৯ মাসেও হয়ে থাকে। এই লোকাচারটি অধিকাংশ জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে অঞ্চলবিশেষে এর নিয়মনীতিতে ভিন্নতা যুক্ত হয়ে থাকে। এ-আচার পালনের দিন গর্ভবতী নারীর সাধ বা ইচ্ছানুযায়ী খেতে দেওয়া হয়। ৭ মাসের পর সাধ খাওয়ানো চলে বটে, তবে এতে মেয়েপক্ষের মান থাকে না। এজন্য শ্বশুরবাড়ির মানুষের কটু কথাও শুনতে হয়। অনুষ্ঠানটি হয় মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে। সাধারণত সমুদয় উপকরণ নিয়ে মেয়ের বাবা-মা ও আত্মীয়দেরকে নিয়ে মেয়ের জামাইবাড়িতে গিয়ে হাজির হতে হয় সস্তানবতী।

নারীকে উঠানের এক জায়গায় নতুন পাটিতে বসানো হয়। ৭ বা ততোধিক পদের ফল-ফলাদি, নাস্তা, হরেক রকমের মাছ, মাংস, ভর্তা, ইত্যাদি তার সামনে রাখা হয়। অনেক সময় ধাইরা এ-আয়োজন ও খানা পিনার অংশীদার হয়। গর্ভবতীকে ইচ্ছানুযায়ী খাওয়ানো হয়। অন্যরাও এ-খাবার খায়। শিশুদেরও এ-খাবার খাওয়ানো হয়। খাবারের মধ্যে টক জাতীয় খাবার থাকে, থাকে মিষ্টান্নও। শিশুর মঙ্গল কামনা এবং গর্ভবতীর ইচ্ছাপূরণ এ-দুটিই এ-অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। মনে করা হয় সাধভক্ষণ না খাওয়ালে সন্তান লোভী ও অসংযমী হবে। এ-অনুষ্ঠানে আর্থিক সামর্থ্য (মেয়ের অভিভাবকের) অনুযায়ী খরচ করা হয়। গরিব বাবা মাও এটি পালনের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেন। সন্তান খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাবে না মনে করেই এটি পালিত হয়। তবে এর একটি বৈজ্ঞানিক দিক রয়েছে। এভাবে খাওয়ালে তা থেকে গর্ভস্থ শিশু পুষ্টি পায়। কবি মুকুন্দরাম চক্ৰবৰ্তীর চতুরঙ্গল কাব্যে সাধভক্ষণের বিবরণ রয়েছে।

### ৩. করণক্রিয়া

শ্রীয়তপুরে সন্তানের বা পরিবারের কল্যাণ কামনায় মাজারে বিশ্বাস স্থাপন করে সেখানে মানত করে। মানত ফলুক বা না ফলুক তা রক্ষা করা তখন সবার কর্তব্য হয়ে যায়। শ্রীয়তপুরের অধিকাংশ মান হয় মাজারকেন্দ্রিক। গাছের প্রথম ফলটা মাজারে দেয়া হয়। বিশ্বাস এতে গাছে প্রচুর ফল হবে এবং ফল পুষ্টি হবে। ব্রত, চড়ক জামাইষষ্ঠী সাতশা, ভোগ এসব সনাতন হিন্দু সমাজের করণক্রিয়ার অংশ। প্রতি শনিবারে শনিপূজা দিয়ে শনির দশা থেকে মুক্তি কামনা করা যায়। প্রতিবছর চড়ক পূজা হয় তৈত্র মাসে। লক্ষ্মীর ব্রত সারা বছরই কর। জামাইষষ্ঠীর প্রচলন রয়েছে। শ্যালিকা ও শুশুরবাড়ি আত্মীয় স্বজনের জন্য নতুন কাপড় চোপড় নিয়ে যায়। সঙ্গে নিতে হয় ফল ও যষ্টি। ইত্যাদি। শুশুর শাস্ত্রড় ও মেয়ে, মেয়ে জামাইসহ নাতি নাতনীকে নৃতন কাপড় দিয়ে আশীর্বাদ করে। এদিন শুশুর বাড়িতে খুব ভাল খাবারের আয়োজন হয়। এ-ছাড়া হয় বিপদনশিনী ব্রত, মনসাৰ পুঁথিপাঠ হয়। পুঁথিপাঠ শেষে হয় গীত। তারপর ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

### ৪. মিলাদ

মিলাদ গ্রামীণ মুসলিম সমাজের একটি অন্যতম লোকাচার। নতুন ঘরে বসবাস শুরু, রোগ থেকে মুক্তির কামনায় মিলাদ দেওয়া হয়। ধর্মীয় কর্তব্যবোধ থেকেও মানুষ এটি সময়ে সময়ে আয়োজন করে থাকে। শিশু জন্মের পাঁচদিনের অনুষ্ঠান, মুসলমানি (সুন্নতে খৎনা) অনুষ্ঠান, হালখাতা অনুষ্ঠান, মৃত্যুর চালিশা পালন কিংবা কোন সফলতা লাভ বা সফলকাম হওয়ার প্রার্থনা জানানোর ভাষা হিসেবে মিলাদ পড়ানো হয়।

## ৫. অশৌচ

শিশুজন্মের ৫ দিন পর্যন্ত অশৌচ মনে কা হয়। এই সময়ে বাইরের কাউকে প্রসূতি মাসের কাছে যেতে দেওয়া হয় না এবং সন্তানকেও দেখতে দেওয়া হয় না। ষষ্ঠি দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে আউজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি নবজাতককে সাদরে বরণ অনুষ্ঠান। নবজাতকই এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করেই সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়। গ্রামে সাধারণত ছোট একটি ঘরে মাকে রাখা হয় সন্তান জন্মদানের জন্য। একে আতুর ঘর বলে। এদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুকে বড় ঘর বা শোবার ঘরে তোলা হয়। এদিনই শিশুর চুল প্রথম বারের মতো কাটা হয়। আগের দিনে সাধারণত বাড়িতে নাপিত এনে এ-চুল কাটানো হতো। ষষ্ঠি দিনে এই অনুষ্ঠান হয় বলে একে ‘ছয় হইলঠা’ও বলা হয়। এদিন গ্রামের লোকজন এবং আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়ে। তাদের পান ও মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

## ৬. ব্রত-পার্বণ

এ-অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে ব্রত-পার্বণ পালনের সংস্কৃতি প্রচলিত আছে। কয়েকটি ব্রত পার্বণের বিবরণ তুলে ধরা হলো—

**মঙ্গলচন্তী ব্রত:** জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রত পালন করা হয়। ঠাকুর পুরোহিত দিয়ে এ-ব্রত করার বিধান আছে। এতে ব্রতকথা শুনতে হয়। ব্রতের উপকরণ ১৭টি সুপারি, ধান, দুর্বা, ফুল, পাকা আম, কঁঠাল, পৈতে ইত্যাদি।

**শিবরাত্রির ব্রত:** আষাঢ় মাসের শুক্লা তৃতীয় নবমী তিথির শনি বা মঙ্গলবারের এই ব্রত করতে হয়। ঘট স্থাপন করে তাতে আমপাতা দিয়ে এই ব্রত করতে হয়। ব্রতে পুরোহিত লাগে।

**সত্যনারায়ণ ব্রত:** এই ব্রতের কোনও তিথি নক্ষত্রের নিম্নে নেই। যে কোনো লোক প্রদোষ কালে এই ব্রত করতে পারে। পূর্ণিমা বা সংক্রান্তিতে উপবাস থেকে এই ব্রত পালন করা হয়।

**শনিদেবের ব্রত:** শনিবার সন্ধ্যায় উঠানে এই ব্রত করা হয়। এতে সত্যনারায়ণ ব্রতের মতো প্রসাদ দেওয়া হয়ে থাকে। সারাদিন উপবাস থাকার পর সন্ধ্যায় শনিদেবের পূজা শেষে ব্রতকথা শুনে প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়।

**জন্মাষ্টমীর ব্রত:** তত্ত্ব মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির জন্মাষ্টমী ব্রত করতে হয়। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই ব্রত করতে পারে। ব্রতের আগেরদিন নিরামিষ খেয়ে সংযমী হয়ে থাকতে হয়। ব্রতের পুরোহিত দিয়ে পূজা করিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়।

## ৭. মনসা পূজা

মনসা পূজার জন্য মাটির প্রতিমা বানানো হয়। অনেক জায়গায়ই দেখা যায় ঘটে কিংবা পটেও মনসা পূজা হয়। বর্ষাকাল সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে বলে সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে এই সময় মনসা পূজা হয়। শ্রাবণ মাসের নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসা পূজা হয়। শরীয়তপুরে অঞ্চলে মনসা পূজা প্রতিমা ও ঘটে দু'ভাবেই

হয়ে থাকে। শরীয়তপুরের পালং থানায় ধানুকা মনসাবাড়িতে বেশ ঘটা করে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই বাড়ির মনসাপূজা খুবই ঐতিহ্যবাহী। বাংলাদেশে বরিশালে মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুণ্ডের বাড়ির মনসামন্দিরের পরে বেশ খ্যাতি এই ধানুকার মনসামন্দিরের পূজার।



ধানুকা মনসা বাড়ির মনসা পূজা মন্দিরে পূজা দিচ্ছেন তিনু ঠাকুর

## ৮. ত্রিনাথের মেলা

ধারণা করা হয় ত্রিনাথের মেলার শুরু এই শরীয়তপুর জেলার নবিপুর গ্রাম থেকে। ফরিদপুরের ইতিহাস লেখক আনন্দনাথ রায় তেমনই বলেছেন। শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে এই ত্রিনাথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত গৃহপালিত গাভীর প্রথমবার বাচ্চা হলে এই মেলা হয়। গাভীর দুধ প্রথমে বাছুর ছাড়া আর কেউ খায় না। তারপরে কয়েকদিনের দুধ জমিয়ে দই বানানো হয়। তারপর পাড়াপড়শিকে নিয়ন্ত্রণ করে বাড়িতে এনে ত্রিনাথের মেলা দেওয়া হয়। দইয়ের সঙ্গে খই, পাটালিগুড় থাকে প্রসাদ হিসেবে। সবাই খাওয়ানো হয়। একটি বটের ডাল পুঁতে, তাতে সরিষার তেল দিয়ে মাটির প্রদীপ জুলিয়ে সবাই গোল হয়ে বসে। তারপর একজন কথক ত্রিনাথের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা পাঠ হয় পাঁচালি আকারে। নড়িয়ার লোনসিংহ গ্রামের রমণীমোহন সিকদার এই অঞ্চলের বিখ্যাত কথক। তিনি ত্রিনাথের পাঁচালি গ্রহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। মাহাত্ম্য বর্ণনা কিংবা পাঁচালি পাঠের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গাভীর দুধ আগে পাড়াপড়শিকে খাইয়ে পরে গৃহস্থ খাওয়ার এই রীতি সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করে।

## লোকমেলা

শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন উপলক্ষে লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়। আগের মতো জমজমাট না হলেও ঐতিহ্য ধারণ করে কিছু লোকমেলা এখনো টিকে আছে। প্রাচীনকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসছে। এসব লোকজ মেলার মধ্যে বৈশাখী মেলা, আনন্দ মেলা, কোন ঐতিহাসিক ঘটনার স্থানে বা কোন বিশেষ ব্যক্তির স্মরণে মেলা বসছে। শরীয়তপুরের আধ্যাতিক ভাষায় মেলাকে গলাইয়া বলা হয়। অধিকাংশ মেলা নদীর পাড়ে, কোনো কামেল পি঱ের বাড়ি, কোনো বড় বটগাছ বা জিমগাছ তলায় বসে। কৌতুবে গলাইয়া নামকরণ হয়েছে তা ঠিকভাবে বলা না গেলেও কোনো বটগাছকে ধীরে চারিদিকে গোল হয়ে মেলায় দোকানপাট বসে মেলা মিলে বিধায় মেলাকে গলাইয়া বলা হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, গলি ধরে সারিবদ্ধভাবে দোকানপাট বসে বলে মেলাকে গলাইয়া বলা হয়ে থাকে।

### ১. বৈশাখী মেলা

শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বৈশাখ মাসে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী মেলায় তালপাতার পাথা, বাঁশি, মোয়া, মিষ্ঠি, মাটির খেলনা কিনতে পাওয়া যায়। নাগরদোলাও আসে। কোনো কোনো এলাকায় বৈশাখী মেলা উপলক্ষে কবিগানের আসরও বসত। এখন ভেদরগঞ্জ, বুড়িরহাট, গোসাইরহাট, কার্তিকপুর প্রভৃতি এলাকায় বৈশাখী মেলা বসে। মহিসারের দিগন্বরী দিঘির পাড়ের বৈশাখী মেলা এই জেলার সবচেয়ে বড় মেলা।

জেলার সদর উপজেলার পালং এলাকার কালিখোলায় প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে শুরু হয়ে ৩দিন চলে বৈশাখী লোকজ মেলা। জেলার বাইরে থেকেও এখানে দর্শনার্থী আসে। মেলায় প্রচুর পরিমাণে লোকজ পণ্য বিক্রি হয়।

পালং উপজেলার চিতলিয়া ইউনিয়নের হিন্দুপাড়ায় কালিখোলার বটলায় এবং সুবিদারকান্দি হাটখোলায় প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে ১ দিনের জন্য মেলা বসে। এছাড়া মেলা বসে চিকন্দী, বুড়িরহাট, মনোহরবাজার ও সুবচনীর হাটে। এসব স্থানে ১লা বৈশাখে একদিনের জন্য মেলা বসে।

ভেদরগঞ্জ উপজেলার মহিসারে দিগন্বরী মাতার মেলা প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে শুরু হয়ে ৭ দিন চলে। জেলার নড়িয়া উপজেলার ডিংগামানিক গ্রামে শ্রীশ্রী রামঠাকুরের স্মরণে ৭ দিন ব্যাপী মেলা বসে। এছাড়াও বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ মাসের ১ তারিখে জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে মেলা বসে।

জেলার বিভিন্ন পির কামেল দরবার শারিফ ঘিরে বসে মেলা। নড়িয়া উপজেলার মূলফৎগঞ্জে আনন্দ মজিদ পাগলার মাজারের পাশে প্রতি বুধবার মেলা বসে। এসব মেলায় সকল বয়সের ছেলেমেয়েদের ঢল নামে। মেলায় হরেক রকম মনিহারি দ্রব্যসহ বিভিন্ন খাবারের দোকান বসে। মেলায় আনন্দ সত্ত্যিই বড় আনন্দ। শিশুরা মলায় আসতে পারলেই তাদের মনটা আনন্দে ভরে যায়।



মাটোসারের বৈশাখী মেলা

## ২. দিগম্বরী মেলা

শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মহিসার গ্রাম একটি অতি প্রাচীন। এই গ্রামে রয়েছে ২ টি বৃহদাকার দিঘি। এর একটি উত্তরে ও অপরটি দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তর পাশের দিঘির পশ্চিম পাড়ে রয়েছে শ্রীশ্রী দিগম্বরী মায়ের বাড়ি, মন্দির ও দিগম্বরী মেলা। শ্রীশ্রী দিগম্বরী মায়ের মন্দিরকে ঘিরেই মূলত লোকজ মেলা বসে। প্রতি বছর মেলায় কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে মেলায় দোকানপাট বসে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ঘিরে মেলা বসলেও মূলত মুসলমানের সমাগমই বেশি হয়। কবে, কে ও কখন এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন সে ব্যাপারে ইতিহাসে কোন সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য নেই। ‘মাট্র-সার’ গ্রামটি এখন ‘মহিসার’ বা ‘মহিষার’ নামে পরিচিতি। ‘দিগম্বরী মায়ের বাড়ি’ও বলে একে চেনা যায়। শুধু ‘মায়ের বাড়ি’ বলতেও পছন্দ করেন কেউ কেউ। কেউবা একে ‘মহিসারের দিঘি’ বললেও চিনতে পারেন। এখানে সেই প্রাচীনকাল থেকে প্রতি নববর্ষে পহেলা বৈশাখ থেকে সপ্তাহব্যাপী বৈশাখী পূজার্চনা হয়। এ-উপলক্ষে দিগম্বরী মায়ের পূজা সংশ্লিষ্ট

উপকরণাদি এবং মায়েদের ব্যবহার্য উপকরণাদি, শিশুদের খেলনা, ঝর্ণাভূমিক নানা ফল, দধি-মিষ্ঠি চিড়া-মুড়ি ইত্যাদিসহ কতিপয় মুখরোচক খাবার বিক্রির জন্য দোকান বসে। বিশাল দিঘির পাড় থিরে বিশাল গাছের ছায়ায় এ-পৰিবেশ স্থানটি এখন বাঙালির প্রিতিহ্যের অংশস্বরূপ ‘বৈশাখী মেলায়’ রূপ নেয়। তাই এটি ‘মহিসার গলইয়ার মেলা’ বা ‘মহিসারের মেলা’ নামে বিখ্যাত।

### ৩. সুরেশ্বরীর মেলা

জেলার নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বরীতে প্রতি বছর শীতের শেষে তিন দিনের ওরশ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং বহু ভক্তের সমাগম হয়। সুরেশ্বরীর জান শরিফের ওরশ উপলক্ষ্যে দেশের বাইরে থেকেও প্রচুর ভক্ত আসে। এখানে সুরেশ্বরী হজুরের উদ্দেশ্য করে রচিত গানের আসর বসে। সারারাত গান-বাজনা চলে। আশেপাশে তাই দোকানপাটি বসে এবং তা মেলায় পরিণত হয়। এই মেলা দেখতে এবং কেনাকাটা করতেও প্রচুর লোক সমাগম হয়।



দশোহরার মেলা শেষে ধানন্দৰ্বা দিয়ে বরণ

### ৪. দশোহরা মেলা

শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে দশোহরার মেলা বসত। এখন এই মেলা তেমন দেখা যায় না। শারদীয় পূজার বিজয়া দশমীর দিনে প্রতিমা বিসর্জন ঘাটে এই মেলার

ଆୟୋଜନ ହତୋ । ପୂଜାର କମେକଦିନ ଉପବାସ ଶେଷେ ଏହି ଦିନ ଯାହି ଖାଓଯାର ନିୟମ ରଯେଛେ । ଏହି ଦିନର ମେଲାକେ ଦଶୋହରାର ମେଲା ବଲା ହ୍ୟ । ମେଲା ଥିକେ ଫିରେ ସବାଇ ଯଥନ ବାଡ଼ି ଫେରେ ତଥନ ତାଦେର ଧାନଦୂର୍ବା ଦିଯେ ବରଣ କରା ହ୍ୟ । ବାଡ଼ିର ମେଯେରା ଉଠୋନେ ଧାନଦୂର୍ବା ନିଯେ ବସେ ଥାକେ । ଆର ମେଲା ଥିକେ ଆନା ହ୍ୟ ମିଟି । କପାଳେ ଧାନ ଆର ଦୂର୍ବା ଛୁଇୟେ ଏବଂ ମୁଖେ ମିଟି ତୁଳେ ଦେୟା ହ୍ୟ । ମେଲାର ସ୍ଥାନ ସଂକୃତି ହ୍ୟେ ଏଲେଓ ବିଜ୍ୟାର ଦିନେ ଏହି ବରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାରିବାରିକଭାବେ ଏଥିନେ ଚାଲୁ ରଯେଛେ ।

## ୫. ରାମଠାକୁରେର ମେଲା

ଶ୍ରୀଯତପୁର ଜେଲାର ନଡ଼ିଆ ଉପଜେଲାର ଡିଙ୍ଗାମାନିକ ଇଉନିଯନେ ରାମ ଠାକୁରେର ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଥାନେ ଶତ ବର୍ଷରେ ପୁରାନୋ ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ଏହି ଡିଙ୍ଗାମାନିକ ଇଉନିଯନଙ୍କ ଗୋଲକଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ବଭୌମ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଲିକିଶୋର ଶ୍ମତିରତ୍ନ ମହାଶୟର ବାସସ୍ଥାନ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶୀତେର ଶେଷେ ଏହି ଆଶ୍ରମକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ତିନ ଦିନର ମେଲା ବସେ । ଏହି ଆଶ୍ରମେର ଶାଖା ରଯେଛେ ଟାଂଦପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ନେଯାଖାଲୀ, ଚଟ୍ଟପାମ ଓ କଲକାତାଯ । ସେବାନ ଥିକେ ପ୍ରତିବହ୍ର ମେଲାର ସମୟେ ଅନେକ ଭକ୍ତର ସମାଗମ ହ୍ୟ ।

## লোকখাদ্য

অন্য জেলা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের লোকখাদ্য খুব বেশি নেই। ‘কাজীর ভাত’ শরীয়তপুরে বেশ জনপ্রিয় ছিল একসময়। মাদারীপুর, মুঙ্গিখণ্ড ও শরীয়তপুরে জেলাতেও এই কাজীর ভাতের প্রচলন রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মাছ-ভাতের বাইরে কয়েকটি লোকখাবারের বিবরণ দেয়া হলো:

### কাজির ভাত

শরীয়তপুরের লোকখাদ্যের মধ্যে কাজির ভাত বেশ স্বতন্ত্র। অনেক আগে থেকেই এর প্রচলন রয়েছে। একসময় প্রতিটি মুসলিম বাড়িতেই এই কাজির ভাতের আয়োজন হতো। এখন এটি হয়ে গেছে সৌখিন খাবার মাত্র। কাজি শব্দটি আসলে কাঁজি শব্দের অপভ্রংশ। শব্দটি এসেছে ‘কাঞ্জিক’ থেকে। এর অর্থ আমানি বা জলোভাত থেকে প্রস্তুত রস। কাজির ভাতের জন্য রান্নাঘরের চুলার পাড়ে একটি মাটির হাড়ি রাখা হয়। প্রতিদিন রান্নার সময় চুলোয় চাপানো হাঁড়ি থেকে পরিমাণমতো চাল ঐ হাড়িতে রাখা হয়। ৫/৭ দিন রাখার পর অই পুরোনো ভেজা চাল নতুন চালের সঙ্গে রান্না হয়। এই ভাত একটু টকাসে যুক্ত হয়। ভাতের সঙ্গে তেঁতুল, রসুন, তেজপাতা দেওয়া হয়। কাজির ভাতের সহযোগী উপকরণ হয় নানান রকম ভর্তা। ডাল ভর্তা, শিম ভর্তা, কুচর মুখি ভর্তা, বটেবটি ভর্তা, পটল ভর্তা, চিড়ি মাছ ভর্তা, আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, ধনেপাতা ভর্তা, কালিজিরা ভর্তা, শুটকি ভর্তা, শুকনা বা কাচা মরিচ ভর্তা, রসুন- তিল ভর্তা, সরমে ভর্তা ইত্যাদি।

### পিঠা

বাঙালির যত রকমের পিঠা বানাতে ও খেতে পছন্দ করে, শরীয়তপুরে তার প্রায় সকল রকমের পিঠার প্রচলন রয়েছে। আন্দোশা পিঠা, পাটি সাপটা পিঠা, চিতই পিঠা, দুধকুলি পিঠা, চুবি পিঠা, সেমাই পিঠা, বিস্কুট পিঠা, তালবড়া পিঠা, ফুলকুচি পিঠা, ফুলবুড়ি পিঠা, ঝুড়িকাটা পিঠা, টাটকা পিঠা, নকশি পিঠা, সিন্ধুকুলি পিঠা, কলা পিঠা, ভাপাপিঠা বা ধুপিপিঠা অন্যতম। পিঠার মূল উপকরণ চালের গুড়ো, নারিকেল, দুধ, চিনি, গুড় ইত্যাদি।

### নাড়ু

নাড়ু সাধারণত হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে তৈরি করা হয়ে থাকে। শরীয়তপুর জেলার সর্বত্র হিন্দু পরিবারে এটি তৈরি হয়। নানা ধরনের নাড়ু তৈরি করা হয়। দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, কার্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা, রাস পূজা, নীল পূর্জা, বিশ্বকর্মা পূজায় নাড়ু তৈরি করা হয়। যে সব নাড়ু তৈরি হয় তার মধ্যে রয়েছে নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, ছাতুর নাড়ু, কলাই নাড়ু, ঢ্যাপের নাড়ু, খুদের নাড়ু, চেচড়ার নাড়ু, ক্ষিরের নাড়ু ইত্যাদি।

## মোয়া

বিভিন্ন পৃজা-পর্বণে হিন্দু পরিবারে নাড়ির পাশাপাশি মোয়া তৈরি হয়, যা নৈবেদ্যের সময় পিতলের বা তামার বড় থালা সার্জিয়ে দেব-দেবীর আসনে অর্পণ করা হয়। এ-মোয়া মিষ্টি জাতীয় স্বাদু খাদ্য। মুড়ির মোয়া, চিড়ার মোয়া, ঢাপের মোয়া প্রভৃতি এ-এলাকায় বানানো হয়।

## খেজুর গুড়

এ-জেলার প্রবাদ আছে- 'সুরেশ্বরীর ডাটা, পদ্মার ইলিশ আর খেজুরের গুড়।' এই তিনি নিয়ে গর্বিত শরীয়তপুর'। শীতের পিঠা-পায়েস তৈরি ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য খেজুর গুড় ছিল অপরিহার্য উপাদান। অবাধ খেজুর গাছ নিধন আর নতুন করে খেজুরের চারা রোপণ না করায় এখন খেজুর গুড় হারিয়ে গেছে। এ-খেজুর গুড় উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে বিভিন্ন পেশার কয়েকটি সম্প্রদায় সম্পৃক্ত ছিল। যার মধ্যে রয়েছে গাছী, কুমার, কামার, বাঁশশিল্পী, আড়ত্দার, পাইকার ও বাহক শ্রেণি। এরা সবাই আজ পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় নিয়োজিত হলেও তেমন একটা সুবিধা করতে পারছে না। এদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দিন পার করছে খেজুর গুড় উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত গাছীরা।

এক সময় শরীয়তপুর জেলায় নদী ও খাল পাড়ে, প্রধান প্রধান সড়কের দুই ধারে খেজুর গাছের অবাধ চাষ হতো। বর্তমানে সেই সকল খেজুর গাছ নিধন করে রোপণ করা হচ্ছে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিদেশি প্রজাতির রেইনটি, চাষল, আকাশমণি ও মেহগনির মতো গাছ। ফলে গাছীদের রস উৎপাদনের জন্য প্রধান উপাদান খেজুরগাছ কালের অবর্তে বিলুপ্ত হচ্ছে চলেছে।

ভেদরগঞ্জ উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের ঘাটোখৰ্ব গাছী আবুল মালান বলেন, আজ থেকে ৫-৬ বছর পূর্বেও আমাদের গ্রামে শত শত খেজুরগাছ ছিল। আমি প্রতিদিনই পালাকরে দুই শতাধিক খেজুর গাছের রস আহরণ করতাম। প্রতিদিন আমার দুই থেকে আড়াই মণ গুড় উৎপাদন হতো। যা বিক্রি করে আমার সংসার স্বাচ্ছন্দে চলত। বিশেষ করে সকাল বেলায় রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরির সময় মৌ মৌ সুস্থান বেরকৃত। আজ তা শুধুই স্থৃতি। ইত্তাটার জ্বালানির জন্য নির্বিচারে খেজুর গাছ কেটে বিক্রি করে দেয়ায় এখন আর সারা গ্রাম খুঁজেও ২০-৩০ টির বেশি খেজুর গাছ পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে এই পেশা ছেড়ে দিয়েছি।

একই উপজেলার রামন্দুপুর ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের হাশেম চৌকিদার ও সদুরহাট গ্রামের আলাউদ্দিন তফিলদার বলেন, খেজুরের রস আহরণের পরে গুড় তৈরির জন্য প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন হয়। আউশ ও আমন ধানের খড় থেকে এ-জ্বালানি সংগ্রহ করা হতো। কালের বিবর্তনে আউশ-আমন ধান চাষাবাদের পরিবর্তে শুধু বোরো ধানের চাষ করায় এখন উচ্চ মূল্যে জ্বালানি কাঠ কৃষ করে গুড় উৎপাদন করতে খরচ অনেক বেড়ে যায়। ফলে গাছের মালিকরা খেজুরগাছ বিক্রি করে দ্রুত বর্ধনশীল কাঠগাছ রোপণ করছে। এতে করে আমাদের গুড় উৎপাদনের জন্য

খেজুরগাছ না পেয়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছি। এখন ইচ্ছা করলেও খেজুর গুড় দূরে থাক, আমাদের এলাকায় খেজুরের রস পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। দু

ডামুড়া উপজেলার সৈয়দবন্দা গ্রামের পিয়ারা বেগম (৬০) বলেন, শীতের সময় আমাদের বাড়ির ছেলেরা বুড়িরহাট ডামুড়া খালের দুই পাড়ের খেজুর বাগান থেকে সন্ধ্যা রাতের রস এনেই রসের নাস্তা তৈরি করে খেত। আর সকাল বেলা রস কম পেয়ে গাছীরা বকাবকা করত। যা বর্তমান কালে শুই কলাকাহিনি। আমাদের নাতি-পুতিদের সন্ধ্যার রস দূরে থাক, সকালের খেজুরের রস দেখাতে হলেও তাদের হাট-বাজারে নিয়ে যেতে হয়। খেজুরগুড় আমাদের জন্য এখন দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অথচ এ-খেজুর গাছের কারণেই আমাদের বিভিন্ন এলাকায় খেজুরতলা, খেজুরবাগ, রসেরমোড় ইত্যাদি নামকরণ করা হয়।

নড়িয়া উপজেলার ঘড়িবার বাজারের খেজুরগুড় ব্যবসায়ী আমির হোসেন খান বলেন, একসময় আমাদের বাজারে প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ মণ গুড় আমি নিজেই ত্রুটি করতাম। এখন সারা বাজার মিলিয়েও দুই চার মণ খেজুরগুড় সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। এছারাও গুড় উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত গাছীরা তাদের প্রকৃত রূপ পরিবর্তন করে গুড় তৈরির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কেমিক্যালসহ কমদামে বাজারে পাওয়া চিনি ও আধের গুড় মিশিয়ে সুগন্ধি খেজুরের গুড় তৈরি করে বাজারে নিয়ে আসে। এতে সাধারণ ক্রেতারা প্রতিরিত হয় বিধায় এপেশা ছেড়ে দিয়েছি।

একই এলাকার আব্দুল মাল্লান সিকদার বলেন, মেয়ে-জামাই বিদেশ থেকে বেড়াতে এসেছে; তারা খেজুর গুড়ের পায়েস খাওয়ার অগ্রহ প্রকাশ করেছে। গত দুই দিন আগে বাজার থেকে খেজুর গুড় কিনে পায়েস রান্না করার পরে দুধ ও পায়েস নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের সামনে এতটুকু পায়েস দিতে পারিনি। আজ আবার ভাল গুড় কিনার জন্য ঘুরতেছি। সকাল থেকে দুপুর হয়ে গেলেও কারও কাছে ভাল মানের নিশ্চয়তা না পেয়ে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, আগের দিনের খেজুর গুড়ে কানো ভেজাল মোশানো হতো না। বর্তমানে নানান প্রকার ভেজাল মেশানোর কারণে খেজুর গুড়ের স্থান ঠিক থাকলেও স্বাদ ও গুণ হারিয়ে গেছে। ফলে গুড় না কিনে সবাই চিনিতেই গুড়ের কাজ সেরে নিচ্ছে।

সদর উপজেলার চন্দ্রপুর গ্রামের খেজুর গাছী চান বাদশা বলেন, আগের মতো এখন আর গাছে রস হয় না। তাছাড়া গুড় তৈরি করতে ১ শ ২০ টাকা খরচ হয়ে যায়। বাজারে দেড়শ টাকা কেজি দাম চাইলে কেউ গুড় কিনতে চায় না। তাই বাধ্য হয়েই ৫০ টাকা দামের কিছু চিনি মিশিয়ে পরতা মিলিয়ে নেই। ফলে আমাদের আর লোকসান গুলতে হয় না।<sup>১</sup>

### মিষ্টি-শিল্প

ময়রার দোকানে কাচের আলমারিতে রং-বেরঙের বাহারি মিষ্টিব্য সাজিয়ে রেখে খরিদ্দারের চোখজিহ্বা-মনকে আকর্ষণ করার কৌশল বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। মানুষের মধ্যে মিষ্টিমুখ বা মিষ্টি পরিবেশন আতীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, সমাজে আবালবৃক্ষবণিতার মধ্যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই রকমারি ও স্বাদে গুণে

তৱপুৰ মিষ্টি সামগ্ৰি যে সব কাৰিগৱৰা প্ৰস্তুত কৰে থাকে তাৱাই মিষ্টিশল্লী। মিষ্টিশল্লীদেৱ কৌশল ও দক্ষতাৰ ফলেই মিষ্টিদ্বৰ্যেৰ আজ এতো চাহিদা। বিভিন্ন এলাকায় এ-সব মিষ্টিদ্বৰ্য তৈৰি ও বিক্ৰয় বাণিজ্যিকভাৱে চলে আসছে। এক এক স্থানে এক একটা মিষ্টিদ্বৰ্য খুবই নামকৱা হয়ে থাকে। শৰীয়তপুৱণ এৰ ব্যতিকৰণ নয়। এ-অঞ্চলৰ মিষ্টিৰ সবই ভালমানেৱ। জেলা সদৱেৱ ‘হাৰু ঘোষেৱ রসগোল্লা’ ও নিমকি এবং নড়িয়া সদৱেৱ সন্দেশ সুপৰিচিত। এ-জেলাৰ বিভিন্ন এলাকায় কমবেশি যে সব মিষ্টিদ্বৰ্য তৈৰি ও বিক্ৰয় হয়ে থাকে তাৰেৱ মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: রসগোল্লা, শুকনা রসগোল্লা, লাল মোহন, মোহনভোগ, রাজভোগ, চমচম, আমিস্তি, দানাদার, নিমকি, লুচি, সন্দেশ (ছানার ও চিনিৰ বা গুড়েৱ), কালোজাম, কাচা গোল্লা, রসমালাই, বৰ্ফি সন্দেশ, লেডিকেনি, জিলেপি, বুঁদে ইত্যাদি।<sup>১</sup>

মিষ্টিদ্বৰ্যেৰ ঐতিহ্য ধৰে আজও সে-সকল মিষ্টিশল্লী (কাৰিগৱ) এগিয়ে যাচ্ছে, তাৰেৱ এবং পূৰ্বেকার শিল্পীদেৱ নাম উল্লেখ কৰ হলো<sup>২</sup>—

**সদৱ উপজেলা (পালং):** পালং বাজাৰ: ১। শচীলাল ঘোষ (প্ৰয়াত) এবং তাৰ পুত্ৰগণ: (ক) রঙলাল ঘোষ (প্ৰয়াত) এবং এৰ পুত্ৰগণ তপন ঘোষ ও তাৰকনাথ ঘোষ (খ) নাৱায়ণচন্দ্ৰ ঘোষ এবং এৰ পুত্ৰ গোপাল ঘোষ (গ) হাৰাধন ঘোষ (হাৰু ঘোষ) এৰ পুত্ৰ সুমন ঘোষ। ২। চিতৰঞ্জন ঘোষ (প্ৰয়াত) এবং এৰ পুত্ৰগণ, (ক) কাৰ্তিক ঘোষ (খ) গণেশচন্দ্ৰ ঘোষ (গ) দিলীপ ঘোষ (ঘ) শ্যামল ঘোষ (ঙ) বিমল ঘোষ। ৩। কালীমোহন ঘোষ (ব্ৰিটিশ এবং পাক আমলৰ গোঢ়াৰ দিকেৱ একজন দক্ষ শিল্পী)। ৪। সুৱেন্দ্ৰনাথ গুণ (সুকাই গুণ) (ব্ৰিটিশ ও পাক-আমলৰ এ-অঞ্চলৰ একজন সুদক্ষ ময়ৱাৰ ও শিল্পী)। যাত্রাভিনয় ও কৱতনেৰ ভাল। ১৯৭১ সালে পাকহানাদাৰ বাহিনিৰ হাতে শহিদ হন। ৫। চিতৰঞ্জন ঘোষ ও গোৱাঙচন্দ্ৰ ঘোষ। ৬। নাৱায়ণ ঘোষ ও গুৱাহাস ঘোষ। ৭। পঞ্চানন (পচান) ঘোষ-পাঠকবাজাৰ। ৮। সনাতন (সনাই) ঘোষ পাঠকবাজাৰ। ৯। রণজিৎ ঘোষ। ১০। সুনীলচন্দ্ৰ দেবনাথ, পিতা সুবলচন্দ্ৰ দেবনাথ, আঙুৱিৱা বাজাৰ। ১১। মনমোহন ঘোষ। ১২। শত্রুনাথ ঘোষ। ১৩। মনোমোহন ঘোষ এবং এৰ ছেলেৱা, সত্তোৰচন্দ্ৰ পাল। ১৪। দুলাল ঘোষ (প্ৰয়াত) এবং এৰ ছেলে কাৰ্তিক ঘোষ, সাধুচৱণ ঘোষ, আবুল আজিজ খা, রণজিত ঘোষ। ডোমসাৰ বাজাৰ: নাটুচন্দ্ৰ পাল, সিদিক। বুড়িৱাট (বাজাৰ): চিতৰঞ্জন কুণ্ড, ত্ৰিনাথ দেবনাথ। শ্যামলাল দেবনাথেৰ পুত্ৰ নাৱায়ণ দেবনাথ ও দিলীপ দেবনাথ। কানার বাজাৰ: পূৰ্ণচন্দ্ৰ পোদাৱ (পিতা শান্তি পোদাৱ)। রংদ্ৰুকৰ: রবীন্দ্ৰনাথ দে, সুবলচন্দ্ৰ মণল, নিখিলচন্দ্ৰ দেবনাথ। পালং: শংকৰ ঘোষ (তুফান) পিতা মৃত দ্বাৰিকনাথ ঘোষ।

**ডামুড়া উপজেলা:** ডামুড়া বন্দৱ: হীৱালাল দাস, সুশীলচন্দ্ৰ দে, সুখৰঞ্জন দে, প্ৰিয়লাল ঘোষ, কাৰ্তিকচন্দ্ৰ ঘোষ, রাধেশ্যাম ঘোষ, আনসাৱ বেপাৰী, দিলীপচন্দ্ৰ দে, অপু মণল, আবদুৱ রাজাক সিকদাৱ, সুজন মণল, কালাচাঁদ শীল, লাল শৱিষ, প্ৰাণকৃষ্ণ দে, নূৱ মোহাম্মদ বাবুচি।

**গোসাইরহাট উপজেলা:** সদর (বাজার): চিন্ত্রজ্ঞন পাল, খোকন দাস, মরণ দাস, শুভ্রকর সিকদার, কৃষ্ণ মওল, গোপালচন্দ্র দাস, মনির সরদার, আবদুর রাজ্জাক, হেমন্ত মওল। কেদারপুর বাজার: গোপাল ঘোষ ও শান্তি ঘোষ।

**নড়িয়া উপজেলা:** নড়িয়া বাজার: পরিমল ঘোষ, সরোজিত ঘোষ, শংকর পাল, সুধীর সূত্রধর, প্রফুল্ল সূত্রধর, রণজিত সূত্রধর, কালু যিকি, নারু বেপারী তৈয়ার আলী বেপারী। ভোজেশ্বর বাজার: যামিনী দে, কার্তিক পাল পিতা: সন্তোষ পাল, সতীশচন্দ্র পাল এবং এর ছেলে নান্দু পাল ও দিলীপ পাল। কালু বেপারী, খুকু বেপারী।। চাকদহ বাজার: যদুনাথ ঘোষ। ঘড়িসার বাজার: শত্রুনাথ ঘোষ, লক্ষণচন্দ্র ঘোষ, নীলকৃষ্ণ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, সুনীলচন্দ্র পাল, সুধীরচন্দ্র সাহা (দীপ্তি), ক্ষুদিরাম বর্মণ। গোলার বাজার: কৃষ্ণ পাল। বিবারী বাজার: ভুট্টো দে, পিতা: জগদীশ দে। পণ্ডিত সার: পার্ব ঘোষ। মূলফৎগঞ্জ বাজার: সত্যগোপাল অধিকারী, শ্যামসুন্দর শীল, প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, কালাচাঁদ সাহা।

**ভোদরগঞ্জ উপজেলা:** চরকুমারিয়া বাজার: গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ। ভোদরগঞ্জ বাজার: মধুসুন্দন ঘোষ, অম্বল্য মওল, পরেশচন্দ্র কবিরাজ, আবুল কাসেম সিকদার। সাজনপুর বাজার: কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, মোতালেব চৌধুরী, নুরুল হক তালুকদার, সাতার শেখ।

**জাজিরা উপজেলা:** জাজিরা বাজার: ঝন্টুচন্দ্র ঘোষের ছেলে সুমন ঘোষ, মনোরঞ্জন ঘোষ, পিতা: মৃত সুধন্য ঘোষ, নিখিলচন্দ্র ঘোষ, পিতা: মৃত সুধন্য ঘোষ, মন্টুচন্দ্র ঘোষ, পিতা: সুধন্য ঘোষ।

## তথ্যনির্দেশ

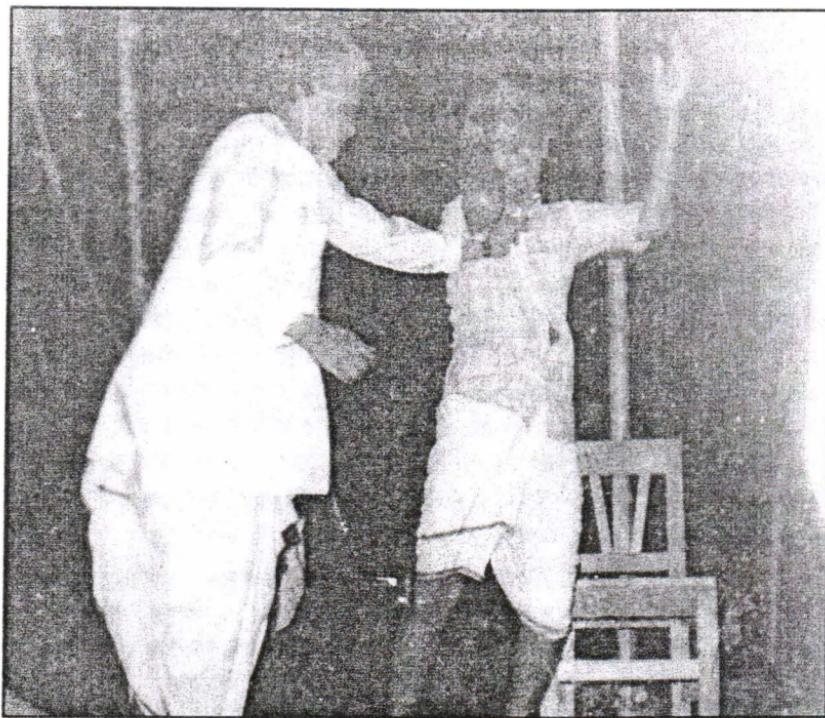
১. এম হারমন অর রশীদ, সাংবাদিক, শরীয়তপুর, ‘নানান প্রতিকূলতায় অস্তিত্ব হারাতে বসেছে শরীয়তপুরের খেজুর গুড় শিল্প’ শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে গৃহীত
২. তথ্যদাতা: কবি শ্যামসুল দেবনাথ, পালং, শরীয়তপুর, ১৭ ডিসেম্বর ২০১২
৩. তথ্যদাতা: অসিতকুমার বর্মণ (৭১), অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক, পণ্ডিতসার উচ্চবিদ্যালয়, শরীয়তপুর, ১০ এপ্রিল ২০১২

## লোকনাট্য

লোকসমাজের বিশেষ কোনো ঘটনা নিয়ে যেমন লোকনাট্য সৃষ্টি হয়, তেমনি কোনো কিংবদন্তি, রূপকথা কিংবা পৌরাণিক আখ্যান নিয়ে রচিত হতে পারে। একসময় যাত্রাকে লোকনাট্য বিবেচনা করা হতো। পরে যাত্রা নিজস্ব একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই এলাকায় যাত্রাগানে সমৃদ্ধ ছিল। শতবর্ষ আগে যাত্রা দেখার তথ্য পত্রপত্রিকাতেও পাওয়া যায়। এমন একটি ঘটনা রয়েছে যাত্রাবিষয়ক একটি গবেষণাগ্রন্থে। তাতে বলা হয়, ১৮৯৭ সালে ফরিদপুর জেলার পালং এবং সন্ধিহিত গ্রামের স্কুলের ছাত্রার যাত্রা দেখতে যায়। পালং গ্রামটি পরে মাদারীপুর জেলার এবং বর্তমানে শরীয়তপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। ‘মহাভারতে’র কাহিনী উন্নত এই পালা দেখার কারণে স্কুলের ছাত্রার শাস্তি পেয়েছিল। এদের মধ্যে একজন ছাত্রকে স্কুল থেকে বহিকার করা হয়েছিল।’ চারণকবি মুকুন্দদাস এই এলাকায় যাত্রা পরিবেশ করেছেন, সেই তথ্যও জানা যায়-

‘১৯০৫ সালে তিনি রচনা করেন যাত্রাপালা ‘মাতৃপূজা’। দেবী-প্রতীকে তিনি এ-যাত্রাপালায় দেশমাতার বন্দনা করেছেন। এ-পালায় অশ্বিনীকুমারের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। ‘মাতৃপূজা’-র প্রথম মঞ্চায়ন হয় বরিশাল জেলার বানারীপাড়ার নকারামে, ভোলানাথ গুহষ্ঠাকুরতার বাড়িতে। এরপর মঞ্চায়ন হয় ইদিলপুর পরগনায় আর্থাং তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমায়, বর্তমানে শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে।’<sup>১</sup>

১৯০৭ সালে এই জেলার প্রথম যাত্রাদল গঠিত হয়। মহেন্দ্রকুমার সেন প্রতিষ্ঠিত সেই দলের নাম আদি ভোলানাথ অপেরা। এটি বাংলাদেশে তৃতীয় দল। এর আগে বরিশালের মুকুন্দদাসের স্বদেশি যাত্রাপার্টি আর বালকার্থির রজনীকান্ত নাগ ও মহেন্দ্রকুমার সিংহ প্রযুক্তের ‘নাগ-দন্ত-সিংহ-রায় কোম্পানি’ নামে দুটি যাত্রা দলের খবর পাওয়া যায়। সেই বিচারে শরীয়তপুরে যাত্রাদলের ঐতিহ্য ও প্রাচীন। ১৯০৭ সালে নার্গিস আঙ্কার লিপি নামে আরেকজন যাত্রাধিকারী তাজমহল অপেরা নামে একটি যাত্রাদল চালু করেন। আরো গৌরবের ব্যাপার হলো, শ্রেষ্ঠ পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬) এই জেলার গয়ঘর গঙ্গানগর গ্রামে জন্ম নিয়েছেন। পিতা হরিকিশোর দে, মাতা ক্ষীরোদসুন্দরী দেবী। বাল্যশিক্ষা শুরু গ্রামের পাঠশালায়। ১৯২৫-এ-কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই.এসসি, ১৯২৫-এ-একই কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯২৯-এ-কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনৈতি এম.এ. পাস। ১৯৩৭-এ বি.টি. পাস এবং শরীয়তপুরের কার্তিকপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৪৫-এ-পশ্চিমবঙ্গে ইচ্ছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চবিদ্যালয়ের অতিরিক্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান। ১৯৫২-তে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত। তাঁর বিখ্যাত পালা: ‘দেবতার গ্রাস’, ‘সমাজের বলি’, ‘শেষ নমাজ’, ‘ধরার দেবতা’, ‘কোহিনুর’, ‘গাঁয়ের মেয়ে’,



'অনুসক্ষন' যাত্রাপালায় বিগুলচন্দ্র কীর্তনীয়া ও তপস বাগচী

'ভাগ্যের বলি', 'সোহরাব রস্তম', 'সুলতানা রিজিয়া', 'মুজিবের ডাক', 'আঁধারের মুসাফির', 'নটী বিনোদিনী', 'বিদ্রোহী নজরুল' প্রভৃতি। 'পালাসম্ভাট' ও 'লোকনাট্যগুরু' উপাধি লাভ করেছেন তিনি যাত্রাপালার জন্য। এই পালাগুলো সারা দেশে যেমন অভিনীত হয়, শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামেও তেমনি অভিনীত হয়েছে।

তবে শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে একসময় অনেক লোকনাট্য বা পালা অভিনীত হতো। তাঁর একটি 'আমান দুলালের পালা' এখানে তুলে ধরা হলো।

### আমান দুলালের পালা

চরিতা: পুরুষ  
আমির বাদশা  
আমান  
দুলাল  
শাজাহান বাদশা  
গফুর বাদশা  
রহিম সওদাগর

ইরানের বাদশা  
ইরানের বাদশার পুত্র  
ইরানের বাদশার পুত্র  
জংলিমান বাদশা (আমির বাদশার প্রতিদ্বন্দ্বী)  
মোজরের বাদশা (আমির বাদশার শ্বশুর)  
দুলালের শ্বশুর

মন্ত্রী, জল্লাদ, ডাক্তার, মাস্টার, বলাই, নীলু, মিন্টু, মোল্লা উজিরদ্বয় পাগল ।

### চরিত্র: শ্রী

১ম রানি :	আমির বাদশার ১ম বেগম
২য় রানি	: আমির বাদশার ২য় বেগম
সওদাগর কন্যা	: দুলালের শ্রী
রাজ কন্যা	: আমানের বেগম
উজির গিন্নি	: আমানের উজিরের শ্রী
সওদাগর গিন্নি, বাইজি, দাসী প্রভৃতি ।	

### ১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য

(বাইজিগণের আসর)

বাইজির প্রবেশ ও গান:

ইরান শহরে বাদশা আমির নাম গো  
 দুই পুত্র রাইখা ঘরে রানির স্বর্গবাস গো ।  
 যখনে রানি মার দুই পুত্র রেইখে ঘরে,  
 রাজার সঙ্গে সত্যতা করে  
 রানির বর্তমান গো,  
 উজিরের চক্রে পইড়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ।  
 রাজায় ফের করেন বিয়ে  
 মেছের শহর গো ॥  
 দুই পুত্র বলি দিতে হকুম দেয়  
 জল্লাদে তাগোরে ছাইড়ে দিয়ে  
 একটা কুকুর কাটিয়ে ।  
 রানিকে রক্ত দেয় আনিয়ে  
 গোছলেরই কারণ গো ॥

### :২য় দৃশ্য:

(আমির বাদশার প্রবেশ)

আমির বাদশা: হায় খোদা তুমি তিলেকে বাদশাকে ফকির কইরতে পার, আবার ফকিরকেও বাদশা কইরতে পার । তোমার নীলা কিছুই বুঝতে পারি না । তুমি সব করনেওয়ালা । আমি তোমার নীলা কিছুই বুঝতে পারি না । মাবুদ ।

### (রানির প্রবেশ)

রানি : প্রাণেৰ প্রাণেৰ আপনি একা একা বইসে কী ভাবছেন?  
 আমির বাদশা : রানি, আৱ কী ভাবুম । আমি কিষ্টি আমাৰ প্ৰাণ যেন সৰ্বদা  
 আতঙ্কতি হইয়ে উঠছে ।

রানি	প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বর, সত্য কইবে বলুইন দেখি, আপনি একা একা বইসে কি ভাবছেন। আমি তবেই আপনাকে বিশ্বাস করি যদি আপনে আমার সাতে একটা সত্যতা করেন।
আমির বাদশা :	কী সত্যতা কইতে হবে রানি?
রানি :	আমি যদি মৃত্যুই, তা হইলে আপনে আর দ্বিতীয় কাজ কইতে পাইবেন না এবং আমার আগান ও দুলালকে রক্ষণাবেক্ষণ কইবেন।
আমির বাদশা :	রানি, আমি তাহাই করিলেম। তোমার মৃত্যু হওয়ার পর আমি আর দ্বিতীয় বিবাহ করিব না। এবং তোমার আমান ও দুলালকে ফেলিয়ে দিব না। (সকলের প্রস্তান)

। ভূতীয় দশ্য ॥

(প্রথমে রাজা ও পরে রানির প্রবেশ)

ରାନି : ଓ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ଆମାର ବୁକେ ସେଣ ବ୍ୟଥା ଉଇଠ୍ୟାଛେ, ଆମି ସେ ଆର ସହ୍ୟ କଇରତେ ପାରି ନା । ନା, ନା, ଏଥିନ କି କରି ଆର । କୋଥାଯ ସାଇ । ଓହ, ଓ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର, ବାଥା ସେ, କେରମେଇ ବାଇଡ୍ଜ୍ବା ଉଇଠ୍ଳ । ଆର ସେ ବୀଚି ନା ଉଃ ।

আমির বাদশা : রানি, রানি, একটু বেলম্ব কর। আমি একজন ডাঙুয়া  
ডাকাইত্যাছি। কোথায় প্রহরী।

## প্রহরী : জাহাপনা ।

**আমির বাদশা :** মুহূর্তের মহিয়ে একজন ডাক্তারকে ডাইকে আন।

ପ୍ରହରୀ : ତବେଇ ଯାଚିଚ ।

(প্রহরীর প্রস্থান ও একজন ডাক্তারের প্রবেশ)

**ডাক্তার** : জঁহাপনা, কিজন্য আমাকে কল কইর্যাছেন।

আমির বাদশা : দেখেন তো ভাঙ্গার সাব রানিক কী রোগ হইয়াছে? এবং ইয়ার উপযুক্ত চিকিৎসা করেন।

ডাক্তার দেখিছেন রানি, আপনের হাতখানা? ও! মহারাজ, এত ডবল নিম্ফইস্যা হইয়াছে। এই নেন চারিটি ইনজেকশন রেইথে গেলাম। ছয় মিনিট পর পর হাত ও মাজায় দিবেন। আচ্ছা এখন আমি চাইলে যাই।

বাদশা ভিজিটের ট্যাকা নিবেন না?

ডাক্তার হা, নিব, নিব, আইজ না কাইল নিব।

(ডাক্তারের প্রস্থান)

ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆମାର ସ୍ୟଥା ଯେ କ୍ରମେଇ ବେଡ଼େ ଚିଲ୍ଲାହେ ।  
ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆମାୟ ଧରେନ । ଆମାୟ ଧରେନ । ଓ ଆମାର ଆମାନ  
ଓ ଦୁଲାଳ କୋଥାୟ? ବାବା ଆମାନ ବାବା ଦୁଲାଳ, ତୋମାଦିଗଙ୍କେ  
ଫେଲିଯେ ଚିର ଜୀବନେର ଯତ ଚଲିଲେନ । ଖୋଦା! ଖୋଦା! ତୁମି  
ଇହାଦିଗଙ୍କେ ଦେଖିବୁ ।

(ରାନିର ଯୃତ୍ୟ)

## (আমান ও দুলালের আগমন)

- আমান : আমা উঠ আমায় খানা খাইতে দেউ আমার ক্ষুদা পেইয়াছে ।  
 আমির বাদশা : আরকি তোদের মা বেইচে আছেৰে, বাবা আমান, বাবা দুলাল, সে যে জীবনেৰ মত পৱলোক গমন কইয়াছে ।  
 আমান কী বলছেন আবৰা, আমাদেৱ মা মেৰুত হইয়াছে তুমি ছাইড়ে গেলে মা, সত্যিই তুমি ছাইড়ে গেলে ।

## (আমান ও দুলালের গান)

তুমি ছাইড়ে গেলে মা  
 আমায় সঙ্গে নিলেনা  
 এত দুঃখ লেইখ্যাছিল  
 ওগো মালেক রক্বানা ।  
 আমি মা বইলৰ কাৰে  
 বিধি এই ভবেৱ পৰে  
 এত দুঃখ লেইখেছিলে বিধি  
 আমাৰ কপালে  
 আমি না দেধি উপায়  
 এখন যাবৰে কোথায়  
 কী কৱিব কোথায় যাব  
 এখন না দেধিবে উপায় ।  
 আমি হই মাত্হারা  
 বনেৱ হৱিসেৱ ধাৰা ।  
 শিশুকালে কইৱল বিধি  
 আমায় মাত্হারা

- আমির বাদশা : বাবা আমান, বাবা দুলাল, কান্দিলে আৱ কোন ফল হইবেনা ।  
 এখান ইহার সৎকাৰ্য যাহা তাহাই কৱ । এখনে কে আছিসৱেভ কোথায় প্ৰহৱী ?

## (প্ৰহৱীৰ প্ৰবেশ)

- প্ৰহৱী : জাহাপনা !  
 আমির বাদশা : এই মুহূৰ্তে লোকজন ডাইকে এই লাশ দাফন দ্যাওয়াৰ বেবস্থা কৱ ।  
 প্ৰহৱী : তবেই আমি যাচ্ছি ।  
 (দুইজন লোকেৱ প্ৰবেশ)  
 প্ৰথম লোক : ভাই আগামে আমি ধইৱবেক । পিছাৱথে তুমি ধৰ ।  
 দ্বিতীয় লোক : আইগ আইছো, তাই ধৰ ।  
 (সব প্ৰস্থান)

## । ৪ৰ্থ দৃশ্য ।

(আমির বাদশা, আমান ও দুলালেৱ প্ৰবেশ)

- আমির বাদশা : কোথায় প্ৰহৱী ?

## (প্ৰহৱীৰ প্ৰবেশ)

- প্রহরী : জাঁহাপনা ।  
 আমির বাদশা : এই মুহূর্তে একজন ধাই ডাইকে আনওন কর ।  
 প্রহরী : তবেই যাচ্ছি হজুর ।  
 (ধাইর প্রবেশ)  
 ধাই : কী জন্যে আমাকে আদেশ কইয়াছের মহারাজ?  
 আমির বাদশা : আইজ হইতে আমার আমান ও দুলালকে তোমার হাতে সমর্পণ  
কইলেম । তুমি এদের লালন-পালন কর ।  
 ধাই : মহারাজ এদের লেখাপড়ার বেবস্থা কইবে দ্যান ।  
 আমির বাদশা : আচ্ছা আমি ওদের ইঙ্গুলে ভর্তি কইবে দিব ।  
 (সব প্রস্তাব)

## ॥ ৫ম দৃশ্য ॥

(পাঠশালা)

- ১ম ছাত্র : পড়কে ভাই পড়, আইজ মাস্টার আইসবেক না । পড় পড় ।  
 ২য় ছাত্র : পাখি সব করে রব  
রাণি পেয়কাইল  
কাননে কুসুম কলি  
সকলেই ফুট কাইল ।  
 ২য় ছাত্র আইজ বড় শীত, কাইল ইঙ্গুলে আসতে পারিবেক না ।  
 ১ম ছাত্র এই দুইষ্ঠারা পড় পড় । আইজ মাস্টার সাব আইসবেক না এক  
মাসের মত আমাকেই মাস্টারি দিয়াছে ।  
 ২য় ছাত্র কী বলছ, তোমারে মাস্টারি দিয়াছেন তা আমি বিশ্বাস করি না ।  
 (মাস্টারের প্রবেশ)  
 মাস্টার এই বলাই দুষ্টামি কেন? আন দেখি তর খাতা, আন দেখি তর  
পড়া, এই নিলু আন তর পড়া আন ।

(আমির বাদশার প্রবেশ পথে আমান দুলাল)

- আমির বাদশা : কী হে মাস্টারস ভাল আছান ।  
 মাস্টার : (লাফাইয়া দাঢ়াইয়া) জাঁহাপনা যে, আইজ আমাদের এত ভাগ্যি  
যে মুলুকের হজুর আপনাদের ইঙ্গুলে আগমন কইয়াছেন । আদাৰ  
হজুর । কী জন্য আইসাহেন বাদশাজি, বসিতে আইজ্জা হোইক ।  
 আমির বাদশা : আমার আমান ও দুলাল কে আপনার ইঙ্গুলে ভর্তি কইয়া দিতে  
আইসাছি, মাস্টার ।  
 মাস্টার : বাড়িতে কি কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে হজুর ।  
 আমির বাদশা : না, বাড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই । এই মাত্র পরথম । এখন  
আইসতে পারি  
 আইজ্জা এখন আইসতে পারেন । (আমির বাদশার প্রস্তাব)  
 এই বলাই আইজ একটি প্রশ্ন দিব । বল তো একটি গাছে ১০টি  
পাখি আছিল । একজন শিকারী আইসা বন্দুক খট কইয়া ২টি  
মাইর্যা ফেইল্যাছে আৱ কয়টি পাখি গাছে রাইয়াছে?

- বলাই : আর ৮ টা পাখি গাছে রইয়াছে ।  
 মাস্টার : নীলু, বলতো কয়টা পাখি আছে?  
 নীলু : ১২টা ট্রি গাছে বইস্যা রইয়াছে ।  
 মাস্টার : আমান ও দুলাল বলতো, কয়টা পাখি গাছে আছে ।  
 আমান ও দুলাল : একটিও গাছে থাকল না ছ্যার ॥  
 মাস্টার : অল রাইট, তোমাদের বুদ্ধি হ্যাজ । এই আইজ আমার শুশ্রে  
 বাড়িতে নিমত্তন হইয়াছে । আইজই পত্র আইস্যাছে । কাজেই  
 আমার সেখিনে যেইতে হবে । আমি তোমাকে এক মাসের মাস্টারী  
 পদে নিযুক্ত করিলেম । তুমি ভালভাবে এদের লেখাপড়া শিক্ষাদান  
 কইরবে ।
- মন্টু আমি আপনার সাথে যাইতে চাই মাস্টার সাব ।  
 মাস্টার আরে আকেল ছাড়া বেক্কেল, আরে ইয়ারে কী কয় রে, আঃ  
 মাস্টারের সাথে ইয়ারকি দিতাচিস এন্দুর ।  
 (মন্টু চুপচাপ)  
 মন্টু না ছার, আর কমু না ।  
 (মাস্টারের প্রস্থান)
- মন্টু পুনার ট্যাকার মাস্টারি তাও আবার মায়না বাকি । তাইতেই ঘন  
 ঘন হঙ্গর বাড়ি । একটু সাতে যাইবার চাইছি কি এই ফালাফালি ।  
 (সব প্রস্থান)

## ॥ ৬ষ্ঠ দৃশ্য ॥

(আমির বাদশার প্রবেশ)

আমির বাদশা : আইজ আমার পরানটা কেন এরকম লাগত্যাছে না, আর যে পারি  
 না । দেইখাছি, দেইখাছি, যে রাজ্যে রানি নেই সে রাজ্যে আর  
 শাস্তি নেই । সকলই অশাস্তির কারণ । হায় খুদা তুমি মেহেরবান ।  
 তুমি কইরলে সকলই কইরতে পার ।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী : হায় রে ঘন আইজ দিন যাবৎ রাজবাড়িতে আইসতে পারি নেই ।  
 রাজবাড়ির কী সংবাদ তাও জানবার পাল্লাম না । আইজ যখনে  
 আইস্যাছি তখনে বাদশাজির হজুরে যাই । (পূর্ব দিকে চাইয়া)  
 আদাব বাদশাজি ।

আমির বাদশা : আদাব মন্ত্রী সায়েব । এসেছেন নাকি । আসুন আসুন বসন ।  
 মন্ত্রী : মহারাজ লোকের মুখে শুন্যাছি যে, যে রাজ্যে রানি নেই সে  
 রাজ্যের আর কুলকান্তি নেই । সেখানে সকলি অশাস্তির কারণ ।  
 এখনে আর কি করবাইন, দেইখে শুন্যে একজন ভাল ঘটক নিযুক্ত  
 কইরে একটা সুদৰী রানির উদ্দিশ করান । কেমন !

মন্ত্রী সায়েব, আমি যে রানির নিকট অঙ্গীকার কইরয়াছি, সে মৃত্যু  
 হওয়ার পর আমি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ কইরব না ।  
 মহারাজ একবার যে লোকের মৃত্যু হইয়ে মারা, তার সাতে  
 অঙ্গেকার আর থাকে কোথায় । সে অঙ্গেকারও যে মৃত্যু হইয়ে  
 যায় । ও সব ভুইলে যান মহারাজ ।

**আমির বাদশা :** মন্ত্রী সায়েব আপনার যুক্তি খুব চমৎকার। আপনার যা বুদ্ধি, আপনার বুদ্ধি বলেই রাজত্ব চালাই। থাক, আপনে যা বলেন তাতেই রাজি হইলেম।

(পাগলের প্রবেশ)

**পাগলের গান :** বাদশা হারাইধনে আর তোন  
অহঙ্কার তোর হবে নষ্ট  
হবি অপমান।  
ধনের জোরে এই ভবের পরে,  
ধর্মটাকে দিসনে দূরে  
কানতে হবে দ্বারে দ্বারে  
হবি অপমান।  
হায়রে, অতি আশায় দুর্দশা হয়  
কোরানে প্রমাণ।  
চিনবি রাজা দুইদিন পরে  
ভেইবে দ্যাখ পরিনাম।  
সত্যতা ভঙ্গ করলে  
বুর্ববি, রাজা দুইদিন পরে  
কানতে হবে দ্বারে দ্বারে  
হবিবে আগোয়ান।  
হায়রে কাল রাক্ষসী আইসরে ঘরে,  
ছেলে দিতে বলিদান,  
দিন গেলে পরে  
হাপুত, হাপুত বইলে  
কাঁদিয়ে হলি রে হয়রান।

**আমির বাদশা :** মন্ত্রী সায়েব পাগল যেন কী বইলে গেল। আমার যে আর সাদী করতে ইচ্ছা হয় না। না, না, আমি আর জীবনে বিবাহ করিব না। মহারাজ আপনে কি পাগল হইয়েছেন নাকি ও হইয়েছে একটা বনের পাগল, যা ইচ্ছা তাই বলে। আপনে ওসব ভুইলে যান, মহারাজ?

**আমির বাদশা :** তবে এখন কী করতে হবে মন্ত্রী সায়েব। আপনে যা কন তাই করতে রাজি হব।

**মন্ত্রী :** মেছের শহরে গফুর বাদশার জহুরা খাতুন নামে একটি সুন্দরী কন্যা আছে। তাকে বিবাহ কইবলে আপনার মঙ্গল হবে।

**আমির বাদশা :** মন্ত্রী সায়েব আপনে এই মুহূর্তেই চইল্যা যান, অতি শীত্যি বিবাহ ঠিক কইরা আসেন।

**মন্ত্রী :** মহারাজ শুধু মুখের কথায় চইলবে না। কিছু ট্যাকার দরকার। কিছু পাকা মিঠাই ছাড়া এসব কাজে যাত্রা নাস্তি।

**আমির বাদশা :** তাই হউক, তাতে কি আমির বাদশা বুরুক্ষেপ করে এই নেন টাকা। আপনে এই মুহূর্তেই চইল্যা যান মেছের শহরে। দ্যাখেন বিলম্বনা কইববে না। বিলম্বনায় শুভ কাজে বিম্ব ঘটতে পারে।

(সব প্রস্থান)

## ॥ ৭ ম দৃশ্য ॥

[মেছের শহর। গফুর বাদশার দরবার। গফুর বাদশা দরবারে বইস্যা বইস্যা আছেন। ইরানের মঞ্জীর প্রবেশ]

- মঞ্জী : আদাব বাদশাজি  
 বাদশা : মঞ্জী সায়েব আইসছেন। ওরে কে আছিস। ত্রি আসনটা আমার  
 কাছে আইনা দে। মঞ্জী সায়েবকে আমার কাছে বইসতে দেই।  
 আইচ বহুদিনি পর আমার বাড়িতে আপনার আগমন, কি জন্যে  
 এইসেছেন মঞ্জী সায়েব।
- মঞ্জী : আপনার নাকি একটা কন্যা আছে।  
 বাদশা : হা আছে।  
 মঞ্জী : শুভ সম্বন্ধ নিয়া এইস্যাছি।  
 গফুর : কোথায় কাহার সঙ্গে?  
 মঞ্জী : ইরান শহরের অধির বাদশার সঙ্গেতে এ-সম্বন্ধ করতে চাই।  
 তাতে কি আপনি সম্মত আছেন? যদি আপনার মত থাকে তয়  
 সেই কথাটি আপনে কল।
- গফুর : কী আর করা মঞ্জী সায়েব, আমি যে বাদশার আইজ বহুদিন  
 ধইর্যা কর দিয়া আসিত্যাছি। সেই বাদশার সঙ্গেতে যদি আমার  
 কন্যাকে বিবাহ হয় সেতো আমার সুভাগ্যের কথা। ইয়াতে  
 আমার আর আপিত্য কি। আপনের যা ইচ্ছা তাই দিয়াই আমার  
 কন্যাকে নিয়া যান।
- মঞ্জী : মহারাজ আপনার কন্যাকে লক্ষ ট্যাকার গহনা দেওয়া হইবেক।  
 এখনে একটা মোল্লা ডাইকে বিবাহের শুভ দিনটা ধার্য কইর্যা  
 দ্যান।
- গফুর : কোথায় প্রহরী?  
 (প্রহরীর প্রবেশ)  
 প্রহরী : জাঁহাপনা  
 গফুর : এই মুহূর্তে একজন মোল্লা ডেকে নিয়ে এস।  
 (মঞ্জী ও গফুরের প্রস্থান)  
 প্রহরী : তবেই যাচ্ছি। কোথায় মোল্লা ও মোল্লা সাহেব। বাদশা  
 আপনাকে যাইতে বইল্যাছে। সকালে আসেন।

## ॥ ৮ ম দৃশ্য ॥

(গান গাইতে গাইতে মোল্লার প্রবেশ। প্রহরীর প্রস্থান)

হায় রে খোদা তাল্লা  
 বাদশার বাড়ি হইছে রে দাওয়াত  
 যাইতে হল বেল্লারে আল্লা  
 ওরে খোদা তাল্লা।  
 কোথায় বলি গোলাম বচুল,  
 আইসো দেখি আল্লারে তাল্লা  
 ওরে খোদা আল্লা।

দেরি হইলে তোমার আমার  
কাইট্যা নিবে কল্পারে আল্লা  
হায়রে খোদা তাল্লা ।

(মন্ত্রী ও গফুর বাদশার প্রবেশ)

- মোল্লা : আদাব বাদশাজি আমাকে কী জন্যে আদেশ কইরাছেন ।
- গফুর : আমার কন্যা জহুরা খাতুনের সঙ্গে ইরান শহরের আমির বাদশার বিবাহ তাই কেতাব দেবিয়ে কোন দিনটা ভাল, ঠিক কইয়া দিব্যান ।
- মোল্লা : আগামী ২হরা মাঘ খুব ভাল দিন । ঐ দিন বুধবার কেতাবে লেখে ঐ দিনটা শুভ, বাদশাজি ।
- গফুর : তাই হোক আগামী ২রা মাঘ, বুধবার, আতি উত্তম দিন, কী বলেন মন্ত্রী সায়েব? ঐ দিনই বরপত্র সহ চলিয়ে আসব্যান ।
- মন্ত্রী : আদাব বাদশাজি ।

(সব প্রস্থান)

- আমির বাদশা : আইজ / দিন গত হইয়ে যায় আমার মন্ত্রী কে পাঠাইয়াছি সেই মেছের শহর । আমার সাদী ঠিক কইরতে । এখনও যে সে ফিরত্যাছে না । আমি আর কোনো সংবাদ পাচ্ছি না । আর যে বেলম্ব সহে না ।

(হঠাতে মন্ত্রী সায়েবের প্রবেশ)

- মন্ত্রী : বাদশাজি এই আমি আইস্যাছি । একনে আর কোনো চিন্তা কইরতে হবে না ।
- আমির বাদশা : মন্ত্রী সায়েব যে কাজের জন্য পাঠাইছিলাম, তার কি হইল তাই আগে বলুইন ।
- মন্ত্রী : দ্যাখেন হজুর ধৈর্য হারাইয়ে এ্যাকটু শান্ত হইয়ে কথা কন । সে কাজের শুভ সংবাদ । / লক্ষ ট্যাকার গয়না আর কাপড় লতা যা কিছু লাগে তাতেই স্বীকেতে হইয়ে আমি কাজ ঠিক কইরে আইস্যাছি । আর বিবাহের দিন, আগামী রা মাঘ বুধবার বর লইয়ে চলিলে যাইতে হবে । আপনে প্রস্তুত আইবেন ।

(সব প্রস্থান)

॥ দশম দৃশ্য ॥

( মেছের শহর । গফুর বাদশার প্রবেশ )

- গফুর : এখানে কে আছিস, কোথায় প্রহরী?
- প্রহরী : জাঁহাপনা । (প্রহরীর প্রবেশ)
- গফুর : আগামী বুধবার ইরান শহর হইতে আমির বাদশার বিবাহের বর আইসবে । তুমরা লোকজন জুটিয়ে তয় তদবির করবা । যদি কোনো ক্রটি হয় তবে তোমাদের জান বাঁচাবে না ।

(সব প্রস্থান)

## ॥ একাদশ দৃশ্য ॥

[বিবাহ মজলিশ | প্রথমে গফুর | পরে আমির বাদশা ও মন্ত্রীর প্রবেশ |]

মন্ত্রী : আদাব বাদশাজি, এখনে শিষ্ট কইরে বিবাহ পড়াইয়া দ্যান।

গফুর : মন্ত্রী সায়েব, একটু বিলম্ব করুন, আমি আমার কন্যাকে লইয়ে  
আসি।

### (গফুরের প্রস্তান)

(কন্যাসহ গফুরের প্রবেশ)

গফুর  
প্রহরী : বস মা জহুরা এখানে বস | কোথায় প্রহরী?

গফুর  
প্রহরী : জাঁহাপনা।

গফুর  
প্রহরী : এই মুহূর্তেই একজন মোল্লা ডাইকে আন।

তবেই আমি যাচ্ছি। কোথায় মোল্লা সায়েব?

### (গান গাইতে গাইতে মোল্লার প্রবেশ)

আমার নাম খেইটক্যা মোল্লা,

ওগো আল্লা ঠেকাইল্যা দায়

বাদশার বাড়ি হইছে দাওয়্যৎ

কে যাবিবে আয়।

আমি ফজরের আজান

দেই দুপুরে রে

তবু লুকে মোল্লা কয়

বাদশার বাড়ি হইছে দাওয়্যৎ

কে যাবিবে আয়।

আমি কলমা কালাম জানি না রে

শুধুই মোল্লা বইলে নাম কওলাই

ভাল তবুই লুকে মূলা কয়।

মোল্লা  
গফুর  
মোল্লা : আদাব বাদশাজি, কী জন্যে আমাকে আদেম কইর্যাছেন।

আমার এই কথ্যার বিবাহটা পড়াইয়া দ্যান মোল্লা সাব।

আইছো হজুর যখন হৃকুম কইর্যাছেন বিবাহ তো পড়াইতে হবেই।

মাতাজি আমি যা কই তা ভাল কইর্যা শুইনবেন। ইরান শহরের  
আমির বাদশা ট্যাকা দেনমহর ধার্য করিবে আপনাকে সাদি  
কইরতে আইস্যাছেন। আপনি খুশিতে কবুল দ্যান।

### (বিবাহ শেষ)

গফুর  
মোল্লা : মোল্লা সায়েব। একটা পুথি পড়েন তো শুনি।

আইজ তো পুথি নিয়া আসি নাই বাদশাজি, আর একদিন পড়ব।

### (মোল্লার প্রস্তান)

জহুরার গান:

আমায় দাও গো বিদ্যায়

আমি ছাড়িলাম তোমায়

এত দিনও ছিলাম আমি

ঘরেতে তোমার ।  
 এখন আমি যাইগো ছেইড়ে  
 দাও গো বিদায় ।  
 বহুদিন লালন পালন  
 করিলে আমায়,  
 এখন আমি যাইগো ছেইড়ে  
 ধরি তোমার পায়  
 আমায় দাওগো বিদায় ।  
 (সব প্রস্থান)

## (প্রথম অঙ্ক সমাপ্তি)

## । ২য় অঙ্ক । । ১ম দৃশ্য ।

[আমির বাদশার অন্দর মহল । আমির বাদশা ও রানির প্রবেশ ।]

রানি : (জহুরা) বাদশাজি আমি শুইন্যাছি আপনার নাকি দুইট্টা ছেইল্যা  
 আছে । সেই ছেইল্যা দুইট্টাকে আমার সামনে নিয়া আসুন লাগব ।  
 আমি তাগো একবার দেখুম ।

আমির বাদশা : আচ্ছা রানি এই মুহূর্তেই আমার আমান ও দুলালকে ডাকাই ।  
 কোথায় ধাই? কোথায় প্রহরী?  
 (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী : জাহাপনা ।

আমির বাদশা : তুমি ধাইকে বল আমার আমান ও দুলালকে নিয়া আইসতে ।

প্রহরী : তবেই যাচ্ছি ।

(প্রহরীর প্রস্থান)

(আমান ও দুলালসহ ধাইর প্রবেশ)

আমির বাদশা : রানি এই দেখ আমার আমান ও দুলাল আইস্যাছে ।

রানি : ধাই, এখনে ছেইল্যা দুইটাকে খাইতে দাও ।

ধাই : এই দিচ্ছি রানি মা ।

(ধাইর প্রস্থান)

রানি হায় খুদা তোমার অমর লীলা, কেন এই যুবক দুই ছেইল্যা  
 থাকিতে আমার এই নতুন যৈবন আমি বেড়ু বাদশার নিকট  
 বিলায়ে দিয়াচি । যদি এই ছেইল্যাদের একজনের সঙ্গেতে আমার  
 বিবাহ হইত তবে কত সুখের হইত ।

আমান আম্মা আপনে কি চিঞ্চা করছেন? আপনার মনটা এত ভার হচ্ছে  
 কেন?

কোন কথা তো কন না আম্মা ।

কিসের আম্মা, আম্মা কিরে । ও ডাক আমার শুইন্তে ইচ্ছা হয়  
 না ।

(গান গাইতে গাইতে পাগলের প্রবেশ)

গান

অকে মা বলাইয়ে ভুল  
ও যে কত জানী রাঙ্গসিনী  
আদি নামাঙ্গল ।  
তুই মা বলবি যারে  
সে গিয়াছে দুনিয়া ছাইড়ে  
এখন মা আর বলবি কারে  
শন পাগলের বোল ।  
অকে মা বলাই যে ভুল ।  
হায়রে তোর দরদি গিয়াছে ছাইড়ে  
দিয়া পরের ঘরে  
থাইতে হবে ঝাটার বাড়ি  
হবিবে তুই বনচারী ।  
এই রাঙ্গসিনী করবে আড়ি  
ছাইড়তে হবে সোনার বাড়ি  
ঘুইরতে হবে ঘারে ঘারে  
হইয়ে শিখারী ।  
হায়রে দিন থাকিতে  
ডাক ঘওলারে  
যাবে দুঃখ দূরে ।  
কাঁচা পিতল হবে সোনা  
জেন পাগলের বোল  
অকে মা বলাই যে ভুল ।  
যা বেটো মাথা খারাপ ।

রানি

(সকলের প্রস্থান)

## ॥ ২য় দৃশ্য ॥

(প্রথমে রানির প্রবেশ পরে আমির বাদশার প্রবেশ ।)

আমির বাদশা : রানি, তোমার বদনখানা এত মলিন দেখত্যাছি কেন? তোমার কী  
হইয়াছে বল না। কথা বল না কেন, রানি যে এত নিষ্ঠক হইয়ে  
বইসে আছ। না আমান ও দুলাল তোমাকে কিছু বইয়াছে? কী  
হইয়াছে বল না। একবার বল দেখি শুনি।

রানি : বইলে আপনে কী কইতে পারবেন? দ্যাখেন তো গায়ের জামাটা  
ছিড়া কী কইয়া ফালাইছে। এ গুলা যে কী ছেইল্যা নাকি, ও  
গুইলার চুইড়াঙ্গ ।

আমির বাদশা : কী বল্লা, যে ছেইল্যা নাকি মাত্কে অসম্মান করে অমন কাল প্রচণ্ড  
ছেইল্যাকে আমি আর চাইনে। এখনি জলাদের হাতে দিয়ে তাদের  
মুও কাটিয়ে রঞ্জ আনিতে হকুম দিব। কোথায় ধাই?

(ধাইর প্রবেশ)

ধাই : হজুর আমাকে কী জন্যে আদেশ কইয়াছেন।

আমির বাদশা : তুমি এখনই আমার দুষ্ট পুত্র দুইটিকে নিয়া আইস।

- ধাই : আমি তবেই যাচ্ছি ।  
 (ধাইর প্রস্থান ও দুই ছেলেকে লইয়া পুনরায় প্রবেশ ।)
- ধাই : এই নেন আপনার দুই ছেইল্যা ।  
 (ধাইর প্রস্থান)
- আমান : বাবা আমাদিগকে কী জন্য ডাইক্যাছেন ।
- দুলাল : আম্মা বুঝি আইজও যাইতে দিবার হকুম করব্যান ।
- আমির বাদশা : তোর করছিস মাত্তকে অপমান, তোদের দিব জল্লাদের হাতে ।  
 তোদের গর্দান কাইটে রঞ্জ আইনে দিবে আমার কাছে ।
- আমান : বাবা, আমরাতো আম্মাকে কোন কথাই বলি নাই ।
- আমির বাদশা : তবে কি তোদের বিমাতা মিথ্যা কথা বইল্যাছেরে । দুইট্যা  
 কুপুত্রুর ।  
 (গান গাইতে গাইতে পাগলের প্রবেশ)
- গান বাদশা শুনিসনে অর কথা  
 পরে হাপুত্র হাপুত্র বইলে  
 পায়াগে ভাঙবি মাথা  
 শুনিসনে অর কথা ।  
 ঐ রাক্ষসিনী কথা শুইনে  
 ছেলে দিবি জল্লাদেরে  
 ঝাঁটা মারেক ঐ দুষ্টারে  
 শুনিসনে অর কথা ।  
 হায় রে সোনার চান তুই  
 থাক রে তুর মনের ব্যথা  
 এই দুষ্টা কি জাইনতে পারে  
 সন্তানের কী মমতা  
 সন্তানেরি কী ব্যথা  
 শুনিসনে তুই অর কথা ।  
 দশরথ রাজা ছিল  
 মুনির বরে পুত্র পাইল  
 রামকে বনে দিল  
 শুইনে রানির কথা ।  
 কানতে কানতে জীবন গেল  
 চোখে তার পইল জাতা  
 শুনিসনে তুই অর কথা ।  
 (আমান দুলালের প্রস্থান)
- আমির বাদশা : রানি পাগল যেন কী সব বইলে গেল, আমি তো আর সহ্য কইরতে  
 পারি না ।
- রানি জাঁহাপনা আপনে পাগলের আবল-তাবল শুইনে উন্যাদ হচ্ছেন  
 কেন । ও একটা বনের পাগল । অর কথার কি কোন অর্থ হয়! আমি  
 তো অপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি । আপনে বিচলিত হবেন না ।

**আমির বাদশা :** না না, ওরকম কাল প্রচণ্ড ছেইল্যাকে চাইলে। যে ছেইলে নাকি  
মাত্তকে অসম্মান করে ওমন ছেইল্যাকে এখনি জল্লাদে সুপিয়ে  
দিব। অদের বক্তৃর প্রয়োজন। না না আর কাল বিলম্ব না।  
(গান গাইতে গাইতে পাগলের প্রবেশ)

**গান**

ধন্য ধন্য নারীজাতি  
চোখের পলকে ঘুরায়  
পুরুষের মতি।  
নারীজাতি অবিশ্বাসী  
মুখে বড় ভাল বাসি  
ওরে অঙ্গরেতে গরল রাশি  
পাগল সদায় রতির প্রতি  
জানে শাতক চন্দি ফন্দি।  
বাদশারে তুই ডাইনির জালে।  
হলি এবার চৰম বন্দি।  
ও তোর কাইনতে চক্ষু অঙ্গ হবে  
চিনবি সেদিন খাটাসীরে,  
ওয়ে জাত খাটাসের জাতি  
ধন্য ধন্য নারী জাতি॥

**আমির বাদশা :** রানি আমি যে আর স্থির থাইকতে পারি না। বারংবার ঐ বনের  
পাগল কানৰ কাছে কী যেন চিৎকার করছে। বেটা যেন কি বইলে  
যায়। কথাগুলি আমার পরানে বিন্দিয়া দ্যায়। আমার যে আর ভাল  
লাগে না। ওহ কি আর করি, আমার পরান যেন সর্বদায় ক্ষীর  
হইয়ে আসিত্যাছে, ওহ!

**রানি**

জাঁহাপনা, আপনি ঐ বনের পাগলের কথা আ বিশ্বাস কইবেন  
না। ও হইল বনের পাগল, বনফল খায় আর বনগীতি গায়।  
আপনে স্থির হন। আমি যাহা বলি তাহাই শুনেন। আমি তো  
আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি। প্রাণের চাইয়া বেশি ভালবাসি।  
আপনাকে তিলেকমাত্র না দেইখলে আমি আর স্থির থাকতে পাবি  
না। আপনে আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইত্যাছেন কেন। আমি যে  
আপনাকে ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। ওহ, যদি আমি আপনাকে  
আমার বোকটা ছিড়া দ্যাখাইতে পারতাম।

**আমির বাদশা :** না, না, ঐ কুপুত্রকে আর আমি তিলেক মন্ত্রও সহ্য কইবো না।  
কোথায় জল্লাদ?

(জল্লাদের প্রবেশ।)

**জল্লাদ :** কী জন্য আমায় আদেশ কইব্যাছেন হজুৰ।

**আমির বাদশা :** জল্লাদ, এই মুহূর্তেই তুমি আমার দুইষ্ঠা কুপুত্র দুইট্যাকে হস্ত  
বন্ধন কইব্যাস সম্মুখে নিয়া এইস।

**জল্লাদ**

তবেই আমি যাছি জাঁহাপনা।

(আমান ও দুলালসহ জল্লাদের প্রবেশ।)

**জল্লাদ**

জাঁহাপনা এই নেন, আপনার ছেইল্যা।

আমির বাদশা : যাও, এই মুহূর্তে চইল্যা যাও। অদের গর্দান কেইটে রক্ষ আইনে।  
বাড়ির নিকটে দিয়ে এইস। আর অদের মুক্তি নাই।

(আমান ও দুলালের গান)

গান  
পিতা ধরি তোমার পায়  
মেইর না খাড়া  
অবোধ বালক দয়ের গায়  
বন্ধন জালা সহেনা মাদের  
ছাতি ফেইটে যায়।

আমির বাদশা : রানি, এখন কী করিঃ?

রানি : জাঁহাপনা, আপনে ওদিক আর তাকায়া দেখবেন না। আমি তো  
আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি। আপনে শুধুই আমার দিক তাকায়া  
থাকবেন।

(আমান ও দুলালের গান)  
গান  
মোদের কোন অপরাধ হয়,  
বাহিলেন তয় কিসের দায়।  
কী করিব কোথায় যাব  
না দেখি উপায়।

জল্লাদ : এই চান্দের মত ছেইল্যা দুইটিকে মুক্তি দ্যান।

রানি : কি বলিলি। ওরে জল্লাদ তর প্রাণদণ্ড দিছিঃ দাঁড়া।

আমির বাদশা : রানি, রানি, আমি যে আর স্থির থাকতে পারছিনে।

রানি : জাঁহাপনা আপনে ওদিকে আর ফিরিয়ে তাকায়া থাকবেন না।  
আমি যে আপনাকে প্রাণের চাইতে বেশি ভালবাসি অত্যন্ত  
ভালবাসি।

আমির বাদশা : না, না, ওরকম কুপুত্র আমি আর চাইনে।

(আমান ও দুলালের গান)  
গান  
ও মা ধরি আপনার পায়  
বন্ধন জালায় জুর আইস্যাহে গায়।  
কোন অপরাধ ছিল মাগো  
কপালে মোদের।  
ওমা, মোরা অপরাধী নয়।  
বন্ধন জালা সহে না আর,  
মাগো ধরি আপনার পায়।

জল্লাদ : এই যে চানবদন দুইখনি, আপনে ছাইড়ে দেন জাঁহাপনা, ছাইড়ে  
দেন।

রানি : চুপকর হারামজাদা, তর পরানে ডর নাই। আর একবার প্রাণদণ্ড  
অয় তার আর মুক্তি নেই।

আমির বাদশা : রানি রানি, এখন যে আর সহ্য করতে পারি না। ওহ!

রানি : জাঁহাপনা, আপনে কেন বারবার উদিক ফিরিয়ে চান।

(আমান ও দুলালের গান)

গান	আমরা বুঝিতে না পারি কোন অপরাধে জল্লাদ মোদের হস্তে দাও দড়ি আমরা বুঝিতে না পারি ।
জল্লাদ	এতো আমার হকুম নয়রে বালক, এ-যে তোদের বাবার হকুম । বাদশার হকুম । সে যদি পিতা হইয়ে হকুম দিতে পারে, আর আমি তো জল্লাদ নাম ধারণ কইয়াছি । আমি কেমনে দয়া করিবেক । এইসো বালুকগণ তোমাদের পিতৃ আইজা পালন কইবে লই ।
আমির বাদশা :	যাও জল্লাদ, জল্লাদ কইবে কাজ শেষ কইবে এইস । যে ছেইল্যারা নাকি মাতৃকে অপমান করে তাদের আর চাইনে ।
জল্লাদ	আয়রে বালুকগণ হঞ্চিতে তোদের পিতৃ আইজা পালন কইবে লই । (জল্লাদ, আমান ও দুলালের প্রস্থান) (গান গাইতে গাইতে পাগলের প্রবেশ)
গান	নিভলে তোর বংশের বাতি হল অঙ্ককার । ভেইবে দ্যাখ অঙ্গরের ভিতর চোখ মুদলে সব অঙ্ককার এই ভবের মাঝারে ও তুই ছেইল্যা দিলি জল্লাদের হাতে একবার করবি হাহাকার । নিভলে রে তোর বংশের বাতি হল অঙ্ককার । দিন থাকিতে বুঝলি না রে আর, একবার বুঝবি রাজা দুদিন পরে হলে অঙ্ককার । ও তুই ঘুরবি রাজা দ্বারে দ্বারে কইবে হাহাকার ।
আমির বাদশা :	না, না, আমি ছেইল্যা দুইট্যাকে জল্লাদের হাতে ছাইড়ে দবি না ।
রানি :	জাহাপনা, আপনে ক্ষাত হন, এখনে অন্দর মহলে চলেন । যা হকুম কইয়াছেন তা আর ঘুরাইবান না । (সব প্রস্থান)

## ১ তৃয় দৃশ্য ১

আমান	: জল্লাদ, কী জন্যে আমাদের বন্দি কইবে এই বনের ভিতরে নিয়ে এইস্যাছ?
জল্লাদ	: তোমাদের পিতার আজা পালন করতে আইস্যাছি । তোমাদের দুই ভাইয়ের মুও কাটিয়ে রক্ত দিয়ু রানিকে, ইহা তোমার পিতার হকুম ।

দুলাল	জল্লাদ, তুমি তো খালি একটা জল্লাদ না, তুমি তো একটা মুনুষও । যদি তুমি মানুস তবে তুমি কেমন কইরে আমাদের উপর নির্দয় হইয়াছও । (আমান ও দুলালের গান)
গান	আল্লা তুমি মেহেরবান, মোদের জীবন কর দান । সকলি কইরতে পার তুমি মালেক ছবহান । আল্লা তুমি মেহেরবান । মোরা শুনি কোরানে আল্লা সকলি জানে, ইসমাইলকে উকারিল আরফার ময়দানে ।
জল্লাদ	হায় খোদা, এখন আমি কি করি? আর কোথায় বা যাই । এই ছেইল্যাদের মাতার হাতে কত কিছু খেইয়েছি, তান যে আমায় কত ভাল বাইসতেন তা বইল্যা শেষ কইরতে পারি না । এখন কি করি? উদিক রাজার হৃকুম যদি আমল না করি তাতে আমার চাকুরী যাবে । জান ও যাবে হয়তো । আচ্ছা থাইক, তাই যাইক তেবু আমি এই নিদুষ্টী চাদের মত ছেইল্যাদের গন্দান কইটতে পারবেক না । বাবা আমান বাপ দুলাল, তোমাদের আমি মুক্তি দিচ্ছি । তুমরা আমার একটা পরামশ্য শুন । (জল্লাদের প্রস্তান)
আমান	কী পরামশ্য জল্লাদ । এই রাজার রাজা ছাইড়ে তুমরা অন্য রাজার রাজে চইলে যাও । আর, জীবনে বাইচ্যা খাকতে তুমাদের পিতার সাথে আর দ্যাখা কইরতে আইসো না । আমি একটা পথের কুস্তার রক্ত দিয়ে বাদশার অন্দর মহলের কুস্তাকে বুঝাবেক ।
জল্লাদ	মিয়া ভাই, আমাদের এ-দৃঢ়খের কোন দিনই বা ঘুচবে আর এই ঘোর রাত্রিতে আমরা কোথায় বা যাব?
দুলাল	দাদুভাই, খুদার রহয়ত যদি আমাদের উপর থাকে তা হইলে আমাদের দৃঢ় হবে না । চল ভাই এ বৃক্ষের নিচে আমরা আশ্রয় লই গিয়া । (আমান ও দুলালের প্রস্তান)
আমান	

## ॥ ৪ৰ্থ দৃশ্য ॥

(আমির বাদশার বাড়ি । আমির বাদশা ও রানির প্রবেশ)

রানি : জাঁহাপনা, এখনও যে জল্লাদ ফিরত্যাছে না । আমার পরানটা যে  
অঙ্গুর লাগত্যাছে । বোধহয়, সে আর আইসবেনা ।

আমির বাদশা : না, না, নিশ্চয় সে ফিরিয়া আইসবে । সে বছত দিনের পুইরানা  
জল্লাদ, সে কি ন আইসে পারে? সে নিশ্চয় আসবে ।

(জল্লাদের প্রবেশ)

- জল্লাদ : এই নেন, রানি মাতা, আমান ও দুলালের রঞ্জ নেন।  
 আমির বাদশা : ওহ! জল্লাদ এ কী কইরেছিস, হায় বে, কী নিষ্ঠুর তোর পরান। তোর  
 কি একটুও মায়া হইল না? হায় খোদা তুমি কী কইরলে, আমার  
 গর্দান কাইটলে না কেন? জল্লাদ, তোর কি একটুও দয়া নেই?  
 জল্লাদ জাহাপনা, জল্লাদ তো মানুষ নয়, জল্লাদ খালিই একটা জল্লাদ।  
 আপনে মানুষ হইয়ে নিজের নিদৃষ্টি ছেইল্যাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন  
 আর একটা জল্লাদ, যে একটা পশুর চাইতেও হিংসুক সেই কইরবে  
 দয়া? তারপর আবার মায়া! হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ।  
 আমি কি নিষ্ঠুর হইয়েছি, নিজের পুত্র নিজেই হত্যা কইরতে  
 বইল্যাছি। হায় হায় আমি কী করিলেম। উহ! আর সহ্য হয় না।  
 এখন কী করি। এইসো বাবা আমান, বাবা দুলাল, কৈ কৈ আর  
 ফিরিয়ে এলো না তারা। আমার তাপিত পরান শীতল করলে না।  
 জাহাপনা, আপনে এখন ক্ষান্ত হন, চলুইন, অন্তঃপুরীতে চলুইন।  
 (সব প্রস্থান)

## ॥ ৫ম দৃশ্য ॥

(জখিমান মুনুকের বাদশা শাহজাহান শাহের দরবার।)

(শাহজাহান শাহের প্রবেশ)

- শাহজাহান শাহ : অনেকদিন হয় একবার গিয়েছিলাম সেই ইরান শহর আমির  
 বাদশার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেম। আইজ স্বপনে  
 দেইখ্যাছি আমির বাদশা তার ভাগ্যবান ছেইল্যা দুইটাকে মৃত্যুদণ্ড  
 দিয়াছে। কত বড় রাজত্বি আমির বাদশার। এত বড় বাদশাই আর  
 কার আছে? যদি একবার ঐ বাদশাই দখল কইরতে পারতাম।  
 এখন পুত্র শোকে নিষ্য আমির বাদশার মন খুব দুর্বল। এই তো  
 সুযোগ। দেখি একবার যদি ইরান জয় করতে পারি তয়  
 শাহজাহানের সাথে সারেজাহানে আর লাগে কে? কোথায় প্রহরী?

(প্রহরীর প্রস্থান।)

- প্রহরী : জাহাপন।  
 শাহজাহান : এই মুহূর্তেই আমার মন্ত্রীকে ডাইকে আনাওন কর। এবং একখানা  
 পরোয়ানা নিয়ে সেই ইরান শহরে আমির বাদশাকে জানায়ে দেও  
 যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে।

(সব প্রস্থান)

## ॥ ৬ষ্ঠ দৃশ্য ॥

(আমির বাদশাহের দরবার। আমির বাদশাহের প্রবেশ।)

- আমির বাদশা : হায়রে মন, আমি যে কিছুই বুইবতে পারি না। আমার শরীর যে  
 অবশ হইয়ে আসিত্যাছে। মনে যে কেন প্রকারেই শাস্তি পাচ্ছে  
 না। এখন কী করি আর কোথায় বা যাই!  
 (দৃতের প্রবেশ)  
 দৃত : আদাৰ বাদশাজি, এই নেন যুদ্ধের পরওয়ানা।  
 (দৃতের প্রস্থান)

## ॥ ৭ম দৃশ্য ॥

(শাহজাহান শাহের দরবার। শাহজাহানের প্রবেশ)

- শাহজাহান : কোথায় প্রহরী?  
 (প্রহরীর প্রবেশ)
- প্রহরী : জাঁহাপনা।
- শাহজাহান : এই মুহূর্তেই আমার মন্ত্রীকে ডাকিয়ে নিয়ে এইস।
- প্রহরী : তবেই আমি যাচ্ছি হজুর।  
 (মন্ত্রীর প্রবেশ)
- মন্ত্রী : আদাৰ, বাদশাজি।
- শাজাহান : মন্ত্রী সায়েব যে রাজত্বের জন্য আমি বহু যুদ্ধ কইয়াছিলাম সেই  
 রাজত্ব দখলের এবার সুযোগ জুটিয়াছে। এখনে আপনে লোকজন  
 নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।
- মন্ত্রী : জাঁহাপনা, আমরা প্রস্তুত আছি।  
 (সব প্রস্থান)

## ॥ ৮ম দৃশ্য ॥

(আমির বাদশার দরবার। আমির বাদশার প্রবেশ)

- আমির বাদশা : কোথায় সেনাপতি?  
 (সেনাপতির প্রবেশ)
- সেনাপতি : আদাৰ, জাঁহাপনা, আমায় কী জন্য ডাইক্যাছেন।
- আমির বাদশা : সেনাপতি সায়েব, যে শাহজান বাদশা এতদিন পর্যন্ত আমাকে কর  
 দিয়া আসিয়াছে সেই এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ কইয়তে প্রস্তুত  
 হইয়াছে। আপনে লোকজন নিয়া প্রস্তুত হন।
- সেনাপতি : জাঁহাপনা, আমরা সর্বদা প্রস্তুত আছি। আপনার কোনো  
 চিন্তা কইয়তে হবে না, আপনে অস্তঃপূরীত গমন করুন।  
 (সব প্রস্থান)

## ॥ ৯ম দৃশ্য ॥

- (যুদ্ধ লাগিল। প্রথমে আমিরের সেনাপতির, পরে শাজাহানের সেনাপতির প্রবেশ)
- আমিরের সেনা : এই বেটা তুই কে, কী প্রয়োজনে হেথায় এইস্যাছিস? যুদ্ধ প্রেস্তুত  
 হ। নয়তো এই মুহূর্তেই পরান লয়ে পলায়ন কর।
- শাজাহান সেনা : কি বলিলি পরান লইয়ে পলায়ন করব আমি? একবার ধর অস্ত  
 করবন। রণক্ষেত্রে বুঝা যাবে কে কেমন জন।  
 (যুদ্ধ)

## ॥ ১০ম দৃশ্য ॥

(আমির বাদশার দরবার। আমির বাদশার প্রবেশ)

- আমির বাদশা : আইজ সাতদিন যাবৎ যুদ্ধ হইত্যাছে, শুনিলাম রণক্ষেত্রে বহুত  
 মানুষ মারা গেছে। যদি আমার বাদশাই যায়, তবে আমি কেন  
 একা ঘরে বইসে থাকপো? আমিও রণক্ষেত্রে যাব। দেখি  
 শাহজাহান বাহতে কত শক্তি রাখে।

## ॥ ১১শ দৃশ্য ॥

(আমির বাদশার যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন)

আমির বাদশা : এইবার এইসো শাজাহান, এইসো দেখি আমার সম্মুখে, তোমার  
শিরচেদ কইর্যা আকাশে উড়াইয়ে দিব।  
(শাহজাহানের প্রবেশ)

শাহজাহান : ভয় নাই। ভয় নাই, আর মন্তক আকাশে উড়াইয়ে দিতে হবে না।  
এই আমি এইস্যাছি তোমার সম্মুখে। দেখা যাক, অঙ্গে শক্তি  
পরীক্ষা হইক, মুখে নয়।  
(আমির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন)

## ॥ ১২শ দৃশ্য ॥

শাজাহান	: কোথায় প্রহরী?
প্রহরী	: জাঁহাপনা।
শাজাহান	: এই মুহূর্তেই আমার মন্ত্রীকে ডাকিয়ে আনয়ন কর।
প্রহরী	: তবেই যাচ্ছি হজুর। (মন্ত্রীর প্রবেশ)
মন্ত্রী	: আদাৰ জাঁহাপনা, কী জন্য আমাকে আদেশ কইয়াছেন।
জাঁহাপনা	: মন্ত্রী সায়েব, এখন তো যুদ্ধে জয়ী হইয়েছি, এখন কী করা যায়।
মন্ত্রী	: চলুইন এই আমির বাদশার অন্দর মহল গেরেফতার কইৱে বাদশাও তার রানিকে বন্দি কইৱে আনি।
শাজান	: তাই হউক মন্ত্রী সায়েব চলুইন। (প্রস্থান)

## ॥ ১৩শ দৃশ্য ॥

(আমির বাদশার অন্দর মহল)

আমির বাদশা : রানি যুদ্ধে পরাজয় হইয়ে এইস্যাছি। যে নাকি বৃহত দিন যাবত  
আমাকে কর দিয়া আসিত্যাছে আইজ আমরা তার পায়ের তলে।  
এখনেই আমাদের অন্দর মহল গেরেফতার কইৱে আমাগো বন্দি  
কইৱবে।

রানি : জাঁহাপনা চলুন এই মুহূর্তেই আমরা পলায়ন কৰি।  
(সব প্রস্থান)

শাজাহান : মন্ত্রী সায়েব লোকের মুখে যা শইন্যাছি আসলেও তাই দেখি। আমির  
বাদশা তো পলায়ন কইয়াছে। যাইক একজন বাইজি লইয়ে আসুন।  
এত দিনের ক্রান্তির পর একটু আমোদ ফূর্তি কৰা যাক।  
(বাইজির প্রবেশ)

বাইজির নাচ-গান: প্রেমের গাছে বানচি রসের হাড়ি,  
আমি যার লাগিয়া বানলাম হাড়ি

সেও হল দেশতরী গো ।  
 আমার বন্ধু আছে কিনা খবর আনতে  
 কেও গেল না গো  
 বিধি মোরে দেও পাখা  
 উড়িয়ে তালাস করি ।  
 প্রেমের গাছে বানচি রসের হাড়ি ।  
 (সব প্রস্থান)

## ২য় অঙ্ক সমাপ্ত

### ॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥ ১ম দৃশ্য ॥

(গভীর বন । আমান ও দুলাল কথা বলছে)

- আমান : দুলাল, তুই তো ডরাস না ভাই ।
- দুলাল : না ডরাই না, কিন্তু খিদায় যে বড় কষ্ট পাইত্যাছি মিএওভাই ।
- আমান : আচ্ছা দেখি তোর জন্য কিছু ফলমূল যোগাড় করতে পারি কিনা ।  
 তুই এইখানেই থাকিস ।

(সব প্রস্থান)

(আমানের প্রবেশ)

- আমান : কৈ আমার ভাইয়ের জন্য তো কিছু যোগাড় করতে পারি নাই ।  
 (এক দরবেশের প্রবেশ)

আরে বালক, এই ঘোর রাত্রে গভীর বনে কোথায় খাবার পাইবা ।  
 আপনে যে কে তা আমি চিনতে পারি নাই । কিন্তু আমার ভাইয়ের  
 যে বড়ই খিদা লাইগ্যাছে, কী করি আমি!

দরবেশ : আর তোমার বনে বনে ঘুইরতে হবে না । এই নাও একটা ফল  
 দিলাম । এইটা খাইলেই আর খিদা খাইকবেনা ।

আমান : দরবেশ সায়েব এটা কী ফল ?  
 দরবেশ : এটাকে বলে কর্মফল । এই ফল খেইলে যার কর্মে যা আছে তা  
 অল্প দিনের মধ্যেই জেইগে ওঠে ।

(দরবেশের প্রস্থান । দুলালের প্রবেশ)

আমান : ভাই এই নাও তোমার ফল । এই কর্মফল খেইলে যার কর্মে যা  
 আছে তা অল্পদিনের মধ্যেই জেইগে ওঠে ।

দুলাল : (ফল খেয়ে) মিয়া ভাই, ফল খাইয়ে যে আমার পানির পিপাসা  
 লাগল । এখনে আমায় একটু পানি এইনে দ্যান ।

আমান : ভাই, তুমি একটু বিলম্ব কর । আমি যাই দেখি পানি মিলে কিনা ।  
 (সব প্রস্থান)

### ॥ ২য় দৃশ্য ॥

(একটা পুরুরের পাড়ে আমান)

- আমান : হায়রে কত জপল ঘুরিলাম কিন্তু এমন একটা পুরুই তো  
 কোনখানে দেখি নাই । এখনে অগ্রেতে প্রাণ ভইরে পানি পান  
 কইরে লই পরে পানি লিয়া যাব ।

(পানি পানরত আমানকে উপর থেকে দেখে রাজকন্যা পাগল হয়)

- রাজকন্যা : দাসী, এই দ্বিতীয় আকাশের চান আইসে ওপারের ঘাটে পানিতে  
নাইম্যাছে। আমি যে আর সইতে পারি না। ধৈর্য আর নেই। মনে  
হয়, কেমন কইবে ওর কাছে যাই। আর যে সহে না প্রাণে।
- দাসী রাজকন্যা, একটু ধৈর্য ধইয়ে থাকেন, আমি সুযুক্তি দিব। এখন চলুন  
অন্দরমহলে গমন করি গিয়ে। উজিরকে পাঠায়ে দিব, উজির আইসে  
ছলে বলে কৌশলে উহাকে ধরে আইনে আপনার কাছে দিবে।
- (রাজকন্যা ও দাসীর প্রস্থান)
- উজির এখানে তুমি কে, ভূত পেত না দানব, না মানব? এখানে কী জন্মে  
এইস্যাছ।
- আমান এখানে তেষ্টা পেইয়ে পানি খাইতে এইস্যাছি, আমি একজন মানুষ,  
আম্যাক দেইখ্যা ভয় করিব্যান না। আমার ছোট ভাইয়ের জন্য  
এই পাত্রে একটু পানি লিয়া যাব।
- উজির এই বেটা জানিস না এই পুরুইর আমাদের রাজ কন্যার পুরুইর।  
তার বিন্য হুকুমে ক্যান পানি খাওয়াইচিস বল?
- আমান : খেইয়াছি বেশ কইয়াছি। আরও পানি আমি লিয়া যাব।
- উজির : কী রে বেটা আমার কথা শুনস না আমি তুকে জোর কইবে ধইবে  
নিয়ে রাজ কন্যার কাছে হাজির করবেক।
- আমান আমি বিন্য থুইছে তোমার হাতে ধরা দিব না।
- উজির তবে ধর অন্ত, , কর রণ।
- (যুদ্ধে আমান হারিল)
- উজির চল বেটা চল তুকে কয়েদ খানায় লিয়া যাব।

### ॥ ৩য় দৃশ্য ॥

(সুনার বালাখানা রাজকন্যা ও দাসীর প্রবেশ। পরে উজির ও আমানের প্রবেশ)

- রাজকন্যা : হায় দাসী, তবে কি আমার আশা নিষ্ফল হইল। এখনও যে উজির  
ফিরত্যাছে না।
- দাসী হে রাজকন্যা একটু ধৈর্য ধইর্য থাকেন। এখনেই উজির ফির্য  
আইসবেক।
- উজির রাজবালা, এই ল্যান আপনার সেই লোক। ইহাকে আমি বন্দি কইবে  
আইনেছি।
- (উজিরের প্রস্থান)
- রাজকন্যা দাসী, তুমি এক্ষেনই পোষাক অনায়ন কর। আমি ইহাকে পোষাক  
পরাইয়া ইহার গলায় মালা দিব। (পোষাক পরান হইল)
- রাজকন্যা প্রাণেশ্বর এখন চলুইন অন্দরমহলের ফুলবাগিচায় প্রবেশ করি।
- (সব প্রস্থান)
- দুলাল হায় খোদা, ভাই আমাকে ফেইলে পানি আনতে গেল সে আর ফির্য  
আইল না। এখন কী করি কোথায় যাই।
- পানি আনতে গেল ভাই
- আর তো খবর নাই

কলেজা মোর ফাইটে যায়  
 পানির পিয়াসায়,  
 আকাশে, সূর্য অন্ত যায়  
 এখন যাবরে কোথায়।  
 আমি না দেখি উপায়।  
 ফতেমার অঞ্চলেরই ধন  
 ছিলেন এমাম আর হোসেন  
 পানি বিনে কারবালাতে  
 ত্যাজিলেন জীবন।  
 কি যে কষ্ট তারা পেইলেন  
 বুবিলাম এখন।

ঘূরতে ঘূরতে দুলালের নতুন বাদশার বাড়ি আগমন। নতুন বাদশা  
 দরবারে বইসা আছেন।

- দুলাল : এখানে দরজার সম্মুখে কে আছো। দরজাটা খুইল্যা দ্যাও আমি  
 তোমাদের বাদশার সাথে দেখা কইরতে আইস্যাছি।
- দারোয়ান : কে রে বেটা, দরজার সম্মুখে চিল্লাইত্যাছস।
- দুলাল : আমি পথিক বালক। তোমাদের বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চাই।
- দারোয়ান : তুমি এইখানে দাঁড়ায়া থাক। আমি বাদশার নিকট শুইনে আসি।  
 (দারোয়ানের প্রস্থান)। (দারোয়ানের রাজদরবারে প্রবেশ)
- দারোয়ান : সেলাম হজুর। একজন পথিক বালক আপনার সঙ্গে দেখা করতে  
 চায়।
- নতুন বাদশা : না, না, ও সব হচ্ছে না। রানির অসুখ। আমি অন্দর মহলে যাচ্ছি।  
 (দারোয়ানের প্রস্থান ও বালকের কাছে আগমন)
- দারোয়ান : ওরে বালক, তোমার আমা বিফল হইয়াছে।
- (সব প্রস্থান) (বালক বনের ভিতর দ্যা চইল্যাছে উজিরের সাতে দ্যাখা হইয়াছে।)
- উজির : ওহে বালক তুমি এই বনের ভিতর কোথায় যাচ্ছ।
- বালুক : আমি আর কোথায় যাব। আমার (দুলাল) কেউ নেই, তাই বনে বনে  
 ঘুইরে বেরাচ্ছি।
- উজির : আইচ্ছা বালুক, আমি যদি তোমার ধর্মবেটা বইলে রাখি, তয় কি তুমি  
 আমার বাড়ি থাকবি।
- দুলাল : হজুর আপনে যদি এত দয়া করেন তখনে আপনার ছেইল্যা হইয়া  
 থাকতে আমার কোন আপত্তি নাই।  
 (সব প্রস্থান)

### । ৪ৰ্থ দৃশ্য ।

(উজিরের অন্দর বাড়ি)

উজির : আরে লেয়া গিন্নি?

উজির গিন্নি : এত হাটাহাতি করছ ক্যান। কী হইয়াছে তোমার?

- উজির : এই দ্যাখ একটা সোনার পুত্র নিয়া এইস্যাছি । আমাদের যখন কোনো সত্ত্বার নাই, তখনে এইটি তোমার ছেইল্যা ।
- উজির গিন্নি : বলত বাবা, তোমার নাম কী?
- বাল্পক : মা, আমার নাম দুলাল ।
- উজির গিন্নি : (দুলালকে কোলে তুইল্যা লইয়া) বাবা দুলাল তুমি আমার বেটা, আর আমি তোমার মা । কেমন?
- (সব প্রস্থান)

### । ৫ম দৃশ্য ।

(রহিম সদাগরের বাড়ি)

রহিম সদাগর : হায় রে মন আমি তিন বছর ধইয়া একটা দালান তৈয়ার করাইত্যাছি । কিন্তু কোন মতেই কাজ শেষ হয় না । শুধু ভেইসে ভেইসে যায় । আইজ খুয়াপে দেখিলাম যে দালানের ভিটায় নরবলি দিলে আর দালান ভাইংবেনা । কোথায় প্রহরী?

(প্রহরীর প্রবেশ)

- প্রহরী : জী হজুর আমাকে কি জন্য আদেশ কইয়াছেন?
- রহিম সদাগর : তুমি এই মুহূর্তেই তুলাই কইয়া দ্যাও যে এক লক্ষ টাকা দিয়া একজন মানুষ ত্রয় করা হবে ।
- (সব প্রস্থান)
- (প্রহরীর ঢোলের খবর উজির শুনিল)
- (উজিরের প্রবেশ)
- উজির : আরে, আমি আমি একজন মানুষ দিতে পারি । একটু বেলুষ কর ।
- (প্রস্থান)

### । ৬ষ্ঠ দৃশ্য ।

(উজিরের বাড়ির অন্দর)

- দুলাল : মা আমায় খানা দ্যাও ।
- উজির গিন্নি : বাবা, এই নাও তোমার খানা ।
- (উজিরের প্রবেশ)
- উজির : আরে কৈ গ্যালে গিন্নি?
- উজির গিন্নি : কেন কি হইয়াছে তোমার?
- উজির : কই সে ছেইল্যাটা কোথায় । তাকে আমার কাছে এইনে দাও । আমি তকে এক লক্ষ ট্যাকায় বিক্রি কইবে এইসেছি ।
- উজির গিন্নি : সে যে এখনে খাইতে বইস্যাছে । এখন তাকে দেওয়া যাবে না ।
- উজির গিন্নি : না গিন্নি, তা চাইলবে না, আমি যে তাকে বিক্রি কইবে ফেইলেছি ।
- উজির : এত কঠিন তোমার দেল । নিজের ছেইল্যা বইল্যা গ্রহণ কইয়া আবার তাকে বিক্রি কইবাছ । এতই কঠিন তোমার প্রাণ ।
- উজির গিন্নি : গিন্নি, সে তো আর আপনা ছেইল্যা নয়, ট্যাকা পেইয়ে বিক্রি কইব তাতে আর তোমার এত আপত্তি কেন ।

গিমি

দ্যাখ, আমি যাকে নাকি ছেইল্যা বইল্যা গ্রহণ কইয়াছি আর যে  
আর সে আমাকে মা বইলে ডাক দিয়াছে সে সত্যই আমার  
ছেইল্যা। আমি কিছুতেই তাকে দিব না।

উজির

ছেইড়ে দাও গিমি ও সব নীতি বাক্যি, আমি ও সব শুইনব না।  
(দুলালকে লইয়া উজিরের প্রস্থান)

উজির গিমি

হায় দুলাল, তোকে ছিনিয়ে নিয়ে গ্যাল, কিছুতেই তোকে রক্ষা  
করতে পারলাম না। উহ! কী যে বেদনা। যাক আমিও তোর পিছে  
পিছে আসিয়াছি।

(প্রস্থান)

## ১৭ ম দৃশ্য ॥

(রহিম সওদাগরের বাড়ি) (উজিরের প্রবেশ)

উজির : এইন্যাছি মানুষ। এখনে ট্যাকা দাও।

প্রহরী : এই ল্যান আপনা ট্যাকা।

(সব প্রস্থান)

রহিম সওদাগর : প্রহরী কোথায়?

প্রহরী : জি, হজুর।

রহিম সওদাগর : আইজের মত একে আটক কইরে রেখে দাও। কাইল বেলা ২টায়  
ইহাকে বলি দিব।

(সব প্রস্থান)

(পরদিন বেলা ২টায়)

রহিম সওদাগর : হে বালক বলতো তোমার কী খাইতে ইচ্ছা হয়।

দুলাল : হজুর আমার কিছুই খাইতে ইচ্ছা হয় না। শুধু একটা গান গাইতে  
ইচ্ছা হয়।

রহিম সওদাগর : আচ্ছা, তোমার জীবনের শেষ গান গাও।

দুলালের গান : কোথায় রালি আমার মা

মাগো ডাকলে শুন না,

জন্মের মত ছেইড়ে গেলাম

মাগো আর মা বলবো না।

(ওরে) আমার আর তো কেহ নাই,

বলব কাহার ঠাঁই।

রক্ষা কর কাদের গনি

আমার আরতো গতি নাই।

পাগলের গান : ও তুই বড়ই রে বেইমান,

মানুষ হইয়ে দ্যাস মানুষ বলি

তুই হলি রে অজ্ঞান।

তুইরে বোকা জান হারাইয়ে

মানুষ কিনিস ট্যাকা দিয়ে।

অমূল্য ধন মানুষের জীবন

কোরানে প্রমাণ।

মানুষের মইধ্যে আছেরে মানুষ ।  
 দেখলে চমকিয়ে উঠে রে প্রাণ  
 সেই মানুষ কেন দাও বলি  
 তই হলি রে অজ্ঞান ।

- রহিমা সওদাগর : যা তোর কথা আমি শুইনব না, তুই একটা পাগল । এই বালক তুই  
 এইখানে সোজা হইয়ে শুইয়ে পড় আমি তকে বলি দিব ।
- দুলাল : হজুর আমায় কেন বলি দিবেন, ভবে আমার কেউ নাই, আমি এক  
 এতিম । আমি কোনোদোষ করি নাই হজুর ।
- রহিমা সওদাগর : আরে বোকা, সব' বলি কি আর দোষ করার জন্য হয়রে, তুই  
 অতসব বুঝবি না; তুই শুইয়ে পড় । সটান শুইয়ে পড় ।  
 (দুলাল শুইয়ে পড়িল । উজির গিন্নি ও সদাগর গিন্নি এসে দুলালের  
 জীবন রক্ষা করে)
- সদাগর গিন্নি : এমন সুনার ছেইল্যা কোথায় পেইলে বইন?
- উজির গিন্নি : একদিন ইহাকে বনের ভিতর পাওয়া গিয়াচিল ।
- সদাগর গিন্নি : বইন, ছেইল্যাটিকে আমার দাও । আমার একমাত্র মেয়েকে ইহার  
 সঙ্গে বিবাহ দিই ।  
 (উজির গিন্নি বড় ইচ্ছা হইল যে পুরান ইষ্টিতা আবার নতুন হৈক ।  
 সে সম্মত হইল 'বিবাহ হইয়া গেল)  
 (সব প্রস্থান । তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত)

## । চতুর্থ অঙ্ক । ১ম দৃশ্য।

(সদাগর কন্যা ও দুলাল রাত্রিতে সদাগরের বাড়ির পাশের বাগানে বেড়াইত্যাছে) ।

- সদাগর কন্যা : প্রিয়, বিবাহের পূর্ব রাত্রিতে আমি খোয়াব দেইখ্যাছিলাম যে  
 আকাশ থিক্কা চানটা খাইস্যা সোজা আমার হাতে চইল্যা আসল ।
- দুলাল : থাক এত দুষ্টামি কথার কাজ নাই । সবী এখন একটা গান কর  
 দেবি । গাছের পাতার ফাকে যে চাঁদের আলো আইস্যাছে ইহাতে  
 মনের মধ্যে শুধুই গান উটে ভেইসে ।  
 (সদাগর কন্যা গাইত্যাছে)
- সবি রে কাঁদে আমার প্রাণ  
 মনে বলে, শত জন্ম পর ।  
 ধরিয়েছি এবার, আকাশেরি চান ।  
 সবি আর বইলব কত ...  
 (চিংকার শুনা গেল কে কোথায় আছ রক্ষা কর ।)
- দুলাল : প্রহরী ।  
 প্রহরী ।  
 হজুর ।
- দুলাল : বিশজন পালোয়ান ভাইকে আন । (পালোয়ান হাজির) বিপদ স্থানে  
 যাইয়ে দ্যাখ ডাকাইভের দল পলায়ন কইয়াছে ।  
 একে, মিয়া ভাই যে, (ছালাম করিল ।)

আমান	দুলাল, দুই এখনও বাইচ্যা আছাস। আহ কী নিষ্ঠুর আমি। আমি তোর কথা ভুইল্যা গেছিল্যাম।
দুলাল	চলুন মিয়া ভাই আমাদের গরিবখানায় যাই।
আমান	না অন্য দিন যাব। (সব প্রস্তান)

### ॥ ২য় দৃশ্য ॥

(সদাগরের অন্দরমহল। পিছনদারের পাশে ভিখারীর চিৎকার।)

দুলাল : চল সবী, যাই দেবি, ভিখারী এত চিৎকার করে কেন?

(দুইজনের প্রস্তান। ভিখারীর প্রবেশ। দুলাল ও সদাগর কন্যার প্রবেশ।)

দুলাল : এই ভিখারী, তুমি কী চাও। তোমার ঘর কোথায়।

ভিখারী : আর বাবা, পথে ঘর, পথে বাড়ি। একদিন আমাও দিন আছিল।  
আমি আছিলাম ইরান শহরের বাদশা সারে জাহানের বড় বাদশা।  
কপালের ফ্যারে বাবা, কপালের ফ্যারে। সোনার চান দুই ছেইল্যা  
আমার আছিল। তাদিগকে আমি জল্লাদের হাতে সম্পন্ন কইরাছি।

(কপালে থাপুর)

দুলাল তাদের নাম ছিল কী?

ভিখারী বাবা, তাদের নাম আছিল আমান আর দুলাল। আচ্ছা, বাবারে  
তোমার নাম কী?

দুলাল বাবা আমি আপনার সেই দুলাল। আর কাইদব্যান না বাবা, আর  
কাইদব্যান না।

ভিখারী (আমির বাদশা) : হায় খোদা, তুমি সব করনেওয়ালা। কেন আমি ইহা কইরাছিলাম।  
আহা, আমি বিনা দোষে নিজের পুত্রগো মৃত্যুদণ্ড দিছিলাম। আমি  
একটা জানোয়ার। থাক এই হইয়াছে ভাল, আমি আইজ পথের কুকুর  
হইয়াছি, আমার আরও সাজা হওয়া উচিৎ। যাই বাবা, আমি যাই।

দুলাল বাবা আপনের কোনো দোষ নাই। পিতার কোনো দিন দোষ নাই।  
ডাইনীর কহকে পইছে মানুষের মতি স্থির থাকে না। তাই বইল্যা  
মানুষ চিরতরে পশ হয় না। আর আপনে তো পিতা, সন্তানের কাছে  
পিতার দোষ থাকার নাই। মিয়া ভাইর সাথে আমার দেখা হইছিল  
তিনি রাজা হইয়েছেন। আমি তাকে খবর দিয়াছি। আপনে  
আমাদের সঙ্গে চলুন। আমরা অন্দরমহলে যাই।

### ॥ ৩য় দৃশ্য ॥

(সদাগরের অন্দর। আমির বাদশা দুলাল ও পরে আমানের প্রবেশ)

আমির বাদশা : বাবা, দুলাল, আমান আইল না। সেকি আর আসিবে না, কেনইবা  
আইসবে একটা নরাধমের সাতে দ্যাখা করতে আইসবে ক্যান।

দুলাল বাবা, আপনে দৈর্ঘ্য ধরেন। নিশ্চয় মিয়া ভাই আসিবেন।

(আমানের প্রবেশ।)

আমান : দুলাল, ইনি কে ?  
 দুলাল : মিয়া ভাই ইনাকে চিনিতে পারলেন না, ইনিই আমাদের পিতা।  
 আমির বাদশা : তাদিগকে জল্লাদের হাতে সম্পন্না কইবে আমি কয়েক দিন মাত্র  
 সুখে ছিলাম। তারপর শাহজাহান আমার রাজ্য কাইরা নিয়া গেল।  
 আমি পথের ভিক্ষুক হইল্যাম।  
 আমান কে, শাহজাহান? এন্দৰ শক্তি ধরে সে? আচ্ছা, দেখি শাজাহান  
 কোনো পথে হাঁটে?  
 আমির বাদশা : আশীর্বাদ করি, বৎস, হত রাজ্য উদ্ধার কর।  
 (সব প্রস্থান)

### । ৪ষ্ঠ দৃশ্য ।

(সদাগরের বাড়ি। আমান দুলালের প্রবেশ।)  
 আমান : কী করা যায় দুলাল?  
 দুলাল : এই মুহূর্তেই একটা পরওয়ানা শাজানের নিকট পাঠান হোক।  
 কোথায় প্রহরী?  
 (প্রহরীর প্রবেশ)  
 হজুর, কী জন্য আদেশ কইব্যাছেন আমায়।  
 এই মুহূর্তেই এই প্রত্য নিয়ে শাজাহানকে জানিয়ে দাও যুদ্ধের জন্য  
 সে যেন প্রস্তুত থাকে।  
 প্রহরী তবেই আমি যাচ্ছি।  
 (সব প্রস্থান)

### । ৫ম দৃশ্য ।

(শাজাহানের দরবার। দৃতের প্রবেশ)

দৃত : আমান বাদশা নামদার। এই নিন যুদ্ধের পরওয়ানা।  
 (প্রস্থান)  
 শাজাহান আইচ্ছা দেখি, সত্যই তো যুদ্ধের পরওয়ানা। এখনকার উপায়  
 কী। কোথায় প্রহরী?  
 প্রহরী জাঁহাপনা।  
 শাজাহান এই মুহূর্তেই উজিরকে ডাইকে নিয়া আইসো।  
 (উজিরের প্রবেশ)  
 উজির আদাৰ, বাদশাজি।  
 শাজাহান আপনি সেনাপতিকে বলেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে।  
 (সব প্রস্থান)

### । ৬ষ্ঠ দৃশ্য ।

[যুদ্ধ। আমানের সেনাপতি ও শাজাহানের সেনাপতির মধ্যে যুইঙ্ক। শাজাহানের  
 সেনাপতি পরাজিত। শাজাহানের সঙ্গে আমান ও দুলালের যুদ্ধ: শাজাহান বন্দি।]

**আমির বাদশা :** ভাবছিল শাজাহান ক্রমে ক্রমে সারেজাহানের মালিকানা পাবে। কিন্তু আইজ তোমার সে স্বপন ব্যথা হয়ে গেল, আইজ তুমি বন্দি।  
**শাজাহান** বাদশা আমিরুল মোমেনিন। বন্দি হইলেও শাজাহান বীর, সে বীরের হাতে বন্দি হইয়াছে। একটা কুকুরের হাতে বন্দি হয় নাই।  
 (সব প্রস্থান)

### । ৭ম দৃশ্য ।

(আমির বাদশা, আমান ও দুলালের প্রবেশ)

**আমির বাদশা :** বল তো বাবা তোমরা কীভাবে মুক্তি পেয়েছিলে।  
**আমান :** বাবা, সেই জল্লাদ আমাদিগকে মুক্তি দ্যায় কথা হায় যে আমরা সারাজীবন আর এ-দেশে আসব না।  
**আমির বাদশা :** ধন্য বেটা জল্লাদ, এই কে আছাও, কোথায় প্রহরী?  
 (প্রহরীর প্রবেশ)  
**প্রহরী :** জাঁহাপনা, আমাকে কীজন্য আদেশ কইয়াছেন।  
**আমির বাদশা :** তুমি এই মুহূর্তেই ঢ্যারা পিটাইয়া জানাইয়া দ্যাও- যে কালাইন্যা জল্লাদকে আমার কাছে লিয়ো আসতে পাইববে, তাকে একলক্ষ ট্যাকা পুরকার দেওয়া হবে।  
 (চোল শুইন্যা জল্লাদের আগমন।)  
**জল্লাদ** আদাৰ জাঁহাপনা, আৱ চোল দিয়া পুরকার দিতে হইবে না। অমি অপৰাধী। এই ন্যান আমি মন্তক পাহিত্যা দিছি। এখনে শিরচ্ছেদ কৰেন। জল্লাদ শুধু কল্পা নিতে ছ্যান না। অপৰাধ হইলে কল্পা দিতেও জানে।  
**আমির বাদশা :** ওঠ ভাই জল্লাদ। তোমার দুইটি হাতে ধইৱা মিনতি কৱি তুমি আমার আৱ লজ্জা দিও না।  
 (জল্লাদকে উঠায়ে তার মাথায় রাজমুকুট দান)  
**জল্লাদ** না, না, ও কৱেন কি জাঁহাপনা!  
 (মুকুট নিয়ে আমানের মাথায় পৱানে, দুই ভাইকে লক্ষ কইৱে)  
 আমি ইহাদেৱ গোলাম হইয়ে চিৰকাল আপনাৰ বাঢ়ি থাকব।  
**দুলাল** কাকু তুমি ক্যানে আমাদেৱ গোলাম হইবা ছি, ছি। তুমি হইবা নতুন বাদশার মষ্টী। আৱ আমি নিশ্চিন্তে দিনেৱ দিন শিকাৱ খেইলে বেড়াব।

[সমাপ্ত]

### তথ্যনির্দেশ

১. তপন বাগচী, বাংলাদেশেৱ যাত্রাগান : জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিষ্প্রেক্ষিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৭
২. তপন বাগচী, প্রাণক, পৃ. ২১৭

## লোকক্রীড়া

লোকক্রীড়াকে বলা যায় জীবন চর্চারই অনুরূপ। প্রতিটি লৌকিক খেলারই রয়েছে উৎস। শরীয়তপুরের সকল উপজেলায় প্রচলিত লোকক্রীড়াগুলো প্রায় অভিন্ন। কয়েকটি লোকক্রীড়ার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

### ১. হা-ডু-ডু

হাড়ুড়ু আমাদের জাতীয় খেলা। এটি একটি দলীয় খেলা। মাটি কুপিয়ে আলগা করে অথবা কিছুটা নরম মাটিতে কোর্ট কেটে এই খেলা খেলতে হয়। চারকোনা কোর্টের দুই ভাগ করা হয় মাঝখানে দাগ কেটে। প্রতিযোগিতামূলক এ-খেলায় সাধারণত সাত জন কিংবা নয়জন করে খেলোয়াড় থাকে প্রতি দলে। খেলা শুরু হলে এক পক্ষের যে কোনো খেলোয়াড় কোর্টের মাঝখান থেকে নিশাস নিয়ে মুখে শব্দ করতে করতে প্রতিপক্ষের কোর্টের কাউকে ছুঁয়ে আসার চেষ্টা করতে হয়। সে সফল হলে সে খেলোয়াড়টি প্রতিযোগিতা থেকে অযোগ্য বা বাদ পড়ে যায়। এভাবে যে পক্ষের সব খেলোয়াড় আগে অযোগ্য হয়ে পড়ে সে পক্ষ পরাজিত হয়। আর বিপরীত দল বিজয়ী হয়ে থাকে।

### ২. লাঠি খেলা

সাধারণত আশুরা উলক্ষেই এ-খেলা হয়। মহরম মাস এলেই এ-খেলার আয়োজন চোখে পড়ে। এ-খেলা দুইজনে কিংবা দলগতভাবে এই খেলা যায়। লেখাই বাহ্য যে, এটি বড়দের খেলা। তবে তাদের প্রশংসিত হতে হয়। লাঠি ঘূর্ণনের নানা কৌশল আয়ন্তে না থাকলে এটি খেলা সম্ভব হয় না। লাঠিই খেলার মূল উপকরণ। প্রতিযোগিতামূলক বড় আয়োজনে ঢোলের ব্যবস্থা থাকে। মহরম মাসের এক থেকে দশ তারিখের মধ্যে খেলোয়াড়গণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা খেলে থাকে। আবার কোনো ধনী গৃহে বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরিবেশনার আমন্ত্রণ পেলে পরিবেশিত হয়। খেলোয়াড় শিল্পীগণ বাড়ির উঠানে বা খোলা জায়গায় এ-খেলার আয়োজন করে। খেলোয়াড় তার হাত, পা, মাথার চারপাশে লাঠি ঘুরানোর নানা কৌশল দেখায়। দলীয় খেলায় সাধারণত শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রতিপক্ষের নিকট নিজেদের শক্তি জাহির করা হয়। ঢোলের তালে তালে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন খেলা প্রদর্শিত হয়।

### ৩. বৌছি/বউছি

এটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই প্রচলিত। একে দৌড়াছিও বলে। দুই দলে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। জোড় সংখ্যক সদস্য (কমপক্ষে দুই জোড়) নিয়ে বৌছি খেলা হয় শরীয়তপুর অঞ্চলে। কারা প্রথমে খেলবে তা নির্ধারণের জন্য গাছের পাতা দিয়ে টস হয়। গাছের পাতা ছেড়ে দিয়ে বলা হয় হাত্তি না মাংস। যারা টসে জিতে তারাই বউ

পক্ষ হয়ে খেলা শুরু করে। সাধারণত খেলা মাঠের বড় পরিসরে একটি বৃত্তাকার ঘর বানিয়ে সেখানে বউকে রাখা হয়। এর অপর প্রাণ্টে বউয়ের দলের অন্য খেলোয়াড়দের জন্য একটি আয়তাকার ঘর বানানো হয়। আর প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা এ-দুটি ঘরের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সুবিধা মতো অবস্থানে থাকে। বউয়ের হাত-পা ঘরের দাগের বাইরে গেলে সে মারা যাবে। তবে অন্যদলের তারা না দেখালে চলবে।

প্রথমে দলের একজন এক নিঃশ্বাসে দৌড় দিয়ে বউয়ের কাছে যায় এবং বলে- ‘প্রথমে ছি দিয়া গ্যালাম/বউয়ের মুখ চাইয়া গ্যালাম’ কিংবা বলে, ‘বউয়ের মুখ চাইয়া গ্যালাম/ পাঁচশ টাকা দিয়া গ্যালাম’। এ-সময় বউয়ের সামনে একটি পাতা রাখে। তারপর অন্য সদস্যরা বিভিন্ন ছড়া কেটে বোল দেয় এবং প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ছোঁয়া দিতে তাড়িয়ে বেড়ায়। একেক জন একেক ভাষায় ছড়া কাটে। যেমন, একজন বোল দেয় ‘ছি কুতুত নাড়ে নাড়ে/ঘন্টা বাজে বারে বারে’। বোল দিতে গিয়ে যদি তার দম পড়ে যায় তখন সে মারা পড়ে। তখনই অন্য একজন অন্য ভাষায় বোল দেয়। যেমন- ‘কচুপাতা লকটন/তোরে ছুইতে কতখন/তোরে ছুইতে কতখন’ ইত্যাদি ছড়ার সুরে চারপাশ সরগরম হয়ে উঠে। বউয়ের দলের বোল দেওয়া খেলোয়াড়দের লক্ষ থাকে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছোঁয়া দেয়ার জন্য তাড়িয়ে বেড়ানো এবং বউকে ঘরে আসার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। আর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের খেয়াল হলো বউ ঘরে যাওয়ার সময় ছোঁয়া। বৌ সবসময়ই ঘরে যাওয়ার সুযোগ খোঁজে। বউ যদি ছোঁয়া বাচিয়ে ঘরে ফিরতে পারে তাহলে এক গেম হয়। আর যদি বউ ছোঁয়া যায় তাহলে তার দলের সকলেই মারা যায়। পরে এবং প্রতিপক্ষ বৌ দলের হয়ে খেলার সুযোগ পায়। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যদি একের পর এক ছোঁয়া যেতে থাকে তখন বউয়ের ঘরে ফেরার পথ সুগম হয়। আর যদি বউয়ের খেলোয়াড় বেশি মারা পড়ে তাহলে বউয়ের ঘরে ফেরা অনিষ্টিত হয়ে ওঠে। যে দল বেশি গেম দিতে পারে, তাদের জয় হয়। আমাদের সমাজে মহিলা বা বউদের যে অনি঱াপত্তা এবং এজন্য তাকে রক্ষা করার যে মানসিকতা এই খেলার মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

#### ৪. পাঁচ কইটা (পাঁচগুটি)

বরংড়া অঞ্চলে কয়েক রকমের গুটি খেলা প্রচলিত পাঁচগুটি, ছয়গুটি, দশগুটি ইত্যাদি। তবে পাঁচগুটিই বেশি জনপ্রিয়। উঠতি কিশোরীরা এ-খেলার প্রধান খেলোয়াড়। এটি দুজনের খেলা। সাধারণত মসৃণ মেঝেতে বসে এটি খেলা হয়। পাথর বা ইটের পাঁচটি মসৃণ টুকরো এ-খেলার উপকরণ। এটি কসরতের খেলা হাতের দক্ষতা ও দ্রুতগতির ওপর এ-খেলার সাফল্য নির্ভর করে।

**খেলার বিবরণ :** এ-খেলাটিতে আটটি ধাপ রয়েছে। এগুলোকে একের টোক, দুয়ের টোক, তিনের টোক, চারের টোক, পাঁচের টোক, ছিপা বা ছিপতি, ধাপ্তি ও কেঁচকি। পূর্বতন ধাপগুলো শেষ করে সর্বশেষ কেঁচকি পর্যায়ে এসে গেম হয়।

**একের টোক :** হাতের একটি গুটি নিয়ে আর একটি গুটি মাঠ বা মেঝে থেকে উঠাতে হয়। কিন্তু হাতের গুটিটি মাটিতে পড়তে পারবে না।

**দুয়ের টোক :** হাতে একটি গুটি ধরে নিয়ে দুটি গুটি একসঙ্গে মেঝে থেকে উঠাতে হয়।

**তিনের টোক :** অনুরূপভাবে তিনটি গুটি একসঙ্গে উঠাতে হয়।

**চারের টোক :** একটি গুটিকে শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে খলি হাত মাটিতে মাটিতে স্পর্শ করে শূন্যে ভাসানো গুটি ভূমি স্পর্শ করার আগেই হস্তগত করতে হয়।

**পাঁচের টোক :** হাতের তালুর উল্টোপিঠে গুটি পাঁচটি নিয়ে গুটিগুলো উপরের দিকে ছড়ে দিয়ে হাতের তালুতে নিতে হয়।

**ছিপা/ছিপটি :** হাতের তালুতে সমুদয় গুটি নিয়ে গুটিগুলো শূন্যে ভাসিয়ে হাতের তালুতে উল্টোপিঠে নিতে হয়। যদি সবগুটি উল্টোপিঠে ধারণ করা সম্ভব না হয়, তখন মাটিতে পড়ে যাওয়া গুটিগুলো আঙুলের ছিপি দিয়ে ধরে রেখে তালুর উল্টোপিঠে থাকা গুটিগুলো সহ সবকটি গুটি তালুতে নিতে হয়।

**ধারি :** লোকালুফির এ-পর্যায়ে গুটিগুলো হাতের তালু থেকে উল্টো পিঠে নিতে হয়। তারপর গুটিগুলো শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে তালু নিচের দিকে রেখেই ভাসমান গুটিগুলো করায়ন্ত করতে হয়।

**কেঁচকি :** প্রথমে পাঁচটি গুটিকে ছড়িয়ে ফেলতে হয়। তারপর এক হাত দিয়ে সাঁকোর মতো বানাতে হয়। এই হাতের আঙুলের তৈরি সাঁকোর নিচ দিয়ে ছড়ানো গুটিগুলো পার করতে হয়। প্রথমে প্রতিপক্ষ একটি গুটিকে ‘কুস্তা’ নির্ধারণ করে দেয়। এই ‘কুস্তা’ গুটিটিকে সবশেষে পার করতে হয়। তখনই ‘গেম’ হয়। এভাবেই খেলাটি চলতে থাকে। বর্ষার দিনে এ-খেলায় মেয়েরা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়।

## ৫. এক্ষা দোক্ষা

এই খেলাটি মেয়েদের খেলা এবং প্রায় সর্বত্রই এই খেলাটি চোখে পড়ে। এই খেলাটি খেলার জন্য বাড়ির উঠানে একটি আয়তাকার ঘরের দাগ কাটা হয়। ঘরে ছয়টি দাগ কাটা হয়, ভাগগুলোর নাম যথাক্রমে এক্ষা, দোক্ষা, তেক্ষা, চোক্ষা, পক্ষা, ষষ্ঠী। ভাঙ্গা কলসির একটি অংশ যা স্থানীয়ভাবে চাঢ়া নামে পরিচিত এই খেলাটির একটি উপকরণ। চাঢ়াটি কপালে রেখে আকাশের দিকে মুখ করে দাগ কাটা ঘরগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করতে হয় খুব সাবধানতার সঙ্গে যাতে পা দাগে না লেগে যায়। দাগে পা পড়লে খেলোয়াড় খেলার অবোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

## ৬. কানা-মাছি

এ-খেলাটির বিস্তৃতিও বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র। বাড়ির উঠানের মতো বড় খেলা জায়গায় এ-খেলাটি হয়ে থাকে। ছেলে মেয়ে উভয়েই এই খেলাটি খেলে থাকে। কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে তার পিঠে ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সবাই একত্রে বলতে থাকে কানামাছি ভৌঁ ভৌঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ। চোখে কাপড় বাধা ছেলেটি যদি কাউকে ছুয়ে দিতে পারে তবে সে চোর হবে।

## ৭. গুলিখেলা

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই খেলা প্রচলিত। বাড়ির উঠানে ছোটগর্ত করে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ছেলেরা বসে থেকে ডান হাতের তজনী দিয়ে মার্বেল ঠেকিয়ে আঙুলটাকে গুলতির মতো ব্যবহার করে লক্ষ ভেদের কাজে লাগায় এবং গর্তে ফেলার চেষ্টা করে।

## ৮. লাটিম খেলা

এ-খেলাটির চলও সব যায়গায় দেখা যায়। কাঠের তৈরি লাটিমের গায়ে লেইস ফিতা বা নেতি পেচিয়ে লেইছের অপর প্রান্তকে বেঁধে রাখে তাদের ডান হাতের কনিষ্ঠাতে, তারপর সজোরে ছেড়ে দেয়া হয় একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মাঝে। এই বৃত্তের ভেতর ঘূরতে থাকে লাটিমটি।

## ৯. পুতুল খেলা

পুতুল খেলা প্রধানত মেয়েদের। কাঠ, কাপড়, মাটি দিয়ে মেয়েরা নারী, পুরুষ, বর-কনে তৈরি করে থাকে। তারপর কাপড়, নানা প্রকার গাছের পাতা ও কাপড়ের পাড় দিয়ে তৈরি নানা প্রকার গহনা পুতুলের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে থাকে। দুই বাড়ির দুই বাঙ্কবী এই খেলায় অংশ নেয়। এক বাঙ্কবীর বর পুতুলের সঙ্গে অপর বাঙ্কবীর কনে পুতুলের বিষয়ে দেয়া হয়। এ-উপলক্ষে তারা কৃতিম মাছ, মাংশ পোলাও, কোর্মা রান্না করে থাকে।

## ১০. ঘূড়ি ওড়ানো

এ-খেলাটির চল বাংলাদেশের সর্বত্রই চোখে পড়ে। আবহাওয়া শক্ত ও অনুকূল থাকলে ঘূড়ি ওড়ানোর দৃশ্য চোখে পড়ে। ঘূড়ি ওড়ানোর জন্য নাটাই তৈরি সুতায় মাতা দেওয়া, মাওতা দেওয়ার জন্য নানান উপকরণ সংগ্রহ করা সহ এ-জাতীয় কাজে ছেলেদের বেশ ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। ঘূড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতিযোগীতাও দেখা যায় ভীষণ। কার ঘূড়ি ওড়ানোর দক্ষতা ভালো কার মন্দ এ-সব নিয়ে চলে বিচার বিশ্বেষণ ও নানা আয়োজন। স্থান বিশেষে এই খেলাটি একটি প্রতিযোগীতা হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করে।

## ১১. শান্তালতা খেলা

১০-১২ জন ছেলেমেয়ের দলগত খেলা এটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা স্কুলের ‘লেজার পিরিয়ডে’ এ-খেলায় বিদ্যালয় আভিনানকে সরগরম করে তোলে। একজন চোর হয়ে ঘোড়ার মত নিচু হয়ে থাকে। অন্যরা তার উপর দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে পার হয়। তখন নিম্নরূপ ছড়া কাটা হয়, .

শান্তালতা

গাছের পাতা

পা বিম বিম করে

জিমিদারের ছেলেরা

মুরগি চুরি করে।

আধেক পথে যাইয়া মুরগি

কক্ক কক্ক করে।

প্রথমে একজন ‘শান্তা লতা’ কথাটি উচ্চারণ করে একদিক থেকে চোরকে অতিক্রম করে। তারপর এর পরের পঙ্কজি ‘গাছের পাতা’ উচ্চারণ করে বিপরীত দিক থেকে আরেকজন অতিক্রম করে। এভাবে প্রত্যেকে পরস্পরের বিপরীত দিক থেকে অতিক্রম

করে ছড়াটি শেষ করে। তার পর শুরু হয় খেলাটির পরবর্তী পর্ব। উল্লেখ্য যে, পিঠের উপর দিয়ে অতিক্রমের সময় খোড়া পা মাটিতে পড়ে গেলে সে মারা পড়বে। তারপর চোর মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে এবং দুই হাত সমান করে সামনে উচু করে ধরে। তখন অন্যরা পূর্বেকার মত ছড়া কেটে পার হবে চোরের পায়ের উপর দিয়ে। পায়ের সঙ্গে লেগে গেলে চোর হবে।

## ১২. ইচিং বিচিং

এটি একটি দলগত খেলা। বিনোদনের উদ্দেশ্যেই কিশোর কিশোরীরা এ-খেলা খেলে থাকে। ছড়া আবৃত্তির মাধ্যমে খেলাটি শেষ হয়। মানুষের শরীরের বিশেষ কৌশল ছাড়া এ-খেলায় আর কোনো উপকরণ লাগে না। এটি চাস বা সুযোগের খেলা।

কয়েকজন ছেলেমেয়ে একত্রে খেলে। প্রথমে একজন রাজা হয়। রাজাকে ঘিরে সবাই চক্রাকারে মাটিতে বসে। সকলের হাত উপুড় করে মাটিতে রাখা হয়। রাজা ইচিং বিচিং চিচিং চা/প্রজাপতি উড়ে যা ছড়াটি উচ্চারণ করে সকলের হাত স্পর্শ করে যেতে থাকে। সকলেরই লক্ষ থাকে ছড়ার শেষ শব্দটি কার হাতে গিয়ে শেষ হয়। যার হাতে ছড়ার শেষ শব্দ পড়ে সে হাত তুলে পেটের ভাঁজে গরম করে। এভাবে ছড়া কেটে কেটে সব খেলোয়াড়ের পালা শেষ করা হয়। সবশেষে রাজা হাত পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করে যার হাত ঠাণ্ডা পাওয়া যায় সে চোর হয়। এ-চোর হওয়া বেশ অপমানজনক। আবার কোনো কোনো সময় শেষ শব্দ পাওয়া লোকে রাজা বানানোর নিয়ম রয়েছে। তখন এই নতুন রাজা আবার ছড়া কাটার সুযোগ পায়।

## ১৩. চোর পুলিশ

এ-খেলায় চারজন লোক লাগে। ছেলে মেয়েরা একত্রে এ-খেলা খেলতে পারে। এ-খেলার উপকরণ হিসেবে কাগজ ও কলম সঙ্গে রাখতে হয়। এ-খেলার মাধ্যমে অবসর বিনোদন ও গণিত শিক্ষা লাভ করা যায়। এটি সাধারণত একটি ইনডোর গেম।

প্রথমে চার টুকরো কাগজে বাবু দারোয়ান, পুলিশ চোর লেখা হয়। অপর একটি খাতায় কুল টেনে প্রত্যেকের নামে চারটি ঘর তৈরি করা হয়। এই ঘরে প্রত্যেকের প্রাণ নম্বর বসানো হবে। প্রত্যেকের পয়েন্ট আগেই নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত বাবু-৯০, দারোয়ান-৬০, পুলিশ-৫০ ও চোর-০ পয়েন্ট ধরা হয়। তারপর নাম লেখা কাগজের টুকরো চারটি লটারির উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়। যে দারোগা পায় তাকে বলতে হয় পুলিশ কে হ্যায়? তখন যে পুলিশ পেয়েছে সে বলে আমি আমি হ্যায়। দারোগা তখন নির্দেশ দেয় চোরকে বন্দী করো। তখন পুলিশকে অজানা বাবু ও চোর থেকে চোরকে শনাক্ত করতে হয়। পুলিশ যদি চোরকে শনাক্ত করতে সমর্থ হয় তাহলে চোর-০ পয়েন্ট পায়। আর যদি পুলিশ চোর শনাক্ত করতে না পারে তাহলে পুলিশের নির্ধারিত ৫০ পয়েন্ট পায় চোর এবং পুলিশ পায় ০ পয়েন্ট। তখন একজন খাতায় সকলের পয়েন্ট লিখে রাখে। খেলা শেষে সকলের পয়েন্ট যোগ করে যার পয়েন্ট বেশি হয় সে হয় প্রথম। খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়ের মেধাক্রম নির্ধারিত হয় এভাবে-ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড, লাট। সাধারণত লাট হওয়া লোককে অন্যদের অপবাদ শুনতে হয়।

এ-খেলায় যারা পুলিশ ও চোর পায় তারাই ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বাবু ও দারোয়ান হতে পারলে কোনো ঝুঁকি থাকে না। যে বেশি বার বাবু পায় সচরাচর সেই পয়েন্টে

এগিয়ে থাকে এবং প্রথম হয়। অবসর কাটানোর একটি অন্যতম আয়োজন আসর হলো এ-খেলা।

### ১৪. পলাঞ্জি

একে লুকপলানি, লুকোচুরি ও কুলুক খেলাও বলা হয়। এটি ৮/১০ জন ছেলেমেয়ে মিলিতভাবে খেলে। এ-খেলায় একজন অন্য সবাইকে খুঁজে বের করে। তাই এতে গোয়েন্দাগিরি একটি ভাব রয়েছে।

খেলার শুরুতে একজনকে চোর সাব্যস্ত করা হয়। চোরের দায়িত্ব হয় লুকিয়ে থাকা অন্য খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করা। চোরকে সব খেলোয়াড়দের কথামতো একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় বিশ্বস্তভাবে অবস্থান নিতে হয় যাতে অন্যরা কোথায় লুকায় তা যেন সে জানতে না পারে বা দেখতে না পায়।

পলানো বা লুকানো শেষ হলে তারা কুলক বলে আওয়াজ দেয়। তখন চোর তাদের বের করতে যায়। যে ধরা পড়ে যায় সেও তখন চোরের সঙ্গে আত্মগোপনকারীকে ধরার অভিযানে শামিল হয়। একে একে সবাই ধরা পড়লে খেলা শেষ হয়। এ-খেলায় আত্মগোপন ও আত্মগোপনকারীকে ধরার আনন্দ নিহিত রয়েছে।

### ১৫. ঘামবিচি খোঁটা'র খেলা

শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার কোনো কোনো গ্রামে ‘ঘামবিচি খোঁটা’ খেলার প্রচলন আছে। গরম মৌসুমে সাধারণত ঘামবিচি (ঘামাচি) হয়। ঘামাচি হয়েছে এমন শিশু কিশোর-যুবকদের মাঝে আনন্দদায়ক এ-খেলা হয়ে থাকে। দুইজনের মধ্যে ঐ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। সুই'র মত চিকন দেড়/দুই সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চির কম) দীর্ঘ একটি শলা (বাঁশ, নারকেল বা পাট খড়ির) এ-খেলার উপকরণ। ডান হাতের বৃক্ষাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলের মাঝে শলাটির দুই প্রান্ত আলতোভাবে চেপে ধরে খেলা হয়। এ-ক্ষেত্রে বৃক্ষাঙ্গুলকে ‘বুইড্যা’ ও শাহাদাত আঙ্গুলকে ‘জুয়ান’ বলা হয়। টসের মাধ্যমে যে জন জেতে সে জন ১ম পক্ষ, যে জন হারে সে জন ২য় পক্ষ। প্রশ্নের মাধ্যমে এ-চমৎকার খেলাটি হয়। বৃক্ষাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলের মাঝে শলাটি চেপে ধরে ১ম পক্ষ প্রশ্নের মাধ্যমে এ-আকর্ষণীয় খেলা শুরু করে। ২য় পক্ষ উত্তর দেয়। শলা দুই আঙ্গুলে চেপে ধরে খেলা শুরু-

১ম পক্ষ: উট্টলি না পুট্টলি?

২য় পক্ষ: পুট্টলি! (উট্টলি ও বলতে পারে)

১ম পক্ষ: বিচি খোঁটবা কয় কুড়ি?

২য় পক্ষ: পাঁচ কুড়ি! (কম-বেশি বলতে পারে)

১ম পক্ষ: বুইড্যা না জুয়ান?

২য় পক্ষ: জুয়ান! (বুইড্যাও বলতে পারে, ইচ্ছা)

এবার, ১ম পক্ষ শলা চেপে ধরা আঙ্গুল দুটি আন্তে আন্তে ফাঁক করে। ফলে শলাটি যে আঙ্গুলে লেগে থাকে সে আঙ্গুলের পক্ষ বিজয়ী হয়। আর বিজয়ী জনের পাঁচ কুড়ি ঘামবিচি খুঁটে দিতে হয়।

## লোকপেশাজীবী গ্রন্থ

জীবন জীবিকার বাস্তবতা থেকেই উভব হয়েছিল বৃত্তিমূলক পেশাজীবীর। যাঁদেরকে আমরা লোকপেশাজীবী হিসেবে জানি। লোকপেশাজীবী প্রথা আমাদের মানব সমাজের শুধুই প্রয়োজনই মেটায়নি, বিনোদনেরও পরিণতি এনে দিয়েছে।

### তাঁতি

বিটিশ আমল থেকে এ-অঞ্চলের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য ছিল। পাকিস্তান আমলে ও এখনকার শাড়ি, লুঙ্গি ও গামছার খুব সুনাম ছিল। বাংলাদেশ আমলে অশির দশকে এ-এলাকার তাঁতশিল্পীদের অনেকে অন্যান্য পেশায় আত্মনিয়োগ করতে থাকে এবং নবৰাইয়ের দশকের গোড়ার দিকে এ-অঞ্চলের তাঁতশিল্পের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলার (পালং) বালাখানার (বর্তমানে পাখুবর্তী গ্রামে কুড়াশীর) বিশিষ্ট ও প্রবীণ তাঁতশিল্পী জনাব মো. রমিজউদ্দিন (৯৫) জানান, ছাপার শাড়ি, পাবনা-কুষ্টিয়া-জয়পাড়া-দোহার-নরসিংদীর শাড়ি-লুঙ্গি-গামছা ও ঝালকাঠি টুরকীর গামছা এ-অঞ্চলে আমদানি ও প্রচলন ব্যক্ত হয়ে উঠলে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারায় তাঁতশিল্পের বাজার দিন দিন পড়তে থাকে। মহাজনদের নিকট স্বল্প পুঁজির তাঁতীরা ধার-দেনায় জড়িয়ে পড়ে। উৎপাদিত শাড়ি-লুঙ্গি-গামছা বিক্রয় করে যাওয়ায় সঙ্গতিপূর্ণ আয়-মুনাফা না হওয়ায় তাঁতীরা এ-পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অপরদিকে তাঁতীদের সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পেতে থাকলে অনেকে শিক্ষিত হয়ে চাকরি করতে শুরু করে। এদের মধ্যে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও চাকরিজীবী হয়েছেন। সামাজিকভাবে মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে বাপ-দাদার পদবিও পরিবর্তন করে ফেলেছে। এখন এ-অঞ্চলে নড়িয়া উপজেলাতে ২/১ টি বাড়ি ব্যতীত তাঁতশিল্পের শেষ চিহ্নটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না।

শরীয়তপুর জেলার তাঁতশিল্পের বাজারে সদর উপজেলা (পালং) এর কুড়াশী/বালা খানার আবদুল হাতেম বেপারীর লুঙ্গির খুবই সুনাম ছিল। ‘হাতেমের লুঙ্গি’ এ-জেলার বাইরেও কদর ছিল। ‘স্থানীয় তাঁতে উৎপাদিত লুঙ্গি শাড়িকে বলা হতো কারিগইর্যা লুঙ্গি ও কারিগইর্যা শাড়ি। জনাব রমিজউদ্দিন বেপারী (৯৫)-র সঙ্গে আলোচনা কালে প্রাণ তাঁতশিল্পীদের নাম তালিকা আকারে প্রকাশ করা হলোঁ।

#### সদর উপজেলা (পালং):

কুড়াশী ও বালাখানা গ্রাম: ১। রমিজ উদ্দিন বেপারী (৯৫), পিতা: মদন আলী বেপারী, পিতামহ: জিয়ারউদ্দিন বেপারী, প্রপিতামহ: হাজি ওব্রাহ হাওলাদার কৃষিকাজ করতেন।, রমিজউদ্দিন বেপারীর ছেলেদের মধ্যে মজিবুর রহমান ও মালেক বেপারী

কর্মজীবনের শুরুতে তাঁতশিল্পের কাজ করেছিলেন। ২। রহিম বকস বেপারী (তাঁতশিল্পী এবং সূতায় রং করতেন ও পাইকারী বিক্রয় করতেন), পিতা: এরফান বেপারী (তাঁতশিল্পী), রহিম বক্সের ছেলে দিল মোহাম্মদ তাঁতশিল্পী। ৩। হাসেম বেপারী ও খোরশেদ বেপারী। পিতা: হাতেম আলী বেপারী (ঁর নামের সুপরিচিত খোরশেদ আলী বেপারীর ছেলে আলী আহমদ বেপারী ও তাঁতশিল্পী। ৪। আতর আলী বেপারী, জুলহাস বেপারী, পিতা: শরফুদ্দিন বেপারী, ৫। মোসলেম বেপারী, পিতা: মোহাম্মদ বেপারী, আঃ আহাদ বেপারী, আঃ খালেক বেপারী। পিতা: ছাদেম আলী বেপারী, ৬। ইউনুস বেপারী, ইসমাইল বেপারী, আজাহার বেপারী, পিতা: করম আলী বেপারী, ৭। সাহেদ বেপারীন, ফরহাদ (ফোরাত) বেপারী, পিতা: আঃ হামিদ বেপারী, ৮। আদম আলী বেপারী, পিতা: বসরউদ্দিন বেপারী, আদম আলী বেপারীর ছেলে শাহাবউদ্দিন বেপারী (তাঁতশিল্পী), ৯। ইসহাক বেপারী এবং এর পুত্রগণ, (ক) আনোয়ার উদ্দিন বেপারী (খ) জাহান উদ্দিন বেপারী। ১০। আঃ হামিদ বকস বেপারী, আঃ মালান বেপারী, পিতা: অজিমউদ্দিন বেপারী, ১১। আদম আলী বেপারী এবং এর পুত্রগণ (ক) আবুল ফজল বেপারী (খ) কালু বেপারী (গ) শাহাজল বেপারী, ১২। আঃ করিম বেপারী, মতু বেপারী, রহিম বেপারী, পিতা: হাশেম বেপারী, কোয়ারপুর: ১। হোসেন আলী বেপারী পিতা: হাশেম বেপারী, ২। ছাদেম আলী বেপারী, ৩। হকুম আলী বেপারী, ধানুকা ও তুলাসার: সোনামদ্দিন বেপারী, পিতা: মৃত: ইয়াদ আলী বেপারী, তৈয়ব আলী বেপারী, ইসমাইল বেপারী, ফজর আলী বেপারী, ইসমাইল বেপারী (প্রয়াত), কালচান বেপারী (প্রয়াত), আদুল আলী বেপারী, আঃ মজিদ বেপারী, আঃ ওয়াহেদ বেপারী, মিনাজ উদ্দিন বেপারী (প্রয়াত), আঃ করিম বেপারী।

### নড়িয়া উপজেলা

পালের চর গ্রাম: (ক) আফজাল বেপারী, (খ) জমশেদ বেপারী ২। ওয়াজাদ্দিন বেপারী এবং এর পুত্রগণ, (ক) রহিম বক্স বেপারী (খ) নইমুদ্দিন বেপারী, ৩। তমিজউদ্দিন বেপারী এবং এর পুত্র মঙ্গল বেপারী।

কেদারপুর গ্রাম: ১। জলিল বেপারী, পিতা: জাহির উদ্দিন বেপারী, ২। জনাবগী বেপারী, পিতা: ওয়াহিদ আলী বেপারী, ৩। আলী আহমদ বেপারী, আঃ করিম বেপারী পিতা: আঃ মজিদ বেপারী, ৪। জসিম উদ্দিন বেপারী (এখনও তাঁতের কাজ চলে) পিতা: আহমদ আলী বেপারী, চাকদহ গ্রাম: ১। ছলিম উদ্দিন বেপারী, ২। রোক্তম আলী বেপারী, ৩। আবুল হাসেম বেপারী; মূলফৎগঞ্জ: আঃ রহমান ফরাজী এবং এর পুত্রগণ, (ক) সাহাউদ্দিন ফরাজী, (খ) বাহাউদ্দিন ফরাজী, (গ) সরোয়ার ফরাজী, মড়িসার: ১। নূর মোহাম্মদ বেপারী, পিতা: শফিজউদ্দিন বেপারী, (ঁরা সূতায় রং করার কাজও করে), কার্তিকপুর: ১। শফিজউদ্দিন বেপারী, পিতা: মোসলেহ উদ্দিন বেপারী, ২। মুখাই কারিগর (বেপারী) এবং এর পুত্রগণ, (ক) আবুল বেপারী (খ) হাশেম বেপারী, ৩। আজিম উদ্দিন বেপারী এবং এর পুত্র নূর মোহাম্মদ বেপারী। (এদেরও সূতায় রঙ করা কাজ)। তাঁতশিল্পকর্মে মহিলারা ও জড়িত ছিল। বিশেষ করে সূতা প্যাচানো, বীম বানানো সহ বিভিন্ন ধরণের কাজে মহিলারা পুরুষদেরকে সহযোগিতা করতেন।

## নরসুন্দর

যারা অন্যের চুলদাঢ়ি প্রভৃতি কেটে মানুষকে সুন্দর বা শ্রীবৃন্দি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে তাদেরকে নরসুন্দর বলা হয়। এরাই সমাজে নাপিত বলে পরিচিত। স.স্লাপয়িত প্রা. সালহাপিত বা নাপিত। এদের পেশা চুল কাটা, দাঢ়ি চাঁছা, গেঁফ ছাটা বা চাঁছা, বগল চাঁছা প্রভৃতি। ক্ষুর কাঁচি প্রধান এ-কর্মকে বলা হয় ক্ষৌরকর্ম, কামানো, খেউরি বা ক্ষুরকর্ম। তাই এদেরকে ক্ষৌরকার বা ক্ষৌরিক ও বলা হয়।

নাপিত হিন্দুদের মধ্যে একটি জাতি বিশেষ। এদের পদবি শীল। বর্তমানে এই পদবিধারী অনেকেই পূর্বপুরুষের জাতিগত পেশা পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে শীল পদবি পরিবর্তন করে ইচ্ছামতো অন্য পদবি বিশেষ করে 'রায়' 'কবিরাজ' 'পরামনিক' বা 'প্রামনিক', 'দাস', 'বিশ্বাস' বা 'শর্মা' ধারণ করছে। ফলে এদের অতীত চিহ্নিত করা অনেকক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য। হিন্দুদের মধ্যে অন্যান্য পেশাজীবী শ্রেণির যেমন চর্মকার বা মুচি (খৰি, খৰিদাস, রিসিদাস, রবিদাস বা মনিদাস পদবিধারি), নমশ্নূর (মণ্ডল) এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এ-পেশায় নিয়োজিত হয়ে পড়েছে। শহর ও মফস্বল এলাকার বাজার, হাট বা গঞ্জেও বর্তমান সুন্দর সেলুন (নাপিতের দোকান) দেখা যায়। পূর্বের তুলনায় এই ক্ষৌরবৃন্তির আয় ও মান বৃদ্ধির কারণে ক্ষৌরকর্মীদের আবিস্কৃত নতুন নতুন নামের ডিভাইন (হাট) ও কর্মকৌশল একটি শিল্পমান লাভ করেছে। তাই ক্ষৌরকর্মীদেরকে এখন আর নাপিত, নরসুন্দর, ক্ষৌরিক বা ক্ষৌরকর্মী বলা সঠিক হবে না। এই ক্ষৌর কর্মিঠা এখন দক্ষতা ও শিল্পমান সম্পন্ন কাজের জন্য 'ক্ষৌর শিল্পী' তে পরিণত হয়েছে।

শরীয়তপুর অঞ্চলে পূর্বে জমিদার বাড়ি, উচ্চবর্ণের বিউবান ধনাত্য ব্যক্তির বাড়িতে স্থায়ীভাবে একঘর ধোপা ও একঘর নাপিত সবাস করার সুযোগ পেত। সমাজপত্রিকা সমাজে কারোর অপরাধ বিচারে সমাজচুত্য করে রাখলে অপরাধী (বা সপরিবার) ধোপা-নাপিতের সেবা হতে বাধ্যত হতো। এ-ব্যবস্থাকে বলা হতো ধোপা-নাপিত বন্ধ করা। বর্তমানে এ-পদ্ধতিতে সাজা দেয়া রায় এতদাখ্যলে বিরল। তবে বিয়ে সাদীর আনুষ্ঠানে নরসুন্দর কর্তৃক গৌড়বলে আবৃত্তি, দর্পণ (হাতলসহ পিতলের বৃত্তফলক যা বরের হাতে শোভিত ও আনুষঙ্গিক করণীয় প্রথা এখনো হিন্দু সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ-প্রথায় নরসুন্দর আর্থিক লাভবান ও হয়ে থাকে।

সেলুনে কাজ করা ব্যতীত অনেক ক্ষৌরশিল্পীর বিভিন্ন হাটে হাটে সুবিধাজনক স্থানে জলচৌকি বা ছেট টুলে বসে অপেক্ষাকৃত কম মজুরীতে ক্ষৌরকর্ম করে থাকে। স্বাধীনতা পূর্বসময়ে এ-অঞ্চলে সেলুন তেমন একটা দেখা যেত না। কেবল বড় বড় বন্দর বা বাজারে বড়জোর দু'একটা দেখা যেত। তাও তেমন সাজানো-গুছানো থাকতো না। আধুনিকার ছোয়ায় আজ নরসুন্দরের পেশাগত মান ও জীবন্যাত্মার মান অনেকাংশে উন্নত হয়েছে। অধিকাংশ শহর, বন্দর, বাজার, হাটেই সুসজ্জিত ও বিদ্যুতায়িত সেলুন গুলোতে বাতি ও ফ্যানের পাশাপাশি রেডিও, অডিও প্রেয়ার ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। মুঠোফোনে গান ও খবর শোনাত গতানুগতিক হয়ে পড়েছে।

শরীয়তপুরে সেলুনগুলোতে খরিদারের মাথাপিছু ন্যূনতম মজুরী ধার্য করা হয়েছে পদ্ধতি টাকা। প্রায় সেলুনেই কমপক্ষে দু'এক করে কর্মচারী বা কারিগর (শিল্পী) কাজ করে। অনেক সেলুনে ভাই ভাই বা পিতা পুত্র মিলে কাজ করে। বড় বড় সেলুন গুলোতে চার-পাঁচ জন ক্ষেত্রে শিল্পী কাজ করে সেলুন মালিকরা এদেরকে কারিগর বা 'কর্মচারী' বলে থাকে। খরিদার থেকে প্রাণ মাথাপিছু আয়ের ৬০% কারিগর কে মজুরী দেয়া হয়। আবার যে সমস্ত কারিগর মালিকের খান থেয়ে কাজ করে তাদের কে মাথা পিছু আয়ের ৫০% মজুরী দেয়া হয়। সেলুনে সাম্ভাহিক ছুটির বিধান রাখা হয়। বিভিন্ন বাজারে বা শহরে নরসুন্দর সমিতি এলাকা ভিত্তিক সেলুনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বর্তমানে দুর্ঘলের বাজারে একজন ক্ষেত্রে শিল্পী তেমন একটা সঞ্চয় করতে না পারলেও উপর্যুক্ত আয়ে সংসার চালিয়ে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দে চলতে পারে। অপেক্ষাকৃত ভাল আয়ের পথ বিবেচনা করে এ-এলাকার ঋষি সম্প্রদায় (চর্মকার, মুচি ও বাজনাদার)-এর সন্তানরা, নমঃশুদ্রের সন্তান এমনকি যুসলিম সম্প্রদায়ের তরঙ্গ যুবকদের কেউ কেউ বেকারত্ব ঘুটাতে এ-পেশায় আত্মনিয়োগ করছে। এদের মধ্যে হিন্দু শিল্পীরা কেউ কেউ শীল বা 'দাস' পদবি ও ধারণ করছে। পক্ষান্তরে শীল সম্প্রদায়ের অনেকে এ-পেশা ছেড়ে (দু'তিন পুরুষ আগে; এক পুরুষ আগে বা বর্তমানে) কবিরাজি, ডাঙুরি, ঔষধ বিক্রি, পল্লিচিকিৎসক, স্বর্ণশিল্পী বা স্বর্ণের ব্যবসা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পা-দীক্ষা গ্রহণ করে এমবিবিএস ডাক্তার, স্কুল শিক্ষক সহ সকারি চাকরি ও অন্যান্য পেশায় ঢুকে পড়েছে। এদের অনেকে পূর্বপুরুষের পদবি ও পরিবর্তন করে ফেলেছে। এদের মধ্যে অনেকের ধারণা পূর্বপুরুষের জাত পেশাটা নিন্দনীয় ছেট ও ঘৃণিত। অবশ্য সামন্ততাত্ত্বিক ও বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় এটাই হয়। সমাজে সেবামূলক কাজকর্ম যেমন ঝাড়ুড়োয়া, কাপড় ধোয়া, জুতা সেলাই ক্ষেত্রে কর্মাদি করা, জুতা পালিশ; মেথরের কাজ, ধাত্রীর কাজ, বাসনপত্র ধোয়ামোছা, হোগলা-পাটিবোনা, বেত বাঁশের কাজ, নৌকা বাওয়া, গাড়ী ঠেলা, রিঙ্গা টানা, কুলিগিরি করা, জনখাটা (বা বদলা দেয়া), মাছধরা, খান্দার কাজ যারা করে থাকে তাদেরকে অনেকেই তুচ্ছ-তাত্ত্বিক ও ঘৃণার চোখে দেখে থাকে।

এত কিছুর পরও শীল সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও যারা এই জাত পেশায় নিজেকে আজও বংশানুক্রমিক নিয়োজিত রেখেছে, তাদের অনেকের আশংকা- একদিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন যেভাবে ঢুকে পড়ছে তাতে আসল 'শীল' চেনাই কষ্ট হবে; অপরদিকে আগামীতে নতুন নতুন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির তৈরী হয়ের কাটিং মেশিন ইত্যাদি ব্যাপক প্রভাবে শীল সম্প্রদায়ের জাতীগত এ-পেশা হ্যাত ধরে রাখা যাবে না। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, প্রবাসীদের অনেকে হয়ের কাটিং মেশিন নিয়ে আসছে। ফলে শিশু খরিদারের সংখ্যা দিনদিন কমে যাচ্ছে।

এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে নিত্য নতুন বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে ক্ষেত্রে সংযুক্ত করে ক্ষেত্রে শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে সরকারের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। একদিকে ক্ষেত্রে শিল্পীদের সন্তানরা লেখাপড়া শিখে জীবন ও জীবিকার নিয়ে করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অপরদিকে অন্যান্য

একটি সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করা যায় সে দিকে সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সমাজ সংস্কারক ও সচেতন নাগরিক সমাজ কে এগিয়ে আসতে হবে।

## পাদুকাসুন্দর/ মুচি

জীবিকা যাদের পাদুকা মেরামত করা বা কালি পালিশ করে উজ্জলতা জাগিয়ে পাদুকাকে সুন্দর করে দেয়া তারাই পাদুকা সুন্দর। এদেরকে অনেকেই মুচি বা চর্মকার বলে থাকে। আভিধানিক অর্থে যারা মৃত পশুর চামড়া ছাড়িয়ে নেয় তারা মুচি, চর্মকার বা চামার। আবার যারা সুতা প্রভৃতি প্রস্তুত, মেরামত ও সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাও চামার, মুচি বা চমৎকার। চামড়া দিয়ে জুতা ব্যাগ, ইত্যাদি যারা তৈরী করে তারা চর্ম শিল্পী। জুতা তৈরীর কারিগররা পাদুকা শিল্পী। বাঙালী চর্মকার জাতি বা মুচিকে ঝষি (ঝষি) বলা হয়। এদের পদবিও ঝষি (স.রহিদাস হি.রেসি) পরবর্তীতে ‘ঝষিদাস’ (রিসিদাস)। বর্তমানে ‘রবিদাস,’ ‘রহিদাস,’ ‘মুনিদাস,’ ‘দাস’ পদবিও এদের মধ্যে দেখা যায় না-এ-অঞ্চলে। যারা সেলুনে শ্বেতকর্ম করছে তাদের কেউ কেউ ‘শীল’ পদবি ধারণ করছে। কোনো কোনো স্থানে ঝষি সম্প্রদায়ের যারা খেয়া পারাপারের কাজ করছে তাদের কেউ কেউ পাটনী পানী যুক্ত।

অন্যের ব্যবহৃত জুতা সেলাই ও পালিশ করা যাদের বৃত্তি, তারাই ‘মুচি’ বলে পরিচিত। শরীয়তপুর অঞ্চলে মুচি-র কাজ যাদের বৃত্তি, তাদের অনেকেই এখন আর চামড়া ছাড়ানোর কাজটা করেছেন। শুধু জুতা মেরামত ও কালিমেথে পালিশ করে থাকে। বংশানুক্রমিক যারা এ-পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে ঝষি বলা হয়। এ-সম্প্রদায়ের লোকজন দলবদ্ধভাবে একটি স্থানকেন্দ্রিক বসবাস করে একটি পাড়া সৃষ্টি করে। আর এ-পাড়াকে ‘ঝষিপাড়া’ বলা হয়। সাম্প্রতিক কালে ‘ঝষিপাড়া’ নামে আছে, বাস্তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন এ-পাড়ায় এখন বসবাস করছে। ঝষিদের অনেকে অন্যত্র চলে যাওয়ায় এ-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দু'চার ঘর ঝষি যারা এখনও ঝষি পাড়ায় বসবাস করছে তাদের মধ্যে তেমন কেউ ছড়ানো চামড়া বাঢ়ি এনে উঠোনে শুকানোর কাজ করছে না। ফলে আগের মতো ঝষি পাড়ায় দুর্গম্ব নেই, অনেক পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠেছে ঝষিপড়া। বড় বড় টেনারি ও জুতার কারখানা হবার ফলে স্বল্প পুর্জির দুএক ঘর ঝষি যা-ও আছে তারা ও টিকে থাকতে পারছে না প্রতিযোগিতার বাজারে। তাইজন্য সদ্য ছাড়ানো চামড়ার ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে অধিকাংশ ঝষিরাই শুধু জুতা মেরামত ও কালি দিয়ে জুতা পালিশের কাজ করে কোনো মতে জীবিকা নির্বাহ করছে। এতে সংসার চালিয়ে বাড়িতি কিছু সংসারের জন্য এদের পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

ঝষি মহিলারাও আর্থিক যোগান দেবার লক্ষ্যে বাড়িতে বসেই বেতের ঢাক-ঢোলের বেড়, সাজি, ঢাকি, জলা, পাল্লা, পুরা (চাউল, জল, গম, ধান ইত্যাদির পরিমাণ নির্ণয়ের পাত্র বিশেষ) এবং বাঁশের চটা বা চটি দিয়ে ডুলা, কুলা, ওড়া (ঝাঁকা), সাজি, চাসারি, চালুনি, ঢাকডাল ইত্যাদি তৈরী করে বাসা বাড়ি ঘুরে ঘুরে বিত্রি করে। আবার পুরুষরা এ-সব জিনিস হাট-বাজারে নিয়ে বিক্রয় করে আসে। অনেক পুরুষরা এসব জিনিস

বাড়িবসে তৈরী করে থাকে। এদের সন্তানদের অনেকে এখন আর এ-পেশায় যুক্ত হচ্ছে না। কেউ কেউ লেখাপড়া শিখে কম্পিউটারে কাজ করছে। কেউ টি.ভি. ফ্রিজ মেরামত করছে, কেউবা চুল কাটা শিখে সেলুনেই নরসুন্দর বনে গিয়েছে। এখন অন্য সম্প্রদায়ের বেকার যুবক কেউ কেউ কালিব্রাশের বাঞ্ছ হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাদুকা পালিশ করছে সাময়িকভাবে। দীর্ঘদিন এ-পেশায় এদেরকে টিকে থাকতে দেখা যায় না। ঝৰি শ্রেণির সঙ্গে এখন যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্যান্য শ্রেণির বৈবাহিক সম্পর্ক ও গড়ে উঠছে। ঝৰি বা পাদুকা সুন্দর আজ আর আগের মতো অপরিক্ষার পোশাক পরিচ্ছদে চলাফেরা করতে খুব একটা দেখা যায় না, এদের বেশভূষায় ও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

চামড়ার চটি ও জুতো ব্যবহারকারীদের অনেকে আজকাল ঘরে বসেই সহজভাবে পালিশের কাজটা সেরে নেয়। দামী জুতো বা চটি কিনতে কোম্পানির তৈরী পালিশ করার স্পন্দন বা ফোম এ-সঙ্গে পাওয়া যায়। এ-ছাড়া শুধু পালিশের জন্য জুতা বা স্যান্ডেল টানাটানি করা অনেকের নিকট বিরক্তিকর। আরো অনেক কারণে আগের মতো এ-কাজে তেমন একটা সুবিধা করে উঠতে পারছে না পাদুকাসুন্দররা। ফলে এর অন্যান্য কাজও, যেমন বেতের কাজ, বাজনা বাজানো ইত্যাদি করে থাকে।

এই পেশাজীবীদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। পূর্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ ও সামাজিকভাবে ঘৃণিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত, আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক কিছুটা উন্নতির ফলে দু' একটা স্থানে দেখা যায় ঝৰি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাযুস্য অন্য সম্প্রদায়ের অথবা আচার-আচরণ, শিক্ষা ও পরিবর্তীত পেশার ভিত্তিতে সমকক্ষ অপর সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

পাদুকাসুন্দর বা ঝৰি সম্প্রদায়ের অনেকের বাসগৃহ মানসমত বা আধুনিকরণ আর্থিক অবস্থার উন্নতি, জাত পেশার মান উন্নয়ন সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অন্যসর শ্রেণি হিসেবে সরকারি চাকুরি লাভের বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা আজ দেশ ও জাতির জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। সামাজিক মানমর্যাদায় এই পেশাজীবীদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সমাজ থেকে ভেদজ্ঞান দূর করায় সকল সচেতন মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। পাদুকা তৈরির পাশাপাশি পাদুকা মেরামত ও পালিশের কাজ সমান্তরাল সচল থাকবে। ফলে এ-বৃত্তিটি বিলুপ্ত হবার লক্ষণ নেই বললেই চলে। অতএব, এই পেজাজীবীদের সার্বিক উন্নতি সকলের কাম্য হোক।

### খেয়াসুন্দর/পাটনী

পেশা যাদের খেয়া পারাপার করা, তাদেরকে পাটলী বলে, এরা নিপুণ হাতে বৈঠা চালিয়ে বা লগি খুঁচে নৌকায় (বা কোষায়) খেয়াঘাটের যাত্রীদেরকে খাল বা নদী সুন্দরমতো পারাপার করে থাকেন-তাই এরা খেয়াসুন্দর। পারাপারের ব্যক্ততা না থাকলে একাকী খেয়ার পরে বসেই এরা অন্তর্জগতে তৎক্ষণিক প্রবেশ করে ভাওয়াইয়া,

ভাটিয়ালি আধ্যাত্মিক দেশাত্মবোধক, প্রেম বা বিরহি গানের সুর তোলে। শৈল্পিক মনের মাধুরী মিলিয়ে দাঁড় টেনে বা লগি বেয়ে স্নোতের অনুকূল ও প্রতিকূল লক্ষ্য রেখে তরণী তরে যাত্রী সাধারণকে তাদের মালামালসহ পারাপার করে থাকে। তাই এদেরকে খেয়াশিল্পীও বলা চলে। এদেরকে ‘মার্বি’, ‘ঘাটমার্বি’ বা খেয়ারি ও বলা হয়। মার্বি-র আভিধানিক অর্থ-নৌ-চালক, কর্ণধার প্রধান ব্যক্তি বা মোড়ল জেলে।

পদ্মা-মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ, পদ্মা-মেঘনার শাখাপ্রশাখাসহ বহু ছোট-বড় নদী ও খাল পারাপারের ঘাট বা খেয়াঘাটের সংখ্যা একসময়ে সঠিকভাবে নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য ছিল। কেননা খেয়াঘাট দূরবর্তী স্থানে থাকায় ছোট নদী বা খাল পাড়ের অনেক ধনাত্য বাড়ির লোকজন পারাপারের জন্য নিজস্ব খেয়া নৌকাও ছিল। মাসিক বেতনভুক্ত পাটনীও ছিল। আবার ছোটছোট খালপাড়ের বাড়ির কেউ কেউ নিজেদের খেয়ানৌকায় (বা কোশা, কোন্দা, (ভেলায়) নিজস্ব লোকজন পারাপার করতো। বড় নদী পারাপারে গুদারা (বড়নৌকা) থাকতো। এ-ঘাটকে বলা হতো গুদারাঘাট।

ছোট নৌকাকে এ-অঞ্চলে কোষা (কোশা) বা ডিঙ্গি বলা হতো। ছোট নদী ও খাল পারাপারে কোষার (তালগাছের গোড়ার অংশের লম্বালম্বি কুন্দা যা খোদে লোকজন বসার ব্যবস্থা করা থাকে) ব্যবহার করে পারাপার চলতো। আবার কলাগাছের ভেলায় বিলাঘঁথলের কোথাও কোথাও পারাপারসহ অন্যান্য কাজও চলতো। ‘ভেলা’ নিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেয়েছেন “অকূল মাঝে ভাসিবে কে গো ভেলার ভরসায়,” শরীয়তপুর অঞ্চলে ‘কোষা’ র ব্যবহারের প্রমাণ মিলে গোলাম মোস্তফার লেখায় “শ্রীপুর নদীতে ‘কোষা’ ভাসাইয়া চলেছে ঈসা খান”। তৎকালীন দক্ষিণবিহুমপুরের ‘শ্রীপুর’ বর্তমানে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার চরআত্তার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীপুরে চাঁদরায়ও কেদাররায়ের আদি বাসস্থান ছিল। জাজিরা উপজেলায় আজও একটি ঘাটের নাম ‘মঙ্গলমার্বির ঘাট’। এ-জেলায় কোনো কোনো উপজেলায় ‘মার্বি কান্দি’, ‘মারিবাড়ি’। এমন কি পালং থানার পালং ইউনিয়নে একটি গ্রামের নামই ‘পাটনী গাঁও’। এ-থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এ-অঞ্চলে ‘খেয়াজীবী’ কম ছিল না। প্রাকৃতিক কারণে ভোগলিক পরিবর্তনের ফলে অনেক নদীতে চর জেগেছে, রাস্তাঘাট হয়েছে। অনেক খেয়াঘাটে বা তার আশপাশ দিয়ে ত্রীজি, সেতু, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। যাত্রী সাধারণের চলাচল সহজতর হয়েছে। ফলে খেয়া ঘাট এখন ইতিহাস বা স্মৃতিচারণের খোরাক হয়ে উঠেছে। শতশত খেয়াঘাটের পরিবর্তে আজ হাতে গোনা কয়েকটি খেয়াখাট রয়েছে। এদের মধ্যে অনেক ঘাটে একধিক খেয়াও রয়েছে। কোনো কোনো ঘাটে কেবল একটি খেয়াই দেখা যায়।

খেয়াসুন্দর (পাটনী) একসময় বংশানুক্রমে খেয়াপারাপারের বৃত্তিতে নিয়োজিত হয়ে পড়তো। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রসার ও প্রভাবে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে খেয়াপারাপারের অধিকাংশ ঘাটই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সম্প্রদায় বা জতিগত ভাবে এ-পেশায় জীবিকা নির্বাহকারীর সংখ্যা আজ শূন্যের কোঠায়। আজিকার দিনে পাটনী সম্প্রদায়ের লোকজন আর এ-কাজে খুঁজে পাওয়া ভার। পাটনীদের প্রায় সকলেই যখন অন্যান্য পেশায় জড়িত হয়ে পড়েছে। হাতে গোনা যেমন সমস্ত

খেয়াঘাটে পারাপারের কাজ চলছে, সেখানে দেখা যায় জাতিগত পাটনীদের পরিবর্তে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক খেয়াসুন্দরের কাজ করছে। আগামীতে ত্রীজ কালভটি নির্মিত হয়ে গেলে অথবা নদীর থাল ভরাট হয়ে গেলে খেয়াঘাট আর সচল থাকবে না। সম্পূর্ণরূপেই বিলীন হয়ে যাবে খেয়াপারা পারের পেশাটি। হয়ত সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যে দিন নতুন প্রজন্মের নিকট খেয়া পারের তরনি, ‘খেয়াসুন্দর’ ‘পাটনী’ বা ‘মাঝি’ শব্দগুলো কল্পনার বিষয় হয়ে উঠবে।

### অঙ্গসুন্দর/বাডুদার

ঘর-দুয়ার, আঙিনা, চাতাল, রাঙ্গাঘাট, নর্দমা, বড় বড় যানবাহনাদির ময়লা-আবর্জনা ও ল্যাট্রিন বা টয়লেটের মলমৃত্র অপসারণসহ ধূয়ে পুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা যাদের বৃত্তি তাদেরকে বাডুদার (ঝাড়+উ=বাড়ু+দার) বা মেথর (ফা. মিহতর) চলতি কথায় বলা হয়। এরা এখন ‘সুইপার’ নামেও পরিচিত। এরা নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা, কলাকৌশল ও দৈহিক বল প্রয়োগ করে সম্মার্জন কর্মাদি সম্পন্ন করে থাকে তাই এরা সম্মার্জন শিল্পী। সভ্য সমাজের মানুষ যে সমস্ত অঙ্গন ময়লা আবর্জনা বা মলমৃত্র দারা নোংরা বা অপবিত্র করে তোলে, বাডুদার বা সম্মার্জন শিল্পীরা সে সমস্ত অঙ্গন নির্বিধায় শুক, সুন্দর ও পবিত্র করে রেখে যায়, বলে এরাই অঙ্গনসুন্দর বা স্থানসুন্দর।

স্বার্থীন্পূর্ব এতদাথলে কেবল পালং থানার চিকন্দী কোটে (টাউন চিকন্দী) সুইপার দেখা যেত। আগে বেশিরভাগ অফিসগুলোতেই নিম্নশ্রেণির কর্মচারীরা নিজেদের অফিসঘর নিজেরাই সম্মার্জন করতো বাইরে আশপাশের ময়লা আবর্জনার স্তৃপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য অর্থের বিনিময়ে বদলা, কামলা, দিনমজুর বা জন নিয়োগ করা হতো। মহকুমা গঠিত হলে পালং-এ সরকারি বেতন বা ভাতাভুক্ত কিছু মেথর শ্রেণির লোক বসবাস শুরু করে। জেলা হবার পর অদ্যাবধি তারা জেলসদরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ব্যক্তিগত কাজে ডাক পেলে অর্থের বিনিময়ে অঙ্গন সুন্দর বা সম্মার্জন শিল্পীরা কাজ করে দেয়।

এক সময়ে জমিদার বাড়ি ধনীক শ্রেণি বা সমাজপতিদের কোনো কোনো বাড়িতে সভাসুন্দর, নরসুন্দরের দু'একটি পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেতো। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তি, দেশবিভাগকেন্দ্রিক দেশত্যাগ, সাম্প্রদায়িক হামলাকেন্দ্রিক দেশত্যাগ ইত্যাদি করণে আজ এ-অঞ্চল প্রায় তুইমালী-শৃণ্য হয়ে পড়েছে। দু'চার ঘর যারা ও আছে, তাদের মধ্যে সম্মার্জন শিল্পীর সংখ্যা নগণ্য। সাম্পত্তিক কালে কোনো কোনো সরকারি অফিস-আদালতে যে সমস্ত অঙ্গনসুন্দরের চাকির হয়েছে, তাদের একেকজন, একেক সম্পদায়ের বা শ্রেণির লোক। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, কেউ মেথর, কেউ তুইমালী, কেউ নিম্নবিত্তের, কেউবা আর্থিক বিপদগ্রস্ত নিম্নমধ্যবিত্তের কেউ পুরুষ, কেউ নারী। পূর্বানুপ এরা কোনো একটি কাস্ট বা জাতি গঠন করতে পারেনি-বিভিন্ন কারণে তা হয়ত সম্ভবপ্রাণ নয়।

বুর্জোয়া ও সামন্ততাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের কল্যাণে সেবামূলক বৃত্তিতে যারা নিয়োজিত, তারাই সমাজে নির্দিত, অবহেলিত, নিগৰীত ও ছোটজাত বলে উপেক্ষিত।

সভ্য সমাজে মানুষগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রাখতে, দুর্গন্ধমুক্ত নিরাপদ পরিবেশে আয়োশী জীবন যাপনের লক্ষ্যে এই অঙ্গে সুন্দররা এ-কাজটা না করে অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করলে, সমাজটা সম্মার্জন শিল্পী শূন্য হয়ে পড়লে, সমাজে তথাজিতি উচ্চারণের কী দশা হতো তা কি কেউ কখনও ভেবে দেখেছে!

সমাজে সম্মার্জন শিল্পীর স্থান যে অন্য কারোর স্থান অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়, এরা যে অস্পৃশ্য বা ছেট জাতের নয়, বরং এরাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু-তা সর্বজন শৰ্কেয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পর্ক প্রবাদ পুরুষ ড. শ্রীমৎ মহানাম বৃত্ত ব্রহ্মচারী (শ্রীশ্রীঠাকুর জগৎবন্ধু সুন্দরের পরস শিষ্য) প্রমাণ করেছেন এবং তাদের সম্মান ও স্বীকৃতি স্বরূপ ফরিদপুরে ‘বন্ধুর পন্থী’ গড়ে তুলেছেন। তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন, কার্যকরী ও অনেকটা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যারা সমাজকে শুন্দসুন্দর রেখে পবিত্রতা উপহার দেয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য যাদের আত্মনিবেদিত প্রাণ মানুষকে যারা দেবজ্ঞানে ভক্তি ও সেবা করে থাকে, তারা কোনো মতেই ছেট জাতের নয়, বরং তারাই উপরের মানুষ, কারোর অশুদ্ধার নয়।

অপন সুন্দরদের পেশাগত কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও গুণগত মান উন্নয়ন, পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছতাতা, সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক মান মর্যাদা বৃদ্ধি এবং এদের পেশা ভিত্তিক উচ্চ নিচু ভেদজ্ঞান, নিন্দা অবজ্ঞা সমাজ থেকে অপসারণ কলে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ সরকার, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সচেতন মহল ও সমাজকর্মীদের কার্যকর ভূমিকায় এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

## পুরোহিত

অন্যান্য এলাকার মতো শরীয়তপুর জেলার হিন্দু সমাজে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেদের পুরোহিত (পূজারি ব্রাহ্মণ/ঠাকুর) দিয়েই পূজা, যাগমজ্জ, শ্রাদ্ধাদিসহ যাবতীয় যাজন কর্মাদি করানো হতো। বিভিন্ন সময়ে দেশত্যাগের ফলে সম্প্রদায়ভুক্ত পুরোহিতের অভাব হতে থাকে। এখন এ-পেশার সদর উপজেলার ধানুকাটে ৫/৭ জন ও নড়িয়া উপজেলার লোনসিং-এ-দু'একজন বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণপুরোহিতের নাম জানা যায়। রাঢ় শ্রেণির ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। ফলে সর্বজনীন পূজা+পার্বণ, শ্রাদ্ধাদিও অন্যান্য স্মর্ত্যবনাদি ক্রিয়াকর্মে অকুলীন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতও নিয়োগ করা হয়।

এসব ক্রিয়াকর্মে প্রতিবেশি জেলাগলো থেকেও প্রয়োজন হলে পুরোহিত আনা হয়। আবার এ-জেলাধীন এক উপজেলার পুরোহিত আরেক উপজেলায় অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে অবস্থান করে যজন-যাজন কর্মে নিয়োজিত হয়ে থাকে।

পুরোহিতগিরি করে বর্তমানে স্বচ্ছভাবে সংসার পরিচালনা করা খুবই দুর্ক বাংলাদেশ আমলেও এ-জেলার অনেক ধার্ম হিন্দুশূণ্য হয়ে পড়েছে।

হিন্দু জনস্থ্যা ক্রমাগত হাস পাওয়ায় এবং পূজাপার্বণ ব্রতাদি করে যাওয়ার বছরব্যাপি পুরোহিতদের তেমন একটা ডাক পড়েনা। ফলে অনেকটা সময় পুরোহিতর

প্রায় বেকার সময় কাটান। একমাত্র দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতী পূজা এলে কোনো কোনো এলাকায় পুরোহিতদের টানাটানি পড়ে যায়। এ-সময়ের প্রাণ্ডিক্ষণ্ঠা ইত্যাদি দিয়ে সারা বছর চলা যায় না কোনো ক্রমেই। ফলে পুরোহিতদের অনেকেই দুর্বিধাজনক অন্যপেশায় জড়িত হয়ে পড়েন। আবার অন্য পেশায় থেকেও কেউ কেউ প্রয়োজনবোধে পুরোহিত গিরি করে থাকেন। এধরণের পুরুত্বের সংখ্যা শরীয়তপুরে অর্ধেকেরও বেশি। আর্থিক স্থস্তল ও স্থায়ী মন্দির, আক্রা বা আশ্রমের সেবাইত বা পুরুত্ব স্থায়ীভাবে বেতনভুক্ত থেকেও স্বচ্ছলভাবে নিজের সংসার চালাতে পারছে না না।

অনেকে বলে থাকেন, পুরুত্বের মধ্যে এমনও আছেন যারা সঠিকভাবে যাজন কর্মাদি করতে পারেন না, মন্ত্রও সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না। কেননা এ-বিষয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা নেই-ফলে তারা দায়সারা কাজ করে দক্ষিণাও প্রাপ্য জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান। এমনকি চাহিদা বেড়ে গেলে দক্ষ পুরুত্বাও সময় ফাঁকি দেন-এমনটিই অনেকের ধারনা। এসবের মূল কারণ হলো-বর্তমান দুর্ঘটনার বাজারে অন্য পেশায় নিয়োজিত থেকে সঠিক পুরুতগিরি শিক্ষার পর্যাপ্ত সময়ও এদের থাকে না।

সর্বদিক বিবেচনায়, পুরোহিতগিরি করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও এই পেশায় টিকে থাকার মতো পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষ্যে সরকার ও সচেতন হিন্দু মেত্হাপীয় ব্যক্তিদের এগিয়ে এসে পুরোহিতদের আর্থিক অব্যহার উন্নতি ও সামাজিক মান-সম্মান বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

### সভাসুন্দর/ ধোপা

ধোপা/ধোবা {স. ধিৰ+অক(মূল)=ধাবক} বলতে আমরা বুঝি, অন্যের কাপড়-চোপড় ধোলাই করা যাদের বৃত্তি। এরা কাপড়ে রং করা বা কাপড় ছোপানোর কাজ করে বলে এদেরকে 'রঞ্জক' বা 'রঞ্জক' {স. রঞ্জ+ (মূল) } বলা হয়। বাস্তবতা এটা যে, পোশাকের রং ও পরিকার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান মানুষের মনের উপর প্রভাব ফেলে। আর রঞ্জক বা ধোপারা য়ালা কাপড়, পোশাকাদি পরিকার পরিচ্ছন্ন করে পরিপাটি ভাঁজ দিয়ে ইত্তিরি করে দেয়-যাতে তার খরিদ্বার তা পরিধান করে জনসম্মূখে সভাসমিতিতে টিপটেপ বা সুন্দর একটি মন নিয়ে উপস্থিত হতে পাড়ে এজন্যই 'ধোপা বা রঞ্জক'-কে 'সভাসুন্দর' বলা হয়।

আগের দিনে, ধোপারা কাপড়-চোপড়, পোশাক-আশাক, বিছানার চাদর, বালিশের কভার, কাঁথা, লেপতোষকের কভার, গায়ের চাদর, দরজা-জানালার পর্দা, চান্দিনা (সামিয়ানা) ইত্যাদি ধোলাই করে শুকাতো, পরে সুন্দর ভাঁজ দিয়ে প্রয়োজনবোধে ইত্তিরি করে দিয়ে যেত। আবার বড় বড় বাজারে বা বন্দরে ধোপাঘর, ধোপার দোকান বা লন্ত্র দেখা যেত, যেখানে ধোলাই ও ইত্তিরি করা উভয় কাজই হতো। কিছু কিছু জিনিস ধোপারা জলে ধুয়ে নিতো। এক্ষেত্রে সোডা বা কাপড় কাচার সাবান, প্রয়োজনবোধে ত্রিচিং পাউডার এমন কি লোহার দাগ তুলতে অক্সালিক এসিড ব্যবহার করতো। বর্তমানে ডিটারজেন্ট পাউডার (সার্ফের গুড়া, হইলের গুড়া ইত্যাদি) দ্বারা অতি সহজেই

কাপড়-চোপড় ধোয়া যায়, এতে সময় ও শ্রম কম লাগে, ফলে অধিকাংশ লোকজন নিজেরাই এ-কাজ বাঢ়ি বসে করে থাকে। অনেকের বাড়িতে খি-চাকর, বুয়া বা কাজের লোক ধোলাই কাজটা ও করে থাকে। আবার বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে তৈরী ওয়াশিং মেশিন দ্বারাও অনেক বাড়িতে পোশাকাদি ধোলাই করা হয়। শুধু ইন্সি করাতে কেউ কেউ লন্ড্রির শরণাপন্ন হয়। ফলে ধোপাদের ধোলাই কাজ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। দেশত্যাগের কারণে ধোপা বা রজক দাসের সংখ্যাও এ-অঞ্চলে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কোথাও কোথাও দু' চার ঘর আছে তারাও অন্য পেশায় যুক্ত। পূর্ব থেকেই সমাজে এই পেশাটাকে নিম্নমানের এবং এই পেশাজীবীদেরকে তুচ্ছ, তাছিল্য করে ছেট জাতের মনে করা হতো। এ-থেকে উত্তোলনের লক্ষ্যেই দু'তিম পুরুষ আগের থেকে এসম্প্রদায়ের লোকজন অন্যান্য পেশায় যুক্ত হয়ে পড়ে। এ-জেলার অধিকাংশ ধোপা-দায়েরাই কামারের কাজ (যেমন লোহা বা ইস্পাত দিয়ে খস্তা, কোদাল, কুড়াল, কাস্তে-হাতুড়ি, ছুড়ি, যাতি, শাবল, বডিদা, হাত দা, রামদা ইত্যাদি তৈরি ও পাইন দেয়ার কাজ) করে থাকে। এরা ‘কর্মকার’ বলে পরিচিত এবং এই পদবিটাই এরা ধারণ করছে। অনেকে আবার পানের বোরজে কাজ করে বা পান-চুন ইত্যাদি বেচাকেনা করে। পাকিস্তান আমল থেকেই দেখা যায়, ধোপাদাসের অনেক ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, এরই ধারাবাহিকতায় আজ এদের মধ্যে ডাঙ্কার (এমবিবিএস অবধি), স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সরকারি ও বেসরকারি চাকরজীবী-সহ ব্যবসায়ী স্বর্ণশিল্পী ও রয়েছে। পূর্বপুরুষের পদবি ‘ধূপি’ থাকলেও এটা এখন আর কেউ ধারণ করছে না। এরা এখন, ‘দাস’, রজকদাস, মজুমদার, কর্মকার’ বা ‘রায়’ পদবি ধারণ করছে।

বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে চর্মকার/মুচি (ঝিষিদাস, রবিদাস, মনিদাস পদবিধারী ও নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের বেকার যুবক এমন কি মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ কেউ ধোপার কাজ বিশেষ করে লন্ড্রির কাজ করে জীবনধারণ করছে। এখন আর ধোপা বাড়িতে ধোপার পাট বা ধোপির আচাড় দেখাই যায় না।

এ-জেলার পালং থানার বিলাসখন গ্রামে মানবেন্দ্র ধূপি (মানুধূপি) নামক একজন প্রবীণ ত্রিনাথ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। ইনি বিভিন্ন স্থানে ত্রিনাথের মেলায় ত্রিনাথ ঠাকুরের পরস্তাপ (কাহিনী) বিভিন্ন ঢং-এ-উপস্থাপন করে ভক্তদেরকে অভিভূত করতেন। ইনি বাঁড়-ফুঁকের কাজ করতেন এবং তাবিজ প্রদান করতেন। এঁর পুত্র পৌত্রগণ কথনও ধোয়া বা ধোলাইর কাজ করেন নি। পালং-এ নরোত্তম ধূপি ছিলেন ত্রিনাথ ঠাকুরের আরেক ভক্ত। ইনি খুবই সুন্দর করে ত্রিনাথের পরস্তাপ বলতেন। ইনি চুন ঘোটা ও চুন বিক্রি করতেন। ইনার পুত্র-পৌত্রগণ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। এদের বর্তমান পদবি ‘দাস’।

কোনো কোনো স্থানে হিন্দুদের মধ্যে মৃতব্যক্তির সৎকার ও অশোচাদি পালনে পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় বা পোশাকাদি গ্রহণ করার মতো কোনো ধোপা বা ধোপানীকে পাওয়া যায় না। এ-ছাড়া প্রচলিত ধ্যানধারণা প্রসূত ‘ধোপার ছোয়াৎ সোডা, সাবান ইত্যাদি শুন্দিকরণ প্রথা’ও ধোপার অভাবে বজায় রাখা যায় না। ওয়াশিং মেশিনের সহজলভ্যতা ও ব্যপক প্রচলিত হয়ে গেলে ধোপা দ্বারা ধোলাই বা ‘ধোপাকে

কাপড় দেয়া' আর হয়ত সম্ভব হবে না। লঞ্চিতে শুধু ইতিবির করার কাজটাই থাকবে। 'ধোপা' বা 'ধূপি' পদবির কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

### তথ্যনির্দেশ

শ্রীমিহির রঞ্জন দেবনাথ, আঙ্গারিয়া বাজার, পালং

শ্রী বেদপ্রসাদ সাহা; শিক্ষক, ডোমসার জগৎ চন্দ্ৰ ইনসিটিউশান

শ্রী কৃষ্ণ শীল, সমিতি, শরীয়তপুর সদর

শ্রীসুশীলচন্দ্ৰ দে;- সভাপতি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ডামুড্যা উপজেলা, শরীয়তপুর গোসাইরহাট উপজেলার তথ্য দিয়েছেন কার্তিক চন্দ্ৰ দে, হাটুরিয়া বাজার, শ্রী কার্তিক চন্দ্ৰ দে-হাটুরিয়া গোসাইরহাট

শ্রী বিশ্বজিত পুটিয়া (শিক্ষক); পুটিয়াকান্দি, রাজনগর।

জসিম আহমেদ (শিক্ষক), সাধাৱণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচি শিল্পী গোষ্ঠী, সরিপুর শাখা, শরীয়তপুর

ডামুড্যা উপজেলার তথ্য দিয়েছেন: কমরেড নুরুল হক ঢালী, ধানকাঠি, ডামুড্যা। সদস্য, জাতিয় শিশু কিশোর সংগঠন, খেলাধর আসর।

শ্রীঅজয়কুমার পালং সাং-গুয়া খোলা, সিনিয়র শিক্ষক, দারুল আমান উচ্চ বিদ্যালয়, ডামুড্যা ডা. তারকনাথ বাংসবর্গিক, সঙ্গীত সম্পাদক, উদীচি শিল্পী গোষ্ঠী, শরীয়তপুর জেলা শাখা পেশাজীবীদের সমগ্র বিবরণ সমন্বয় করেছেন শ্যামাপ্রসাদ দেবনাথ।

## লোকচিকিৎসা ও তত্ত্বমন্ত্র

### ক. লোকচিকিৎসা

সুপ্রাচীন কাল থেকে গ্রাম বাংলার লোকচিকিৎসা প্রচলিত। কালের বিবর্তনে জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও এসেছে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন। চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটলেও গ্রাম বাংলায় লোকজচিকিৎসা ধরে রেখেছে তার শক্তিশালী অবস্থান।

লোকচিকিৎসায় বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয় উপাদান বিদ্যমান। বস্তুগত উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়— মৃত প্রাণীর হাড়, হাত্তি, ফুল, বীজ, পাতা-মূল, এবং নানা প্রকার তেল। প্রয়োজন মনে হলেই লোক চিকিৎসক প্রকৃতি থেকে তার নানা উপকরণ আহরণ করে থাকেন। লোকচিকিৎসার বস্তুগত ব্যবহারের কিছু নমুনা নিম্নে প্রদর্শন করা হলো—

১. পেট ব্যথা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয় পান পত্র ও সরিষার তেল।
২. বুকে ও পিঠে ব্যথার উপশম ঘটাতে সরিষার তেলে রসুন গরম করে সেক দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়।
৩. আমলকি, হরিতকী, বহেরা এই তিনটি ফল ত্রিফলা নামে পরিচিত। রক্ত আমাশয়ের চিকিৎসায় এই ঔষধ ব্যবহারে পরামর্শ দেওয়া হয়।
৪. সর্দি কমানোর জন্য কালোজিরা বেটে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৫. হৃদরোগের চিকিৎসায় রসুন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৬. হাত-পা ভেঙে গেলে মাঝার তেল মালিশ করার বিধান দেওয়া হয়।
৭. ডায়াবেটিস বা মেহ রোগের জন্য মেহগনি গাছের তিক্ত ফলের রস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৮. কাশির মহোত্তম ঔষধ হিসেবে বাচাদের তুলসী পাতার রস এবং বড়দের বাসক পাতার রস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৯. ঘৌনরোগ ঘঠিত নানা কাজে সাদা লজ্জাবতী গাছের মূল বা কাণ্ড গুড়া করে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
১০. গুটি বস্তে নিম্ন পাতার ছাল বেটে গায়ে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।
১১. শ্বাস কষ্টের জন্য উটের দুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

১২. বাতের ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হিসেবে শিয়ালের মাংস এবং কেঁচোর তেল পানের বিধান দেওয়া হয়।

১৩. হাত পা কেটে গেলে দ্রুত রক্তপাত বন্ধ করতে গাঁদা ফুলের পাতার রস অথবা মাকড়সার জাল ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

১৪. কুমিনাশক হিসেবে চিরতা গাছের ছাল ব্যবহার করতে বলা হয়।

১৫. বোলতার দংশনে ক্ষতের উপর চুনের প্রলেপ দেয়ার বিধান দেয়া হয়।

গ্রামীণ এই চিকিৎসাগুলো বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক চিকিৎসার পাশে বেমানান মনে হতে পারে তাই বলে এই চিকিৎসা বা চিকিৎসা পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা এখনও গ্রাম্য সমাজে বিলীন হয়ে যায়নি। প্রাচীন কালে এসব লোকচিকিৎসার জন্য নানা প্রকার শ্লোক প্রচলিত ছিল যার কিছু কিছু শ্লোক এখনও লোকমুখে শোনা যায়।

### ঝ. তত্ত্বমূল্য

মন্ত্রের মধ্যে জাদুশক্তির ধর্ম আছে। ধর্মের ব্যর্থতার পর্যায় থেকে জাদুবিদ্যার সূত্রপাত। জাদুর রূপ মন্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। জাদুর প্রাচীনত্বের বিচারে মন্ত্র লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীনতম শাখা। মন্ত্র উচ্চারণ করে আনুষঙ্গিক আচার-আচারণ পালন করলে মন্ত্রশক্তি কাজ করে। গুণী বা ওভা, কবিরাজ, পুরোহিত, বেদে-বেদেনী, ধাত্রী, শিরালী প্রভৃতি লোক আমাদের দেশে মন্ত্রের চর্চা করে।

মন্ত্র সম্পর্কে বড় কথা হলো তা গুপ্তবিদ্যা হিসেবে স্থাকৃত। গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করে মন্ত্র শিখিতে হয়। নির্ভুল উচ্চারণ করতে হয়। প্রতিকার ও নিরাময় লাভ, প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার তাগিদ, লাভ ও প্রাপ্তির আশা, বিনাশ ও ক্ষতি করা, বন্দী ও বশীকরণ, উদ্ধার ও শনাক্তকরণ ইত্যাদি কাজ হাসিল করতে মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশে বাঘ ও সাপের মৃত্যু খিলাতে, শরীর বন্ধ করতে, ঘর বন্ধ করতে, বড়শিতে মাছ ধরতে, বিষ মারতে, ভূত-পেত্তীর আছর ছড়াতে, ফসলের ক্ষেতে নজর লাগাতে, পিঠা নষ্ট করতে, চোর বন্দী করতে, রম্পণী বশীকরণে, হারানো জিনিস উদ্ধার করতে মানুষ মন্ত্র জানা লোকদের শরণাপন্ন হয়।

### গ. সুন্নাতে খাংনা

শরীয়তপুরে লোকজ চিকিৎসা হিসাবে সুন্নাতে খাংনা অতি প্রাচীন চিকিৎসা হিসাবে পরিচিত। গ্রামবাংলার মানুষ অতি প্রাচীন কাল থেকেই সুন্নাতে খাংনা করে আসছে অশিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত চিকিৎসক হাজাম দ্বারা। বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে ধনাট ব্যক্তিবর্গের ছেলে শিশুদের সুন্নাতে খাংনার কাজ সম্পন্ন করা হলেও মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে এখন সেই পুরানো পদ্ধতির মাধ্যমে হাজাম দ্বারা শিশুদের সুন্নাতে খাংনার কাজ করাবে হয়।

শরীয়তপুর সদর উপজেলার পশ্চিম কোটাপাড়া গ্রামের মৃত আকুবালী হাজামের পুত্র হাতেম আলী হাজাম গত ৪০ বছর ধরে একটানা সুন্নাতে খাংনার কাজ সম্পন্ন

করে আসছেন। হাতেম আলী হাজাম জানান, গত ৪০ বছর ধরে তিনি ছেলে শিশুদের সুন্নাতে খাংনার চিকিৎসা করে আসছেন। তারা পিতা যৃত- আকুবালী হাজামও একই পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। পৈত্রিক পেশা হিসাবে হাতেম আলী হাজাম এই লোকজ চিকিৎসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন। হাতেম আলী হাজাম জানান, আগে প্রতিদিন ৭/৮ টা সুন্নাতে খাংনার চিকিৎসা দেয়া হতো। এতে তার প্রতিদিন গড়ে ৫শ' থেকে ১ হাজার টাকা রোজগার হতো। কিন্তু এখন উন্নত চিকিৎসার কারণে মানুষ হাজাম দ্বারা সুন্নাতে খাংনার কাজ করান। এখন মাসে দুই চারটা সুন্নাতে খাংনার চিকিৎসা করান তিনি। এতে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা আয় হলেও এই পেশার উপর নির্ভর করে তার এখন আর সংসার চলে না। বাধ্য হয়ে তিনি অন্য কাজ কর্ম করে থাকেন।



হাজাম হাতেম আলী

হাতেম আলী হাজাম জানান, সুন্নাতে খাংনার চিকিৎসায় কিছু নিয়মনীতি আছে। যেই ছেলের সুন্নাতে খাংনা করানো হয় সেই সময় ছেলের মা অথবা খালা বা চাচি একটি মাটির পত্রে পানির মধ্যে চুল ভিজিয়ে রাখবে। এ সময় ঐ ছেলের আঙ্গীয়-স্বজন চুল ভিজানো পানির পাত্রে কাঁচা পয়সা ফেলবে এবং ছেলের জন্য দোয়া করবে যেন ব্যথা না পায়। সুন্নাতে খাংনার জন্য বাজার থেকে নতুন লুঙ্গি ও গামছা কিনে আনতে হয়। সুন্নাতে খাংনা করানোর পর তাকে কমপক্ষে ও দিন প্রযৱ্ত ঐ গামছা পরিধান করে থাকতে হয়। এরপর ঘা শুকানোর পর তাকে গোছল দিয়ে নতুন লুঙ্গি পড়ানো হয়। যারা ধনী মানুষ তারা হাজামের জন্যও একটি নতুন গামছা ও নতুন লুঙ্গি কিনে আনে। আর চুল ভিজানোর পানির পাত্রে যে কাঁচাটাকা ফেলা হয় তা সবই হাজামের প্রাপ্তি

টাকা। হাজামের চিকিৎসা ফি, নতুন লুঙ্গী ও গামছা এবং চুল ভিজানোর পানির পাত্রের জমা টাকা সবই নিয়ে থাকে। হাজাম জানান, এই চিকিৎসা ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করেছে। এক সময় জেলার খুটি উপজেলায় ২০০ থেকে ২৫০ জন হাজাম থাকলেও এখন এই পেশার লোক চোখে পড়ে না। তারপরও এই লোকজ চিকিৎসাটি সমাজ থেকে উঠে যায়নি। সুন্নাতে খাংনাকে গ্রামের মানুষ ‘মুসলমানি করা’ও বলা হয়। যে সকল ছেলেদের বয়স ৩ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত এমন ছেলেদেরই মুসলমানি কাজ করানো হয় বেশি। তবে এর কম বয়স ও বেশি বয়স ছেলেদেরও দুই একটা জুটেনা তা না। অনেক সময় বেশি বয়সী ছেলেদের মশারী খাটিয়েও সুন্নাতে খাংনার চিকিৎসা দিয়েছেন বলে জানান তিনি। সুন্নাতে খাংনার কাজ শেষে রক্ত থামানোর জন্য অনেক সময় কাপড় অর্ধ পোড়া করে তা পেচিয়ে দিয়ে থাকেন বলে জানান। এতে করে ঘা তারাতারি শুকায়। পড়ে ঘা শুকানো শেষে গরম পানিতে ভিজিয়ে পোড়া কাপড় তুলে ফেলতে হয়। কোনো কোনো সময় ব্যথার ট্যাবলেটও সঙ্গে রাখতে হয়।

## তথ্যনির্দেশ

**সাক্ষাত্কার:** হাতেম আলী হাজাম, বয়স ৬৫ বছর, পিতা- মৃত আকুবালী হাজাম, থাম- পঞ্চিম কোটাপাড়া, শরীয়তপুর সদর উপজেলা। শিক্ষাগত যোগ্যতা- অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। চিকিৎসা বিদ্যা- শুন্য, সুন্নাতে খাংনার চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা-৪০ বছরের। সাক্ষাত্কারের স্থান: কোটাপাড়া বাজার, বিকাল সাড়ে ৪ টা, তাঃ ২ এপ্রিল ২০১২।

## ধাঁধা

ধাঁধা হলো হেঁয়ালী বা প্রহেলিকাপূর্ণ প্রশ্ন। একটি বিষয়কে ঢাকা দেওয়ার জন্য পরোক্ষ ভাষায় বাতাবরণ তৈরি করা হয় ধাঁধার মধ্যে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে অলংকার শাস্ত্রের উপমা, রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় নেয়া হয়। প্রত্যেকটি ধাঁধার নিজস্ব উত্তর থাকে। এই উত্তরও ধাঁধার অংশ। যেমন—সাগরেতে জলু তার লোকালয়ে বাস/মায়ে ছুলে পুত্র মরে একি সর্বনাশ! এটি একটি ধাঁধার প্রশ্নের অংশ। এর উত্তর ‘লবণ’ কে নিয়েই ধাঁধাটি পূর্ণতা পায়। লোকসাহিত্যের অন্যান্য ফর্মে আবেগানুভূতি থাকলেও এতে আবেগের স্থান নেই। ধাঁধার ভাষা পদ্যধর্মী। সাধারণ পরিসর দুই-ছয় চরণ। তবে গদ্যের ধাঁধাও রয়েছে, যেখানে অপরপক্ষকে গদ্যে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হয়। বড় আকারের কাহিনিমূলক ধাঁধায় গদ্য অপরিহার্য। ধাঁধা এক প্রকার রহস্যপূর্ণ রচনা। এর আরেক নাম হেয়ালি। ধাঁধায় এমন কিছু শব্দ থাকে যার সাথে উপমা রঘপক প্রতীক ব্যবহার করে একটি প্রশ্ন তৈরি করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তর থাকে ধাঁধার ভেতর লুকিয়ে। কিছুদিন পূর্বেও বয়োজ্যেষ্ঠরা কনে দেখতে গোলে কনের বুদ্ধিমত্তা যাচাই করার জন্য ধাঁধা ধরতেন তাদের।

১

বাগানের ত্যা বারোলো টুনি  
আতপাও তার কুনিকুনি॥

উত্তর : মশা

২

ছয় পাইয়া উগোনী  
মুহি ক্যাবল বনবনি।

উত্তর : ডাশ

৩

প্যাট আছে তার মাথা নাই  
প্যাট বরা ক্যাবল খাই।

উত্তর : বালিশ

৪

চা'র আংগুল মানুশডা হেকতি নাগে বয়  
মারতি গ্যালি দোরতি আসি এতো বড়ো দায়।

উত্তর : জঁক

৫

পাটায় দোম দোম চাটায় খিল  
আকোরমা বাতাশ খাই

উত্তর : কর্মকারের জাতা।

পিটি পড়ে কিল।

৬

আলকুশী আলকুশী  
লিপ করা গিচিমিচি

উত্তর : বিছা।

৭

এ্যাক লাহির দুই মাতা  
লাহি যায কোলিকাতা

উত্তর : নৌকা ।

৮

এ্যাতুক গ্যাচে  
শোনার ফড়িং নীচে ।

উত্তর : পাকা মরিচ ।

৯

ফিটিরউপর দিয়া লাও  
যেহানে চাও শোয়ানে যাও ।

উত্তর : খড়ম ।

১০

এ্যাক প্যাটের দুই বাই  
কে'র সাতে কে'র দেহা নাই ।

উত্তর : চাঁদ সূর্য ।

১১

ছাটেনী বা'র বুদনি  
প্যাটের ত্যা গু রাহে  
মাতার মোদনি ।

উত্তর : চিংড়ি মাছ ।

১২

একটু একটু ছেরিরা  
ঝুপুর ঝুপুর ডুম পারে  
ডুব দিলে তাদের নেংটি ভেজেনা ।

উত্তর : কচুরিপানা ।

১৩

বাগচার কলসি মধুতরা  
বিনা সড়ায় উপুর করা ।

উত্তর : গাভীর বাট ।

১৪

এক ঝাড় টান দিলে বেত ঝাড় নড়ে  
কাহাড়ে ডিম পাড়িলে পানিতে ভাসে

উত্তর : মাখন ।

১৫

উত্তম পুকুরের মধ্যে নবহরি গাছ  
টানিয়া তুলিতে গেলে

উত্তর : দুধের সর ।

ভাঙগিয়া খান খান ।

১৬

আগা ঝুম ঝুম গোড়া মোটা  
যে করতে পারেনা তার বৌ চটা ।

উত্তর : ঝাটা ।

১৭

একটু খানি জলের ভিতর  
মাছ ফিস ফিস করে  
কোন বেটার সাধ্য নাই  
জাল ফালাতে পারে ।

উত্তর : ভাতের পাতিল ।

১৮

এক গাছে মচির  
বুম বুম করে  
এক কোটী বিদানী এসে  
না গনিতে পারে ।

উত্তর: তারা ।

১৯

এক হাতির দুই মাথা  
হাতি যায় কলকাতা ।

উত্তর : নৌকা ।

২০

হীরি ইরি দাঙা বিরি বিরি পাত  
মানিক দাঙা সাড়ে ষোলহাত ।

উত্তর : সুপারী গাছ ।

২১

পি পি পি  
লেঙ্গুর দিয়া পানি তোলে, সে আবার কি ।

উত্তর : বাতি ।

২২

ঘর আছে  
তার তলা নাই ।

উত্তর : ডিম ।

২৩

একটু একটু ছেড়ারা দুধ দিয়া  
ভাত খায়  
বড় বড় গাছের সঙ্গে  
হেনো ওইবার যায় ।

উত্তর : কুড়াল ।

২৪

তিনি জোনারের তিরিশ কাম  
বাটো ভরে দিলাম পান  
বিচার করে না খাও পান  
যাবে তোমার দুইটি কান ।

উত্তর : চোম্পা আটাইল কান  
মানুষের দুই কান ।

২৫

আগা লায়ে ঝুমুর ঝুমুর  
পাছা লায়ে বিয়ে  
সেই ঘুঘুর বিয়ে হইল  
কলকাতা যেয়ে ।

উত্তর : ফড়িৎ ।

২৬

হলদে রং এর পক্ষীটি খরকার মতন পাও  
লাফ লাফ দিয়া চুমা খায় বাক সোহাগী মাও ।

উত্তর : বল্লা ।

২৭

রাজার ছাওয়াল ভাত খায়

টেপা ছেড়া ধোন দেহায় ।

উত্তর : বদনার নল ।

২৮

বার মাসের মেয়ে বটে  
তের মাসের কালে  
গান্দা গান্দা প্রসব করে  
অগণন ছেলে ।

উত্তর : কলা গাছ ।

২৯

আহাশে গোনে পড়লো হাতি  
হাতির মাতায় মারে লাতি ।

উত্তর : চেঁকি ।

৩০

আমি খালে তুমি ডালে  
তোমার আমার মৌয়াত হইবে  
এককই কালে ।

উত্তর : মাছ ও মরিচ ।

৩১

ইল বিল ছগাইয়া গ্যাছে  
গাছের আগায় পানি ।

উত্তর : নারিকেল ।

৩২

ছোড়া কালে কাপড় পরে  
বড় হইলে ঝুইল্যা ফ্যালে ।

উত্তর : বাঁশ ।

৩৩

তক্তার উপরে তক্তা  
তক্তা খাইছে ঘোনে  
বিন্দা বোনে আগুন নাগজে  
নিবাইবে কোন জনে ।

উত্তর : জোনাকি ।

৩৪

বড় গাঙ্গো বড় মাছ  
লেজে ভরা কাঁড়া  
এই পুনি ভাঙ্গাইতে পারে  
আজম খার ব্যাটা ।

উত্তর : কুমির ।

৩৫

হাউতা রইছে খাউতা দিয়া  
বৈরাগী রইছে চাইয়া  
গাছের ফলড়া গাছে রইছে  
বোটটা পড়ছে খইয়া ।

উত্তর : গরুর দুধ ।

৩৬

এক অক্ষরে নাম ধরে  
সর্বলোকে কয়

ঘড়িকের মধ্যে উঠে পরে  
জানিবে নিশ্চয় ।

উত্তর : শশুক ।

৩৭

বুদ্দি নাই যার আপন ধরে  
বুদ্দি বিশায় যারে তারে ।

উত্তর : বই ।

৩৮

য্যা পাই হেট্টয়া খাই  
পানি দেলে মইরা যাই ।

উত্তর : আসুন ।

৩৯

হায়রে তরমুচ ধরমু কি  
বোট নাই তোর করমু কি ?

উত্তর : ডিম ।

৪০

একটু খানে ঘরে চুনকাম করে  
এমন মিঞ্চী ন্য যে ভাইঙ্গা গড়তে পারে ।

উত্তর : ডিম ।

৪১

ঝাকর মাকর মাথা তার কোবা কোবা গা  
ঠ্যাংগে দড়ি গলা কাড়ি গিল্লা গিল্লা খা ।

উত্তর : খেঁজুর গাছ ।

৪২

দেইখখা আইছি কালারাজার বিলে  
মরাডায় জ্যাতাডারে গিলে ।

উত্তর : মাছ ধরার চাই ।

৪৩

আট পাও ষোল আড়ু  
জাল পাতে নিমাই সাদু ।  
খাশ থুইয়া তরে পাতে  
মাছ থুইয়া মানুষ বাজে ।

উত্তর : মাকড়শার জাল ।

৪৪

খালধারে ধইনছা গাছ ধইনছা বড় ফলে  
রাজার মাইয়া টোক্কা দেলে বর বারাইয়া পড়ে ।

উত্তর : হোগলের গুড়ি ।

৪৫

খালধারে হিজইল গাছ  
কাড়তে লাগে ছয় মাস  
হাতে বাপ্পোয় কাডে  
তওনা গাছের বাহশ কাডে ।

উত্তর : ছায়া

৪৬

এক থাল সুবারি  
গোনতে পারে কোন ব্যাপী ।

উত্তর : আকাশের তারা ।

৪৭

গাছটা ঝাউপড়া

ফলড়া আউররা  
যে না কইতে পারবে  
হার গুষ্টি মুদ্দা জাউররা ।

৪৮

কালা কচু ধলা কচু রঞ্জের ফোটা  
এই পুনি ভাঙ্গাইবে কালে খার ব্যাটা,  
কালেখার ব্যাটা গ্যাছে ম্যাদে ।

এই পুনি ভাঙ্গাইবে বার বছুরে বাদে ।

৪৯

মুড়ুমাঝ গাছটা  
ফল হয় পাঁচটা  
বরে ও না পড়েও না ।

৫০

বাগে গোনে আইল বুড়ি  
হ্যার গায় কুড়ি কুড়ি ।

উত্তর : দেবদারঃ গাছ ।

উত্তর : পান ও চুন ।

উত্তর : এক হাতে পাঁচটা আঙুলা ।

উত্তর : কাঁঠাল ।

## প্রবাদ-প্রবচন

লোকসংকৃতির সমৃদ্ধ শাখার নাম প্রবাদ-প্রবচন। লোকায়ত সমাজের চিরস্তন পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত যে জ্ঞান তা-ই গ্রহিত ও প্রকাশিত হয়েছে প্রবাদ-প্রবচন হিসেবে। গ্রামবাংলায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন লোকজীবনে একাধারে চিন্তবিনোদনের আধার, পক্ষান্তরে লোকশিক্ষা ও লোকজ্ঞানের বাহন হিসেবেও ক্রিয়াশীল।

প্রবাদের জন্মের সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রবাদ-বিশেষজ্ঞ সুশীলকুমার দে'র ভাষায়, ‘প্রবাদ-বাক্যের অদিস্মৃষ্টা ছিল সাধারণ মানুষ, যাহার সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতা প্রথমে প্রবাদের উপকরণের পরে প্রবাদের সৃষ্টি ও প্রচলন করিয়াছিল। যাহা পিতার বচন ছিল, তাহা কালক্রমে পুত্রের সম্পত্তি হইল; গৃহিণীর সরম বুলি গ্রহের বাহিরেও মেয়েলি ছড়ায় নিত্যতা লাভ করিল; গ্রামের মোড়লের রসিকতা গ্রামের আগুবাকে পরিগত হইল; শিল্পী বা কারিগরের ধারাবাহিক শিল্প-রহস্য কোনো প্রবচনের সংক্ষিপ্ত স্থায়িত্বে স্মরণীয় হইয়া রহিল। প্রবাদের রচয়িতার নাম লুণ হইল বটে, কিন্তু তাহার চটকদার বাক্য সাধারণের প্রত্যক্ষ বা বাস্তব অনুভূতির নির্যাস লোকপ্রিয়তার কঠিপাথেরে উত্তীর্ণ হইয়া লোকপরম্পরায় প্রচলিত হইল। ক্রমে সাহিত্যিক রচনায় উদ্ভৃত বা চলতি কথায় অত্তর্ভুক্ত হইয়া ইহাদের রূপ ও রস পরিপূর্ণ ও স্থায়িত্ব লাভ করিল।’<sup>১</sup> প্রবাদ সম্পর্কে শশিমোহন চক্রবর্তীর মণ্ডব্যাটি সত্যিকার অর্থেই প্রবাদপ্রতিম। তিনি বলেছেন—‘একের অভিজ্ঞতায় ইহার জন্ম, বহুর ব্যবহারে ইহার জীবন’।<sup>২</sup> লোকসংকৃতির অনেক উপাদানই বিলুপ্ত হয়েছে কিংবা হতে চলেছে; কিন্তু প্রবাদের মৃত্যু নাই। কারণ এটি মানুষের মুখে-মুখে ফেরে। মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজনে প্রয়োগ করে বলেই প্রবাদ টিকে থাকে। প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহমদের মতো, ‘প্রবাদ বুদ্ধিপ্রধান রচনা; মন্তিক্ষ থেকে এর জন্ম। বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে চিন্তা ও মনন যুক্ত হয়ে প্রবাদ জন্মালাভ করে। এখানে হন্দয়ের বা আবেগের স্থান নেই।’<sup>৩</sup> এই উক্তির শেষাংশের সঙ্গে অনেকের ভিন্নমত তৈরি হতে পারে। প্রবাদে হন্দয়ের বা আবেগের স্থান আছে বলেই মনে হতে পারে। প্রবাদ শ্লেষ-বিদ্রূপের হাতিয়ার কিংবা সূক্ষ্ম রসের ভাঙ্গার হওয়ার পেছনে আবেগের স্থানকেই চিহ্নিত করা যায়। আবেগ আছে বলেই প্রবাদ-প্রবচনে ছন্দ-অন্ত্যমিলের ব্যবহার পাই, রূপক-প্রতীকের সাক্ষাৎ পাই। প্রবাদে সম্পর্কে ফোকলোরবিদ প্রফেসর ডেন্টের আবুল আহসান চৌধুরীর ধারণাও এখানে তুলে ধরা যায়। তিনি বলেছেন— ‘বাঙ্গালি মানসের বৈশিষ্ট্য, তার প্রকৃতি-প্রবণতা, জনজীবনের চালচিত্র, ঝুঁটি-চিন্তা-চেতনা, সমাজতত্ত্ব বোধ করি সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে

প্রবাদ-প্রবচনে। সক্রিয় সমাজ-মনের সৃষ্টি এইসব প্রবাদ-প্রবচনের ভেতরে মানুষের যেমন অভিজ্ঞতা তেমনি রসবোধের পরিচয় আছে।<sup>18</sup> লোকমানসের এই সম্পদ একটি জাতির গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষের মূখে ছড়িয়ে থাকা এই প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরক্ষণের গুরুত্বকে তাই অঙ্গীকার করার উপায় নেই। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে অনেকেই এই দায়িত্বটি পালন করেছেন। শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকটি প্রবাদ সংগ্রহ করে তুলে ধরা হলো:

**‘অ’**

১. বেশি বড়ো অইলে ঝরে ভাঙ্গে, বেশি খাড়ো অইলে ছাগলে মোড়ে
২. অস্যলো খাওয়া যায়, অস্যলো সওয়া যায় না

**‘আ’**

৩. আপন দোষে মরে বান্দা, হ্যাশে দেয় আন্দার দোষ
৪. আপন চাইয়ে পর ভাল, পরের চাইয়ে জোংগোল ভালো
৫. আগাছা গাছের বাইড় বেশি
৬. আগ আলা যে পতে, পাছ আলা সেই পতে
৭. আড়ে নেই তার ফোঁড়ে আছে
৮. আন্দার আশায় থাই, আর বান্দার আশায় ছাই

**‘উ’**

৯. উম্পি মানুষ, চোহিদারি বুজিনে

**‘এ’**

১০. এক পয়সা নেই থলিতে, লাফদে পড়ে গলিতে
১. একটার মুখ সোনা দিয়ে ভরানো যায়, পাঁচটার মুখ ছাই দিয়েও ভরানো যায় না
১১. এই মানুষ বনে গেলে বনমানুষ হয়

**‘ক’**

১২. ‘ক’ কইলে কলিকাতা বুঝি, কেষ্টাকুরও বুঝি

১৩. কইলক্যাতায়ও গিলাম না, ভেরিগডও শিখলাম না
১৪. কার দৌলতে সিন্দুর পরো, ঠাহৰ চেনো না
১৫. কামার বুড়ো হোলি লুহাও শক্ত হয়ে যায়
১৬. কেনা চালির গুণা ভাত, কম পড়লি যাবে জাত
১৭. কেনা গরুর দাঁত ধইরা লাভ নাই
১৮. কোন কালে খাইছি দৈ, সেই কতা আজকে কই
১৯. কপালে থাকলি নুড়োয় গু বাইধা আসে
২০. কুভার প্যাটে ঘি সয় হয় না

**'ঞ্চ'**

২১. খাবো ডাইলদে ভাত, তাতে বিলেই তারাইতে যাবো কেন
২২. খাজনার চাইয়ে বাজনা বেশি
২৩. খাতি খাতি হাইগে দিয়া, খাওয়া বোলে কারে
২৪. খুঁটোর জোরে ম্যারা কোন্দে

**'গ'**

২৫. গায় গু মাখলিও যমে ছাড়ে না
২৬. গালে আলো চাইল, জবাব দিমু কেমনে
২৭. গাই বাছুর ঠিক থাকলি আন্দারেও দুয়ানো যায়
২৮. গরু বেচে জরু কিনে না
২৯. গিন্নি হেইতি গেলি চুন্নী হইতি হয়
৩০. গুড় যত দিবা ততই মিষ্টি লাগবে, আর মিষ্টি গুড় হোলি আন্দারে খালি ও মিটে লাগে

**'ঞ্চ'**

৩১. ঘোনো কথা যার, চুপো আম তার
৩২. ঘোম নেই ঝুগীর আর ঘোম নেই সুগীর
৩৩. ঘোম মানেনা শ্যাশানঘাট, প্রেম মানেনা জাত বেজাত
৩৪. ঘুরো পুরোয় খাওয়া

'চ'

৩৫. চার বেদ চতুঃশাস্ত্র, তার পর ঠ্যাংগাই অন্ত
৩৬. চাইর আইল উঁচো, যদি নিচে, ধীরে ফ্যালে পাও/যার মা ভালো তার ছা  
ভালো, বাওরে মাঝি বাও
৩৭. চুল পাকিছে বাইতি, বুড়ো হইছি কি তাইতি

'ছ'

৩৮. ছোট সাপের বড় বিষ, ধানীঝালে জিভেয় শীষ
৩৯. ছোট থাকতি মারলাম না মরবে বলে/বড় হলি মারলাম না মারবে বলে

'জ'

৪০. জামোই এমনি আসলিই খুশি/তার উপর আইছে দুড়ে তাল হাতে করে
৪১. জুরে করে কি, মারে যে পিলেইতি
৪২. জামোই আসবে নেবে যি, জামাইর রাগে পাবে কি
৪৩. জোন-জামাই-ভাগনা, তিন নয় আপনা

'ঝ'

৪৪. ঠেলাঠেলির ঘর, খুদায় রক্ষা কর
৪৫. ঠ্যালায় পড়লি ছুঁচোয় নামাজ পড়ে

'ত'

৪৬. তাল গাছের আড়াই হাত

'দ'

৪৭. দাওয়ালের খোড়ে আবার ত্যাচ পাতা
৪৮. দোদেল বান্দা না পায় বেহেশত, না পায় দোজখ
৪৯. দূরির নলার চাইয়ে কাছের ফুটি ভালো

'ধ'

৫০. ধাইনো হাটায় ওল নামানো  
 ৫১. ধারেও না ধারায়ও না

'ন'

৫২. নসের মা খসে পলো  
 ৫৩. নায়েব মশাই কান মলোতো মলো, হাটের বেলা যায়  
 ৫৪. নিহাসের কূলি শিয়েল হয়ে গেছে  
 ৫৫. নিজের করে ভালো পরের যত পারো  
 ৫৬. নিজির ব্যালায় আটি-সাটি, পরের বেলায় চিমটি কাটি  
 ৫৭. নিঃকঁচ কচির উপোস ভালো  
 ৫৮. নেই কাজ বৈ ভাজ

'প'

৫৯. পুরুষ না পরশ; যে কামে লাগাবা সেই কামে সরস  
 ৬০. প্যাটে প্যাটে ঝিলাপীর পঁচ  
 ৬১. প্যাটে খালি পিঠি সয়  
 ৬২. প্যাটের গু হড়ুম হয়ে গেছে  
 ৬৩. পড়ে পাওয়া চৈদ্য আনা  
 ৬৪. প্যাটে ক্ষিদে চোখি লাজ, মনে ধরে না কোন কাজ  
 ৬৫. প্যাটে গু থাকলি ঝিলাপী বানায় হাগা যায়

'ফ'

৬৬. ফকিরির পায়ে লক্ষ্মী  
 ৬৭. ফাটা নাই পড়তি হোল নিয়ে টানাটানি

'ব'

৬৮. বড় ঘরামীর চালে ছোন থাহে না  
 ৬৯. বাঁশতলায় বিয়েলো গাই, সেই সম্পর্কে খালাতো ভাই

৭০. বাবা বলো, চাচা বলো; কলাড়া চার চার পয়সা
৭১. বাইটে মানসির প্যাটে প্যাটে শয়তানী
৭২. বাপেরেই বা কবো কি, মারে মারলো বাড়ি/আর মারেই বা কবো কি, বাপের ধরলো ধাড়ি
৭৩. বাদ্দররে লাই দিলি মাথায় ওটে
৭৪. বাপের গাতি নি ধাপের গাতি; বেচতি লাগে মোটে রাতি
৭৫. বেঁমে ভাউড়ার ভানাচি দেখলি গা জুলে

'ভ'

৭৬. ভরা প্যাটে বালিধারার বাড়ি
৭৭. ভদ্দরনোকে এমন পাইয়োও খায়, পান্তাভাতে দিলি সেতা ভাসতি ভাসতি যায়
৭৮. ভাইতি মাইরে গেলিও ফিরে চায়
৭৯. ভাগের ত্যাল কচায় মাখাবো
৮০. ভাড়ার নৌকোর দাড়া থাকলিই অলো

'ঝ'

৮১. মরুক গরু ফলুক ধান, বছর বছর কিনে আন
৮২. মরণের কতা চরণে কয়
৮৩. মরেও গ্যালো মাইরেও গ্যালো
৮৪. মাইরেও জেতপে, কাইনদেও জেতপে
৮৫. মাচার কুটুম ঠিক থাকলি সব কুটুম ঠিক থাহে
৮৬. মাচা নেই তার বুদবার
৮৭. মা কালী তুমি ঠাট্টাও বোজো না, মক্ষরাও বোজো না
৮৮. মাথায় উঠিছে বিষ, কিসির মদিয় কি দিস
৮৯. মামুও ছোট না, ভাগ্নেরও বয়স কম হয়নি
৯০. মানির মান আলায় রাহে/ বাপেরে হাটের মন্দি জুতো দিয়ে পিটেছে, আমারে ধরতি পারিনি
৯১. মান্দারের নায় সুন্দরীর গোলোই
৯২. মোছলমানের এক কতা, দিতি চাইছিলাম, দিলাম না

৯৩. মুই হিন্দু মানুষ, খুনের কী বুঝি

‘য’

৯৪. যত ছেলো নলবুনে সব হল কীস্তুনে
৯৫. যত হাসি তত কান্না, কয়ে গেছে রামসন্না
৯৬. যদি কলো চাচী, তয় আর কুতায় আছি
৯৭. যা অয়না বিয়ের রাতি, তা অয়না আশ্বিন-কাতি
৯৮. যার পাটা তার নুড়া, তার ভাঙবো দাঁতের গুড়া
৯৯. যাইয়ে থুয়ে থাহে যে, চৈদ্যপূষ্যির বড় সে
১০০. যারে দে ছাড়াবো ভূত, তারে ধরিছে ভূতি
১০১. যে খাইছে তার জন্যি রানদো, আর যে খাইনি তার জন্যি ভানো
১০২. যে চাচীর রানদা খাইনি, সে চাচী বড়ই ভালো রানদে
১০৩. যে যতখানি পানিতি নামবে তার ততখানি ভেজবে

‘র’

১০৪. রহয়ো-শুয়োর বছরে, পাটের জমি চষোরে

‘ল’

১০৫. লাক টাকা সিতেনে, আর কান ভাঙানী পোতেনে
১০৬. লাভের ধন পিংপড়েয় খায়

‘শ’

১০৭. শরম চাইয়ে মরণ ভালো
১০৮. শৃঙ্খল বাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিন দিন পরে বাঁটার বাড়ি
১০৯. শুধু কাজল পরিলেই হয়না, চাহিবারও চটক থাকা চাই

‘স’

১১০. সময় নাই গময় নাই, বাবু একখান হাফ-টিকিট দ্যাও
১১১. সাধা ভাত আর যাচা কল্যে ছাড়তি নেই

১১২. সগোলের হাত এড়ানো যায়, খুঁৎ খুতে নামের হাত এড়ানো যায় না  
 ১১৩. সর্বে বাড়ে ফুলি আর লতা বাড়ে শুলি  
 ১১৪. সোম-শুক্রি চাষ, বুদ-বিষ্ণুদি গৃহবাস  
 ১১৫. সুনা থুয়ে আঁচলে গিরে, সুনার আংটি ব্যাকা কিরে

**'ই'**

১১৬. হয় ঘরে যাও, নয় পড়া পানি খাও  
 ১১৭. হাতির মুখে দুরেো ঘাস  
 ১১৮. হাজার টাহায় বাওন ভিকারী, তিন টাহায় চাঁড়াল চৌধুরী, আৱ পাঁচ সিহায়  
 নাইড়ে ব্যাপারী  
 ১১৯. হাইগে ছোচেনা, মুতে গলা পান্তি যায়  
 ১২০. হাইতেৰে কাম করে, নাম হয় মদ্দেৱ  
 ১২১. হাগা নাড়িৰ মুখে টোনকো  
 ১২২. হাজার কতায় নেমনতন্ন, এক কতায় খাবো না

### তথ্যনির্দেশ

- ১ সুশীলকুমার দে, বাংলা প্রবাদ, এ মুখার্জি এন্ড কোং, কলকাতা, ঢয় সং, ১৩৯২, পৃ. ১৭
- ২ শশিমোহন চক্ৰবৰ্তী, শ্ৰীহঠীয় প্ৰবাদ প্ৰবচন: কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ক. ভূমিকা [উদ্ধৃতি  
 নন্দলাল শৰ্মা, চাকমা প্ৰবাদ, দিব্যপ্ৰকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২]
- ৩ ওয়াকিল আহমদ, লোককলা প্ৰবক্ষাবলি, গতিধাৰা, ঢাকা ২০০৫, পৃ. ১৩৬
- ৪ আবুল আহসান চৌধুরী, বাঙালিৰ লোকজ্ঞন সমাজতন্ত্ৰ ও প্ৰবাদ-প্ৰবচন, দৈনিক আমাৱ  
 দেশ, ঢাকা, ১৫ জুন ২০০৭

## লোকবিশ্বাস ও লোকসংক্রান্তি

বাংলাদেশের প্রায় সব মানুষের মনে ও আচরণে এক ধরনের বিশ্বাস ও সংক্রান্ত লক্ষ্য করা যায়। এই বিশ্বাসের বলয় ও সংক্রান্ত সীমানা বেশ বিস্তৃত। চারপাশের জীবজগৎ ও জড় জগতের অজস্র উপকরণ অনুষঙ্গ নিয়ে এই লোকবিশ্বাস ও সংক্রান্ত জগৎ গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এসব বিশ্বাস ও সংক্রান্ত রেওয়াজ বেশি প্রচলিত। মানুষের মনের দুর্বলতা থেকে এর জন্ম। মূলত মানুষের প্রতিদিনের অনিচ্ছিত জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যৎ এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার যে কামনা-বাসনা তা থেকেই লোকবিশ্বাস জনমানসে প্রোথিত হয়। লোকবিশ্বাস ও লোকসংক্রান্তি এক নয়। বিশ্বাস অনেক সময় পরিপূর্ণ রূপ নেওয়ার আগ্রহ মন থেকে দূর হয়ে যায়। কিন্তু বিশ্বাস যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে ক্রিয়াকাণ্ড ও আচরণাদির মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় সংক্রান্ত। লোকবিশ্বাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধ্যান ধারণা পোষণ করে। কিন্তু লোক-সংক্রান্তির ক্ষেত্রে এতে কিছু আচার অনুষ্ঠান যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন, শুভ কাজে রওয়ানা দিয়ে যাওয়ার পথে কেউ যদি হোঁচট খায় তখন ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে একটু বসে পরে নতুন করে যাত্রা করে। নতুন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হবে না বলে সে বিশ্বাস করে। এটাই সংক্রান্ত এসব বিশ্বাস ও সংক্রান্তের পেছনে প্রায়শ ধর্মীয় প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকে।

কয়েকটি নমুনা:

১. যদি ক্যাও গোস্ত খাইয়া পান গাছ থিক্যা পান ছিরে তাইলে হে গাছের বাঁচার কাম সারা।
২. একটা কুইমড়া যদি বার বছর ঘড়ে রাহা যায় ঐ কুইমড়া সুনা অয়।
৩. মাছ মারবার গ্যালে, যাত্রা কালে একটা ছনের ঘড়ের তিন কুনার কয় হাকটা ছোন এক নিয়াসে আইন্যা পলর তলে পুড়ান নাগে তাইলে বাল মাছ পাওয়া যায়।
৪. শকুনের মাথায় একটা উহুন আছে। বার তেন মাইল দূরেও যদি কেউই মরা গরু ফালাইয়া থয় তাও শকুন সে জাগায় যায়। তার মাথার ঐ উহুন কামুড় দ্যা তারে জানায় যে মাইনষে মরা গরু ফালাইয়া দিছে।
৫. পান খাইয়া ঘড়ের ডুয়ার কাচে পেকনী ফালাইলে হে বাঢ়ীর ক্ষেত্রি হয়।
৬. যহনে একজন পইল্যা মাছ মারবার যায় তহনে তার যাত্রাকালে একটা খাইট্যা ফেইক্স দিলে ঐ পইল্যা হেই খাইট্যার সুমান বড় মাছ পায়।
৭. যদি শকুন মরা গরু খাইয়া বেশিক্ষণ মাটিতে বইস্যা থাহে তাইলে গরুর বাওয়া আরু বাড়ে, আর যদি মরা গরু খাওয়া শ্যাম অইলে শকুন তারাতারি উইড়া গাছে যায় তয় বাল।
৮. গাই ফুইটলে মোনা আর বলদো ফুইটলে সোনা।

৯. যে মাছ মারে তারে ন্যাজা খাওয়ান নাগে ন্যাজা । তারে মাছের ন্যাজা খাওয়াইলে আর হে বেশি মাছ পায়না ।
১০. বগ শিকার কইরা ঘন ঘন বগের গোস্ত খাইলে শিকারী বগের মত শুইকিয়া যায় ।
১১. বিল্যাতী নাই ঘরে খুইয়া যদি কওয়া যায় বিল্যাতী নাই খামু তাইলে বিল্যাতী নাই পইচ্যা যায় ।
১২. ফ্যাচসের বাসার নিচে ছান থাহে কিন্তুক তা আনা ব্যাকর, কারণ ঐ ছান সাপে পহরা দ্যায় ।
১৩. নাকে মুকে বাত খইলে লক্ষী ভারাইয়া যায় ।
১৪. হোগুম যে গরে পড়ে হে গরে থাহা যায় না । হে গর হইয়া মরার বয় আচে ।
১৫. হোগুন যদি কোনো গরে বইস্যা মরে ঐ গরের চাইর্যা উইচ্যা কোনো জাগায় গাছে বসে তয় ঐ গর আলার সুংসার চ্যাতে আর যদি হোগুন ঐ গরের চাইর্যা নীচ্যা জাগা বা মটিতে বসে তাইলে হেই গর আলার সুংসার জেরবার অয় ।
১৬. আমাও দুয়া মাচায় উইটলে বরকত কুইম্যা যায় ।
১৭. মুরগি কোনো দিন বাগ দ্যায় না , যদি মুরগি কোনো দিন বাগ দ্যায় তাইলে, ঐ মুরগির প্যাট ফাইটলে একটা পাথর পাওয়া যায় সেই পাথর লুহায় ঘসা দিলে লুহা সুনা অয় ।
১৮. যদি ক্যাও গরুর কতা বুজে বা সাপের পও দ্যাহে তয় হে রাজা অয় ।

## লোকপ্রযুক্তি

ঐতিহাসিক যুগ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি হলো কৃষি। সে সূত্রে দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিও হলো কৃষিকাজ। কৃষিক্ষেত্রেই লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার বেশি হয়। কয়েকটির বিবরণ দেওয়া হলো:

### কৃষিপ্রযুক্তি

**লাঙল:** বাংলার সমতল ভূমিতে চাষের কাজে লাঙলের ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকে। কৃষকের ঘরে ঘরে প্রায় সর্বত্রই লাঙল আছে। একজোড়া গরু বা মহিষ দ্বারা লাঙল টানা হয়। অল্প বিশের কৃষক কাদা-মাটির ছোট ক্ষেতে নিজেরা লাঙল টেনে চাষের কাজ সম্পন্ন করে। শক্ত মাটি ও বড় বড় জমি চাষ করতে গরু ও মহিষের আবশ্যিক হয়। লাঙল কাঠ ও লোহার তৈরি একটি কাঠামো। পেশাজীবী ছুতার লাঙল তৈরি করে। লাঙলের ছয়টি অংশ-বাঁট বা মুঠা, হাতল, গাদা, খিল, ঝোঁক ও ফাল। মাটা আকৃতির চওড়া বিশিষ্ট কাঠ কেটে ও রান্ডা দিয়ে গাদা তৈরি করতে হয়। প্রধানত বাবলা গাছের কাঠ গাদা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কেননা এ গাছ থেকে লাঙলের উপযোগী ঝোঁক বাঁকা ডিজাইনের কাঠ পাওয়া যায়, বাবলা কাঠ খুব শক্তও হয়ে থাকে। গাদাই লাঙলের মূল কাঠামো, এর নিচের অংশে লোহার ধারালো ফলা শক্ত করে আঁটা হয়। উপরের অংশে হাতল ও মুঠা সংযুক্ত করা হয়। হাতল কাঠের অথবা বাঁশের হয়ে থাকে। গাদার মাঝামাঝি অংশ ছিদ্র করে ঝোঁক লাগানো হয়। এটিও কাঠের তৈরি। গাদার সঙ্গে খিল দিয়ে এঁটে মজবুত করা হয়। ঝোঁশের সঙ্গে জোয়াল বেঁধে গরু দিয়ে টানানো হয়। এজন্য জোয়াল লাঙলের অভিন্ন অংশ না হলেও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলা দিয়ে মাটি কর্ষণ করা হয়। এটি ৭০-৭৫ ডিগ্রির মতো বাঁকা গাদার অগ্রভাগে লাগানো হয়, যাতে ফলা ত্বরিকভাবে মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। বীজ বপনের উপযোগী করার জন্য জমির উপরের স্তর ভেঙে আলগা করাই চাষের মূল উদ্দেশ্য। একজন দক্ষ ছুতার একটি লাঙল তৈরি করতে দুই-তিন দিন ব্যয় করেন।

**মই:** জমি চাষের কাজে লাঙলের পরেই মইয়ের স্থান। লাঙল দিয়ে মাটি আলগা করার পর ছোট-বড় তেলাগুলিকে ভেঙে গুঁড়ো ও নরম করার এবং ভূমির উপরিভাগ সমতল করার জন্য মই দিতে হয়। প্রযুক্তির দিক থেকে মই তৈরি করা সহজ। প্রায় তিন গজ লম্বা একটি বাঁশ সমান দুই ফালি করে ফেড়ে চেঁচে মসৃণ করা হয়। বাঁশের দুই মাথায় গিট রাখা হয়, যাতে ফালি দুটি ফেটে না যায়। ফালি দুটি পাশাপাশি রেখে বাঁশের খিল দিয়ে সমান মাপের চার-পাঁচটি খোপ করা হয়। খোপগুলি চতুর্ভূজ আকৃতির হয়ে থাকে। মইয়ের দুই প্রান্তের সঙ্গে জোয়ালের দুই পাশ দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। লাঙলের মতো মইও গরু বা মহিষে টানে। কৃষক মইয়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গরু তাড়ান। তার দেহভারেই চাষের টিল ভেঙে গুঁড়ো হয়। বড় ক্ষেতের জন্য প্রায় দিশুণ আকারের মই আছে; দুই জোড়া বলদে তা টানে। মইয়ের আঞ্চলিক নাম ‘চকম’।

একজন দক্ষ ছুতার এক বেলার শ্রম দিয়ে একটি প্রমাণ সাইজের মই তৈরি করতে পারে। এর নির্মাণ-কৌশল এতই সরল যে, অনেক কৃষক নিজের মই নিজেই তৈরি করে থাকেন।

**ঠুসি:** বাঁশের বেতি অথবা পাটের দড়ি দিয়ে তৈরি গরু-মহিষের মুখের আবরণী ‘টোনা’। বুনন প্রক্রিয়ায় ফাঁস দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। চাষাবাদের ও ধান-রবিশস্য মাড়াইয়ের সময় গরু-মহিষের মুখে এরূপ টোনা পরিয়ে দেওয়া হয়। এতে তারা ফসল খেতে বা নষ্ট করতে পারে না।

**মুগুর:** কৃষক ক্ষেত্রের মাটির ঢেলা চূর্ণ করার জন্য মুগুর ব্যবহার করে। চৌকোণা আকৃতির এক খণ্ড কাঠের মাঝখান ছিদ্র করে ৩ ফুট লম্বা বাঁশের একটি দণ্ড শক্ত করে এঁটে মুগুর তৈরি করা হয়। দুই হাতে ধরে উপরে তুলে সজোরে আঘাত করলে ঢেলা চূর্ণ হয়। কাঠমিঞ্চি মুগুর তৈরি করে থাকে।

**কোদাল:** পুরুর, ঘর-দোর, রাস্তা-ঘাট নির্মাণে মাটি কাটার কাজে কোদাল ব্যবহৃত হয়। এমন কি, ছেটখাটো ক্ষেত্র লাঙলের বিকল্প হিসেবে কোদাল দিয়ে কেটে আলগা করা হয়। চারকোনা লোহার একটি পেটটির সামনের দিক ধারালো থাকে; পেছন দিকের মাঝামাঝি স্থানে একটি গোলাকার ছিদ্র রাখা হয়। এই ছিদ্র দিয়ে ৩ ফুট লম্বা একটি বাঁশের দণ্ড সংযুক্ত করে কোদাল তৈরি করা হয়। দণ্ডটি দুই হাতে ধরে উপর থেকে নিচে সজোরে কোপ দিয়ে মাটি কাটার কাজ করা হয়। স্থানীয় কামার কোদালের পেট তৈরি করে।

**কুড়াল:** গাছ ও ডালপালা কাটা ও ফাড়ার কাজে ব্যবহৃত লোহা-নির্মিত অস্ত্র। একটি লোহার ফলা ও বাঁশ-কাঠের একটি দণ্ড কুড়াল তৈরির উপকরণ। স্থানীয় কামার লোহা পিটিয়ে কুড়ালের ফলা তৈরি করে। এর সামনের ভাগ পাতলা ও ধারালো, পেছনের ভাগ বেশ পুরু হয়, কোনো ধার থাকে না। এখানে একটি গোলাকার ছিদ্র করে আড়াই-তিনি ফুট লম্বা বাঁশের অথবা কাঠের একটি দণ্ড লাগানো হয়। এটি গৃহস্থ নিজেই লাগিয়ে থাকে। সকল শ্রেণীর গৃহস্থ সংসারের টুকিটাকি কাজে কুঠার ব্যবহার করে থাকে। তবে কুড়াল প্রধানত পেশাদার কাঠুরিয়ার অস্ত্র। সে গাছ কাটার ও ফাড়ার কাজ করে। কুঠার একটি অতি প্রাচীন হাতিয়ার। কুড়ালের অগ্রভাগ অধিক ধারালো করার জন্য ইস্পাত ব্যবহার করা হয়।

**মাথাল:** সাধারণ কৃষক ও শ্রমিক কৃষিকাজে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথার আবরণ হিসেবে মাথাল বা মাঠেল ব্যবহার করে। এর আঞ্চলিক নাম ‘টোকা’। বাঁশের সরু বেতি দিয়ে বুনন প্রক্রিয়ায় মাথাল তৈরি করা হয়। এর গঠন কচু পাতার মতো ঢালু ও গোলাকার। উপরের কেন্দ্র থেকে নিচের দিকে সম্প্রসারিত করে তা বুনা হয়। প্রান্তভাগ বাঁশের মেটা চাকতি দিয়ে মোড়া হয় যাতে বুনন খুলে না যায়। মজবুত করার জন্য ভেতরেও একাধিক সরু গোল চাকতি ব্যবহার করা হয়। কোথাও পাটির মতো, কোথাও ক্রস পেন্ডেটির বুনন প্রচলিত আছে। অধিকাংশ গৃহস্থ স্বজন-পরিজনের কাছ থেকে শিখে নিজেরাই তৈরি করে থাকে। মাথাল হাট-বাজারেও বিক্রি হয়।

**চালুন:** চালুন আর একটি প্রযুক্তি যার সাহায্যে শস্যদানা থেকে খড়কুটা বা ধূলাবালি পৃথক করা হয়। চাল-গমের আটা ও চেলে খসা থেকে পৃথক করা হয়। আটা চালার চালুন চামড়ার তৈরি, আকারে ছোট। শস্যদান চালার চালুন আকারে বড়, বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি। বলা বাহল্য, চালুনের তলদেশ পুরোটা ছিন্নযুক্ত হয়। কুলায় কোনো ছিন্ন থাকে না। চালুন আকারে গোলাকার, কুলা আয়তাকার। কুলার অনুরূপ বুনন প্রক্রিয়ায় তা তৈরি করা হয়। চালুনের কানা তুলে বাঁশের চ্যাপ্টা বাতা দিয়ে মুড়িয়ে বেত, দড়ি বা তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। চালুন দুই হাতে মুঠ করে ধরে ঝাঁকা দিয়ে নাড়াচাড়া করে আটা-ময়দা ও শস্যদানা চালা হয়। খাদ্যাভ্যাস ও রশ্চি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এ ধরনের প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছে।

**ঢেকি:** ঢেকি গৃহস্থালি কাজের অত্যাবশ্যক একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে ধানের খসা বা তুষ ছাঁড়িয়ে চাল প্রস্তুত করা হয়। একে অঞ্চল-বিশেষে ‘ধান কুটা’, ‘ধান ভানা’, ‘বারা ভানা’ ইত্যাদি বলে। ঢেকির সাহায্যে ঢিড়া কুটা ও হলুদ গুঁড়া করা হয়। ধান ভানা বাংলার বহুল ও ব্যাপক প্রচলিত একটি লোক-প্রযুক্তি। ভাত প্রধান খাদ্য হওয়ায় এদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে ধানের চাষ হয়ে আসছে। ধান ছেঁটে চাল প্রস্তুত-প্রক্রিয়াও বহু প্রাচীন থেকে চেলে আসছে। হিন্দুপুরাণে ঢেকি হলো নারদ মুনির বাহন। নারদ হলেন শিবের সহচর। ঢেকি দেশী শব্দ; মুণ্ডা ‘ডিকি’ থেকে আগত। বাংলা প্রবাদ আছে—‘ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে’। এমনই দুর্ভাগ্য যে, স্বর্গে গিয়েও ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। ‘ঢেকি-ছাঁটা চালে’র খাদ্যাণুণ বেশী, বৈজ্ঞানিকভাবেও তা প্রমাণিত। সম্পূর্ণ গৃহস্থ-পরিবারে আলাদা ‘ঢেকিঘর’ বা ‘ঢেকিশালা’ আছে। বাংলা লোককাহিনির নায়ক-নায়িকা রাগ করে ঢেকিঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে, এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে ‘ঢেকিপূজা’র প্রচলন আছে। বিশেষত বিবাহ উপলক্ষে ধান ভানার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে তেল-সিঁদুর দিয়ে ঢেকিপূজা করা হয়।

**ঘানি:** ঘানি সরিষা, তিল, তিসি, গুজি ইত্যাদি শস্যবীজ থেকে তেল তৈরি করার এক প্রকার কাঠের যন্ত্র। কলের সাহায্যে তেল প্রস্তুত করার আগে এদেশে ঘানি ছিল একমাত্র যন্ত্র, যা যুগ যুগ ধরে তেল প্রস্তুত করে মানুষের চাহিদা মিটিয়েছে। এমন কি, কল আসার পরও মানুষ খাঁটিত্ব ও স্বাদের জন্য ‘কলের তেল’ অপেক্ষা ‘ঘানির তেল’ বেশি পছন্দ করে থাকে। তবে বাস্তবতা এই যে, আধুনিক যন্ত্রের প্রভাবের কাছে মানুষ ক্রমশ নতি স্থীকার করেছে। ঘানির ব্যবহার কমতে কমতে বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। এক সময় এমন কোনো বর্ধিষ্ঠ গ্রাম ছিল না, যেখানে দু-এক ঘর কলু বসবাস করত না। কলু এক শ্রেণীর পেশাজীবী সম্প্রদায়, যারা বৎশানুক্রমে ঘানির সাহায্যে তেল তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করত। মূল গৃহ-সংলগ্ন একটি একচালা ঘরের মধ্যে ঘানি পাতা আছে। ঘানির দণ্ডের সঙ্গে চোখে টুলি বাঁধা একটি বলদ ঘুরপাক থাকেছে, একটি বালক দণ্ডের উপর বসে গরু তাড়াচে, ক্রান্তি দূর করার জন্য হয়তো সে গান করছে-কলুবড়ির এটি একটি সাধারণ দৰ্শ্য। বাংলা প্রবাদ আছে: ‘কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানি গাছে শুয়ে। কলুর বলদ ঘানি টানে চোখে টুলি দিয়ে।’ অতি ক্ষুদ্র দানা সরিষা থেকে ফেঁটায় ফেঁটায় তেল করা শ্রমসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। শ্রমের

প্রধান চাপটা পড়ে কলুর বলদের উপর। সম্ভবত রামপ্রসাদ সেন এ কারণেই গানের ভাষায় বলেন: ‘মা আমায় ঘুরাবি কত/কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত’।

**পলই:** পলই খাচা জাতীয় এক প্রকার মাছ ধরার যন্ত্র। আঞ্চলিক উচ্চারণে তা পোলো, পলুই ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এর উপরের দিকটা গোলাকার সরু মুখ; নিচের দিকটা ক্রমশ স্ফীত হয়ে গোল চাকতির আকার ধারণ করে। মুখ ও তলা উভয় অংশ খোলা থাকে। পলই তৈরি করার উপকরণ বাঁশের সরু কাঠি, পাতলা টটা, বেত, দড়ি বা তার। এটি নির্মাণ করতে দা, ছুরি ইত্যাদি হাতিয়ার লাগে। প্রথমে দা দিয়ে পলইয়ের উচ্চতা অনুযায়ী বাঁশ কেটে ফালি ফালি করা হয়। ফালিগুলি চিরে সরু কাঠি বানানো হয়। এগুলো ছুরি দিয়ে চেঁচে গোড়া চ্যাপটা, আর আগা গোল করা হয়। পলইয়ের দেহের বিভিন্ন স্থানের বেড় অনুযায়ী মোটা কাঠি দিয়ে ৭-৮টি চাকা তৈরি করা হয়। ‘চটা’ নামে নিচের চাকার পরিধি বেশি, উপরের চাকার পরিধি ক্রমশ ছোট হয়; গলার পরিধি সবচেয়ে ছোট। চাকাগুলি পলইয়ের কাঠিগুলির সঙ্গে দড়ি বা তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়। পলইয়ের মুখের কাঠিগুলির আগা সমান করে কেটে বেত, চামড়া বা সাইকেলের টায়ার দিয়ে মুড়িয়ে বাঁধা হয় এতে পলইটি মজবুত হয়, পলই ধরাও আরামদায়ক হয়। একটি পূর্ণসং ব্যবহারযোগ্য পলই তৈরি করতে ৩-৫ দিন সময় লাগে।

**চাঁই:** মাছ ধরার উপকরণ বিশেষ। বাঁশের সরু শলাকা সুতা দিয়ে বেঁধে এটি তৈরি করা হয়। এটি এমন কৌশলে নির্মিত হয় যে, এর ভেতরে মাছ প্রবেশ করে, কিন্তু বের হতে পারে না। চাঁইয়ের মাঝ অংশ দ্বিতৃত ফাঁপা এবং সম্মুখ ভাগ কিঞ্চিৎ চাপা থাকে। মাছ ঢোকার ও আটকানোর জন্য একটি মুখ বা ‘বানা’, মাঝ অংশে অপর একটি বানা এবং শেষ অংশে ‘চান্দা’ থাকে। চান্দা দিয়ে মাছ বের করা হয়। চাঁইয়ের আধাৰ হিসেবে শামুক, কুড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত হাঁটু পানিতে স্রোতের মুখে এটি রেখে মাছ ধরা হয়। রাজশাহীতে একে ‘বিস্তি’ বলে।

**উচা:** বাঁশের তৈরি শলাকা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র-বিশেষ। এটি ক্ষেত্রে আইলে পানি প্রবাহের স্থানে পেতে রাখা হয়। সারা রাত এতে মাছ আটকা পড়ে। সকালে তা সংগ্রহ করা হয়।

**খেয়াজাল:** খেয়াজাল বা ঝাঁকিজাল সবচেয়ে জনপ্রিয়। আশেপাশে নদী, নালা, জলাশয়, বিল, হাওর, দিঘী এমন কি পুরুর আছে, এমন গ্রামবাসীর দু-চার ঘরে নিজের হাতে বোনা ঝাঁকিজাল আছে। কাজের ফাঁকে অবসর পেলেই কাঁধে ঝাঁকিজাল নিয়ে বেরিয়ে যায় এবং অল্ল-স্বল্প যা কিছু পায়, তাই রান্না করে পরিবার নিয়ে খায়। জাল বোনার প্রধান কৌশল হলো সুতার ফাঁস। বুনন কৌশলে ফাঁস ছোট-বড় করে ডিজাইন অনুযায়ী জাল তৈরি করে। খেয়াজালের নিচের অংশ প্রশস্ত এবং গোলাকার। পুরো প্রান্ত জুড়ে লোহার ছোট ছোট গুটি বা বল আটকানো থাকে। উপরের অংশ ক্রমশ ছোট হয়ে একটি একক ফাঁসে এসে শেষ হয়। উপরের এ প্রান্তে লম্বা দড়ি বাঁধা হয়। জেলে অথবা শৌখিন মৎস্য শিকারী ডাঙায় থেকে বিশেষ কৌশলে যখন জালটি পানিতে নিষ্কেপ করে, তখন এই দড়ি তার মুঠিতে বাঁধা থাকে। জাল ছাতার মতো গোলাকারে

ছাড়িয়ে পানিতে পড়ে; লোহার গুটির ভারের কারণে তা দ্রুত ঝুবে মাটি স্পর্শ করে। সামান্য সময় নিয়ে রশি ধরে আস্তে আস্তে টান দিয়ে জাল ডাঙায় তোলা হয়। জালের ঘেরের মধ্যে যেসব মাছ আটকা পড়ে, সেসব মাছ উঠে আসে। ছোট, মাঝারি সব ধরণের মাছ খেয়াজাল দিয়ে শিকার করা হয়। অঞ্চলভেদে এর ‘ভূরিজাল’, ‘কনুইজাল’ ইত্যাদি নাম প্রচলিত আছে। জালের কিছু অংশ এক হাতের কনুইতে রেখে কিছু অংশ অপর হাতে ভাঁজ করে ধরে পানিতে সজোরে নিষ্কেপ করা হয়। এজন্য কনুইজাল নামকরণ হয়েছে।

**ফাঁসজাল:** ফাঁসজালের দৈর্ঘ্য ১০-১২ ফুট, প্রস্থ ৩ ফুট। দুই বাঁশের শলাকা দিয়ে বাঁধা হয়। লম্বাটে এই জাল সাধারণত ধান ক্ষেত্রে আইলে ঝুলন্ত অবস্থায় পেতে রাখা হয়। কৈ, তেদা, বেলে প্রভৃতি মাছ লাফ দিয়ে আইল পার হতে গিয়ে জালে আটকা রপড়ে।

**বেড়জাল:** এর অপর নাম ‘বাদাইজাল’। বড় পুরু, দিঘী বা জলাশয় বেড় দিয়ে মাছ ধরা হয় বলে এরপ জালের নাম বেড়জাল। বরা বাহল্য, তা বিশালাকৃতির হয়ে থাকে। জালের দুই পাণ্তে থেকে দুই দল লোক জাল টেনে একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে মিলিত হয়। জালের মাঝের অংশ পানির উপর-অংশ বরাবর যাতে ভেস থাকে, তার জন্য জালের সঙ্গে শুকনা কাঠ বা শোলা লাগানো হয়। পানির বৃহৎ অংশ জুড়ে বেড় দেওয়া হয় বলে একটি টানে অনেক মাছ ধরা পড়ে।

**ইলিশজাল:** নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি ইলিশ মাছ ধরার জাল। ইলিশ নদীর অথবা সমুদ্রের মোহনার মাছ। কারেন্ট জাল দিয়ে ইলিশ মাছ ধরা হয়। আবার এতিহ্যবাহী ছোট ছোট জাল দিয়েও তা ধরা হয়। এরপ জালের আকার ১৫-২০ ফুট লম্বা এবং ৬-৭ ফুট প্রস্থ হয়ে থাকে। এটি বাঁশের দুই প্রাণ্তে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। জেলে জালটি পানির নিচে দুবিয়ে রশি ধরে বসে থাকে। মাছ জালে আটকা পড়লে জেলে হাতের টানে টের পেয়ে তান্ত্রিক উপরে টেনে তোলে। মাছ ছাড়িয়ে নিয়ে আবার জাল পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। এভাবে দিনভর ইলিশ মাছ শিকারের পালা চলে। এরপ জালে কেবল ইলিশ মাছই ধরা পড়ে।

**কোঁচ:** বাঁশের তৈরি সড়কি জাতীয় মাছ ধরার যন্ত্র। তল্লা বাঁশ কেটে কোঁচের দণ্ড তৈরি করা হয়। এর এক প্রাণ্ত কেড়ে ছোট ছোট শলাকা বনিয়ে সেগুলোর অগ্রভাগে ছুঁচালো লোহার টোপর পরিয়ে দেওয়া হয়। ধানক্ষেতে অথবা স্বচ্ছ জলাশয়ে যেখানে মাছ চলাচল করতে দেখা যায়, শিকারী সেখানে অতি সন্তোষণে দাঁড়িয়ে কোঁচ নিষ্কেপ করে মাছ বিন্দু করে। নদীর স্রোতে উড়াল জাতীয় মাছ ভেসে বেড়ায়, দক্ষ শিকারী কোঁচ নিষ্কেপ করে সেসব মাছও শিকার করে থাকে। কোঁচ সজোরে নিষ্কেপ করে বলে মাছের দেহ এফোড়-ওফোড় হয়ে শলাকাবিন্দু হয়। টাঙ্গাইলে এটি ‘অলেসা’ (<অলঝ্য, সং: অবর্থ) নামে পরিচিত।

**জুঁতি:** জুঁতি বা খৌচার গঠন কোঁচের অনুরূপ, তবে এতে বাঁশের শলাকার অগ্রভাগের লোহার যে টোপর পরানো হয়, তার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন। এগুলির মাথার

অংশ বঁড়শির মতো সামান্য বাঁকানো থকে। ঝাঁটার মতো করে গুচ্ছবন্ধ করে একটি দণ্ডের এক প্রান্তে শক্ত করে বাঁধা হয়। এটিও নিষ্কেপ করে মাছ শিকার করতে হয়।

**টেটা:** টেটা কোঁচের অনুরূপ পানিতে নিষ্কেপযোগ্য মাছ ধরার যন্ত্র। এতে তিনটি শলাকা থাকে। টেটার অগ্রভাগ বঁড়শির মতো বাঁকা থাকে; একবার বিন্দ হলে মুক্ত হওয়া যায় না। গ্রামে ঝগড়া-বিবাদে এটি মারাত্মক অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

**আঁকড়া:** আঁকড়া খুবই সরল প্রকৃতির যন্ত্র। বঁড়শির অনুরূপ একটি লোহার বাঁকানো ও তীক্ষ্ণ খণ্ড বংশদণ্ডের এক প্রান্তে বেঁধে আঁকড়া তৈরি করা হয়। আঁকড়া কাদার মধ্যে এদিক-ওদিক টান দিয়ে কাদায় লুকিয়ে থাকা মাছ ধরা হয়। মাওর, শিং, টাকি, বাম মাছ আঁকড়ায় গেঁথে ধরা হয়।

**গরুর গাড়ি:** গরুর গাড়ির প্রধান অংশ চারটি- চাকা, চালি, ধুরি ও জোয়াল। সোয়ারি বহনের জন্য গরু গাড়িতে একটি অতিরিক্ত অংশ 'ছই' যুক্ত করা হয়। জোয়াল বাঁশ ও কাঠ উভয় দ্বারা নির্মাণ করা হয়। গরুর ঘাড়ে জোয়াল বসিয়ে গাড়ি চালানো হয়। গাড়ির লম্বা ফড়টি তৈরি হয় বাঁশের খণ্ড ও চটা দিয়ে। ফড়ের উপর মালপত্র রেখে বহন করা হয়। মানুষও ফড়ের উপর বসে। কাঠের তৈরি চাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর নির্মাণ-পদ্ধতি অধিক প্রযুক্তি-নির্ভর ও সময়-সাপেক্ষ। সাধারণ ছুতার চাকা তৈরি করতে পারে না। এরজন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর কাঠমিঞ্চি আছে। চাপাই নবাবগঞ্জে এদের 'পাঁয়াইহা মিঞ্চি' অর্থাৎ চাকা-মিঞ্চি বলে। তারা চাকা ছাড়া সাধারণত অন্য কিছু তৈরি করে না। এটাই তাদের জাত-পেশা। তারা ধর্মে মুসলমান।

**চুন প্রস্তুত প্রণালী:** যারা বিনুক থেকে চুন প্রস্তুত করে, তারা 'চুনারি' নামে পরিচিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন বর্ণের লোক বংশানুক্রমে এ পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। চুনারি হাতিয়ার হিসেবে ঢাকি, কুলি, পাতিল, শৌনা ও চুলা ব্যবহার করে। স্থানীয় নদী, খাল-বিল বা অন্য জলাশয় থেকে বিনুক কুড়িয়ে এনে প্রথমে ধোওয়া-মোছা করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর খড়ির চুলায় পুড়িয়ে নিয়ে বিনুকের চূর্ণগুলো পানি-ভর্তি একটি মাটির গর্তে রাখা হয়। এ সময় প্রচণ্ড গ্যাস উঠে। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিনুকচূর্ণ গলে চুনে পরিণত হয়। এরপর রোদে শুকিয়ে নিলে তা ব্যবহারোপযোগী হয়। চুন পান, খয়ের ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। দিনে-রাতে আহারের পর পান খাওয়ার প্রথা আছে। ধূমপানের মতো পান খাওয়া অনেকের নেশা। এদিক থেকে চুনের চাহিদা বেশ ব্যাপক। তামাকের সঙ্গে চুন মিশিয়ে 'খনি' (তু. খইনি, হিন্দি) তৈরি করে সেবন করাও এক প্রকার নেশা।

### পাটজাত প্রযুক্তি

সংস্কৃত শব্দ 'পট্ট' থেকে পাট। পাট বাংলাদেশে 'সোনালী আঁশ নামে খ্যাত'। পাটগাছের বহিরাবরণ বা ছালকে 'পাট' বলা হয়। পাট এক প্রকার তন্ত্র যা থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। পাট গাছের ছাল তুলে নেয়ার পর ডঁটাসহ যে শকনো গাছ অবশিষ্ট থাকে তাকে 'পাটখড়ি', 'পাটকাঠি' ইত্যাদি বলা হয়। জমিতে থাকা অবস্থায় এমনকি আঁশ ছাড়াবার আগ পর্যন্ত পুরোগাছটাকে 'পাট' বলা হয়ে

থাকে। পাটগাছ সাধারণত পাঁচ থেকে বারো ফুট লম্বা হয়ে থাকে। কখনও কখনও পাট ২১ ফুট লম্বা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সর্বজ্ঞই পাটের ব্যবহার ব্যাপক। পাটের ব্যবহার প্রধানত তিনি পর্যায়ে লক্ষ করা যায়। প্রথমত পাটশাক (বা পাটপাতা); দ্বিতীয়ত পাটকাঠি; তৃতীয়ত পাটের আঁশ (পাট)।

### (ক) পাট পাতার ব্যবহার

(১) পাটগাছ চারা অবস্থায় থাকাকালীন ক্ষেতে নিড়ানিদিয়ে আগাছা সরিয়ে ফেলা হয়। ভালোভাবে আলোবাতাস পাওয়ার সুবিধার্থে চারা গাছের ঘনত্ব কমাতে মাঝে মাঝে কিছু কিছু চারাগাছ তুলে ফেলা হয়। আগাছা বা ঘাসগুলো গরু-ছাগলের খোরাক হয় এবং চারা পাটগাছগুলো মুঠি মুঠি আঁটি বেঁধে হাট-বাজারে এমনকি ফেরি করে শহর-বন্দরে বাসা-বাড়িতে নিয়ে মানুষের খাদ্য শাক হিসেবে বিক্রয় করা হয়। ইহা একটি সুসাদু শাক। দু'ধরনের পাটশাক রয়েছে। একটি তেঁতো ও অপরটি মিষ্টিসাদ যুক্ত। বাজারে উভয় পাটশাকেই যথেষ্ট কদর রয়েছে। উভয় শাকই পুষ্টিশুণ সম্পন্ন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাঁচা পাটপাতা শাক হিসেবে রাখা করে খাওয়া হয়। এ ছাড়া পাটগাছ বড় হয়ে গেলেও ক্ষেত থেকে কচি পাতা বেছে বেছে তুলে আনা হয় শাক হিসেবে খাওয়ার জন্য।

(২) কাঁচা পাটপাতা (কচি হলে ভালো হয়) চালের গুঁড়ো, আটা বা ময়দার মধ্যের সঙ্গে পরিমাণ মতো মেখে বড়া (বড়ি) করে তেলে বা ঘিয়ে ভেজে খাওয়া হয়। এসব বড়া মচমচা করে শুধু ভাতের সঙ্গে খাওয়া বড় মজাদার।

(৩) পাটের শাক ডালের সাথে, মাছের সঙ্গে অথবা অন্যান্য তরিতরকারির সঙ্গে রেঁধেও খাওয়া হয়ে থাকে। পাটশাক খুবই পুষ্টিকর। এতে খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যারোটিন, ক্যালশিয়াম, লৌহ, সি-ভিটামিন রয়েছে।

(৪) অনেক স্থানে দেখা যায়, হিন্দু মহলে বিশেষ করে গৃহস্থের বাড়ি আশ্বিনী ও চৈত্র সংক্রান্তির পর্ব দিবসে সকালের দিকে স্নানাদি সেরে পূর্বরাতে জলে ভিজিয়ে রাখা চালভাজিও তেঁতো (শুকনো) পাটপাতা, আঁখিগুড় ও কাঁচা হলুদের টুকরার সঙ্গে কিছুটা তেঁতো জলসহ খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

(৫) কোনো কোনো এলাকায় হিন্দু ঘরের কেউ মারা গেলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তিরা স্নান সেরে এলে প্রথমে তাদেরকে দু'এক ঘণ্টা পূর্বে ভিজানো শুকনো তেঁতো পাটপাতার জল একটু করে পান করানো হয়।

(৬) নতুন গৃহ নির্মাণের শুরুতে 'নিশান খাম' পঁতা হয়, যার মাথায় একটি মাটির বা পিতলের ঘটে যৎকিঞ্চিত সোনা-রূপা; ধান, দূর্বা, ঢটি/৫টি তেতো শুকনো পাটপাতা রেখে শালু কাপড়ের টুকরা বা ছোট লাল গামছা (পাইয়া গামছা) দিয়ে মুখ বেঁধে বিশেষত পাটের আঁশের রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ প্রথাটি হিন্দু পরিবারে ব্যাপক প্রচলিত। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়। এদের বিশ্বাস-এসব গৃহে বসবাসকারীদের গহনা-গাঁটি, খাদ্যশস্যের অভাব হয় না এবং দূর্বার মতো আয়ুর্বান থাকবে এবং সংসারে তিক্ত অবস্থা সৃষ্টি হবে না।

(৭) অনেকস্থানে হিন্দু গেরহ্রের বাড়ি ও কোনো কোনো হিন্দু দোকানে বিশেষ করে শারদীয় দুর্গাপূজার শৈষদিকে দশমী তিথিতে এবং পহেলা বৈশাখ বিশেষ করে হিন্দু-দোকানে এমন কি কারো কারো বাড়িতে ‘যাত্রাসাজানো’ বা ‘যাত্রাপাতা’ হয়। একটি পিংড়ি, জলচোকি বা অঙ্গুয়া একটি বেদীকে নতুন একটি গামছা বা নতুন কাপড় বা কাপড়ের পরিচ্ছন্ন টুকরা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এর উপর লক্ষ্মী-গণেশের মূর্তি বা ছবি বসানো হয়। কেউ কেউ এসব না বসিয়ে শুধু ফুল ইত্যাদি দিয়ে আসন সাজিয়ে নেয়। লক্ষ্মী-গণেশের পার্শ্বে একটি ধাতুর তৈরি (বিশেষত পিতলের বা রূপার; বর্তমানে স্টীলের) কৌটায় সোনা-রূপা ও মূদ্রা (চচল বা সচল), ধান, দূর্বা, হরিতকী ইত্যাদির সঙ্গে কয়েকটি (৩/৫/৭-বিজোড় সংখ্যক) তেঁতো শুকনো পাটপাতা পুরে রাখা হয়। দোকানে এ ধরনের যাত্রাপাতা পর্বটি হালখাতা উপলক্ষে হিন্দু দোকানে অবশ্য করণীয়। এতে লক্ষ্মী-গণেশকে পুরোহিত এনে পূজাও করা হয়।

(৮) শারদীয় দুর্গাপূজার পরে অমাবশ্যক তিথিতে গভীর রাতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে দীপাবলী চলে। এ রাতে ভাই-ফেঁটা দেবার জন্য কালি তুলে রাখা হয়। দ্বিতীয়াতে অনুষ্ঠিত হয় বোন কর্তৃক ভাইয়ের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনার প্রথা ‘ভাত্তাদ্বিতীয়া’ বা ভাইফেঁটা। এ উপলক্ষে একটি পিতলের বাটায় (বর্তমানে পিতলের অভাবে স্টীলের বাটায়) প্রদীপ জ্বলে পার্শ্বে ধান, দূর্বা, ফুল, হরিতকী ও তেতো শুকনো পাতা সাজায়ে রাখা হয়। যমের মুখে তেঁতো দেয়ার লক্ষ্যে এই তেতো পাটপাতা-“ দ্বিতীয়াতে দিয়া ফেঁটা/ তৃতীয়াতে দিয়া নিতা/ যমের মুখে দিলাম তিতা/ আমি দিই আমার ভাইকে ফেঁটা।”

(৯) তেতো পাটপাতার ঔষধি গুণও রয়েছে। শুকনো তেঁতো পাটপাতা ভিজিয়ে তার জল খেলে পেটের পীড়া, কৃমি ইত্যাদি দূর হয়।

(১০) কাঁচা পাটপাতা জমিতে ঝরে পড়লে সেগুলো পচে, ঘাস ও পচায় এবং পাট কাটার পর গোড়া ও শিকড় পচে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকে।

(১১) দেশি পাটপাতার রস আমাশয়, জ্বর ও অম্ল-নাশক। তেঁতো পাটশাক বাত রোগিদের পক্ষে উপকারী।

(১২) কোনো কোনো অঞ্চলে শুকনো পাটপাতা রসুনসহ তেলে ভেজে ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়।

#### (৪) পাটকাঠির ব্যবহার

(১) বহু পূর্ব থেকেই পাটকাঠি বা পাটখড়ির ব্যাপক ব্যবহার দেশের সর্বত্রই রয়েছে। কোথাও কোথাও পাটখড়িকে আঞ্চলিক শব্দে ‘হংসাইল’ বা ‘হমরাইল’ বলা হয়। বর্তমানে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যাপক প্রচলনের ফলে শহরাঞ্চলে পাটকাঠির তেমন একটি ব্যবহার নেই। যে সমস্ত শহর-বন্দরে গ্যাসের সহজলভ্যতা নেই, কয়লা বা কাঠের উনানে রান্না-বান্নার কাজ চলে সে সব শহর-বন্দরে এবং গ্রামাঞ্চলে উনান (বা চুলায়) আগুন ধরাতে প্রথমেই কিছু না কিছু একটা জ্বালানি একই। (জ্বালানি ও জ্বালানি একই।

তবে সাধারণত লাকড়ি বা জ্বালানিকাঠে অথবা অন্য কোনো জ্বালানি যেমন গোবরের ঘুঁটে ইত্যাদিতে আগুন ধরাবার জন্য যে সব হালকা দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তাকে জ্বালানি বলা হয়।) জ্বালতি হিসেবে ধানগাছের শুকনো নাড়া বা খড়-কুটা, শুকনো পাতা, হালকা-পাতলা-চিকন চিকন শুকনো বাঁশের চটা বা কঞ্চি, অপ্রয়োজনীয় কাগজের টুকরা এবং পাটখড়ি বা হস্বাইল ব্যবহৃত হয়। জ্বালতি ও জ্বালানি হিসেবে পাটখড়ির ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিধাজনক।

(২) গ্রামাঞ্চলে একসময়ে রাতের অঙ্ককারে কোথাও যেতে হলে আলো পাবার জন্য লম্বালম্বা কিছু পাটকাঠি একত্র মুঠি করে তার মাথায় আগুন ধরায়ে চলে যেত গন্ত বেয়। হারিক্যান, ল্যাম্প (কুপি) প্রদীপ ইত্যাদি ও টর্চলাইটের প্রচলনের ফলে পাটকাঠি জ্বেলে আঁধার দূর করার পদ্ধতি বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে নেহাং প্রয়োজন হলে কেউ কেউ এ পদ্ধতিতে পাটকাঠির ব্যবহার করে থাকে।

(৩) গোবরের সঙ্গে পাটখড়ির ব্যবহার: (ক) লম্বা পাটকাঠিকে ভেঙ্গে ২ ফুট থেকে ৪ ফুট লম্বা টুকরা করা হয়। গরুর গোবরের সঙ্গে ধানের তুষ বা কাঠের ঘুঁড়ো (করাতের ঘুঁড়ো) মেখে উক পাটকাঠির এক একটির চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়। টুকরাটির দুই প্রান্ত হাতে ধরার মতো ২-৪ ইঞ্চি ফাঁকা রাখা হয়। এরপর রোদে ভালভাবে শুকানো হয়। এদেরকে কাঠি ঘুঁটে বা মুঠে (ঘুইঝো বা মুইঝো/ব্যানা) বলে। এই কাঠি-ঘুঁটে উনানে জ্বালানি হিসেবে গাঁ-গামে রান্নার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (খ) পাটকাঠির মাথার দিকের নরম অংশ হাতে বা পায়ের চাপে ভেঙ্গে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র টুকরা, কাঠিঘুঁটে দেবার উদ্দেশ্যে পাটকাঠি ভাঙ্গার সময় ছিটকে পড়া ক্ষুদ্র টুকরা সমুদয়, পাটকাঠির সঙ্গে লেগে থাকা পাটের আঁশ (ফেড্যায়) প্রয়োজনে টুকরা টুকরা করে নিয়ে গোবরের সঙ্গে ছেনে (মেখে) দরকার হলে কিছু তুস বা কাঠের ঘুঁড়া মিশিয়ে মণ তৈরি করা হয়। নারিকেল গাছ বা তালগাছের গোড়ার দিকে অথবা কোনো সুবিধাজনক স্থানে (বিশেষত পুরনো দালানের দেয়ালে, গোয়াল ঘরে বেড়ায়, বড় বড় গাছের মোটা শিকড়ে বা গোড়ার অংশে) গোলকৃতি চ্যাপ্টা (চাক চাক) চাকতি দেয়া হয়। রোদে ভালভাবে শুকায়ে মচমচ করে বস্তা, ধামা বা ওড়াতে যত্ন করে রাখা হয়। এদেরকে চাকতি ঘুঁটে (গোবরের চাপড়ি) বলা হয়। (গ) পাটখড়ির ঘুঁড়ো, গোবর ও তুষ বা কাঠের ঘুঁড়ো একত্রে মিশিয়ে তৈরি করা মণকে মুঠি মুঠি গুটিকা তৈরি করে সুবিধাজনক স্থানে পলিথিন পেপারে, চট বা টিনের ফলকে বা সিমেটের খালিবস্তায় সাজিয়ে রোদে রাখা হয়। ভালোভাবে শুকিয়ে যত্ন করে রাখা হয়। এদেরকেও ঘুঁটে (বা ঘুটি ঘুঁটে) বলা হয়। এই ‘গুটিঘুঁটে’ দিয়ে রান্না করার জন্য কয়লার উনানের মতো ভিন্ন ধরনের চুলা তৈরি করে নিতে হয়। এই গুটিঘুটি ও চাকতি/ঘুঁটে শহরাঞ্চলে পাড়ায় ফেরিওয়ালা বিক্রয় করে থাকে।

(৪) বেড়ায় ও চালে পাটকাঠির ব্যবহার: বিশেষত গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের বসবাস করার ঘর-দরজায় ও চালে এবং গৃহপালিত পশুদের ঘর, ঢেকি ঘর, লাকরি বা জ্বালানি রাখার ঘর এমনকি অস্থায়ী ভিত্তিক আঁতুরঘর বা অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজন অস্থায়ী ঘরের বেড়া বা চালে অথবা উভয়ই পাটকাঠি দিয়ে তৈরি করা হয়।

ক) প্রথমে বাঁশ বা সুপারীগাছের চটা তৈরি করা হয়। বেড়ার জন্য পরিমাণমত পাটকাঠি লয়ে মাপ অনুযায়ী ভেঙে চটা পেতে পাটকাঠি বিছানো হয়। এর উপর আবার চটা রেখে দড়ি, সুতলী বা গুণা (লোহার চিকন তার) দিয়ে বেঁধে বেড়া তৈরি করা হয়। এভাবে ঘরের দরজা আরো মজবুত করে তৈরি করা হয়। অনেক বাসগুহে পাটকাঠির বেড়ায় মাটির (গোবর ও মাটি মিশিয়েও দেয়া হয়) প্রলেপ দিয়ে নিচ্ছন্দ করা হয়।

খ) পাট কাঠির তৈরি দরজা পৃথকভাবে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়। আবার দরজাটিকে ঘরের সঙ্গে বাঁশের দড়ে এমনভাবে সংযুক্ত করে রাখা হয় যাতে দরজাটিকে এদিক ওদিক ঘুরানো যায়। দরজা বন্ধ করার ফেত্রে দড়ির বাঁধ বা ঠেঙ্গা (বা ডাশা কাঠখণ্ড বা বাঁশখণ্ড) ব্যবহার করা হয়। সাধারণত এই দরজাকে ঝাপ বলে।

গ) গ্রাম্য বাজারে বা হাটের বিশেষ করে চায়ের দোকান, নাপিতের ঘর, মুচির দোকান বা কাঁচা তরকারির দোকানের সম্মুখভাগের দরজা পাটকাঠি দিয়ে মজবুত করে তৈরি করা হয়। এবং উপরদিকে জিআই তার বা মোটা দড়ি দিয়ে এমনভাবে ঝুলায়ে রাখা হয় যাতে ঠেঙ্গা দিয়ে (লগির মতো ৫/৭ হাত লম্বা বাঁশখণ্ড বা কাঠখণ্ড) উপর দিকে নিচ্ছন্দ তুলে রাখা যায়। এই দরজাকেও ‘ঝাপ’ বলা হয়।

ঘ) গ্রামাঞ্চলে একচাল, বাচাড়ি বা দোচালা ঘরের চাল পাটকাঠি, বাঁশ বা সুপারীগাছের চটা দিয়ে তৈরি করা হয়। যাতে ঘরের ভিতরে বৃষ্টির জল প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য চালের উপরের দিকটা পলিথিন পেপার দিয়ে ঢেকে দেয় হয়।

ঙ) আবার অনেকে বনের বা ছনের ঘর তৈরি করে তাতে বসবাস করে থাকে। কোথাও কোথাও গোয়ালঘর, টেঁকিঘর, লাকড়ি (জালানি) রাখার ঘরও বনের বা ছনের (শন-খড়জাতীয় এক প্রকার তৃণ) দিয়ে এমন সুন্দর ও পুরু করে তৈরি করা হয়—যাতে ঘরের ভিতর কোনো প্রকার জল চুক্তে না পারে। এধরনের চালে পলিথিনের প্রয়োজন পড়ে না। এ ধরনের বনের ঘর গরমের দিনে বসবাসের জন্য অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। আবার শীতের দিনে টিন-কাঠের ঘরের চেয়ে শীতও কম লাগে। বনের চাল ও মাটির প্রলেপ দেয়া পাটকাঠির বেড়ার ঘর গরিবের বসবাস-বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বেশি লক্ষ্যণীয়। বনের বা ছনের চাল বোনার সময় প্রথমে লম্বা ও শক্ত পাটকাঠি দিয়ে চাল বুনা হয়। এর উপর পর্যায়ক্রমে সারি সারি ছন বা বন সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়। বিশেষ করে সুপারীগাছের চটা বা বাঁশের চটা দিয়ে মজবুত করে শক্ত দড়ি বা গুণা (লোহার তার) দিয়ে বাঁধা হয়। দুটো চাল তৈরি হলে ঘরে উপর তির্যকভাবে জুড়ে দেয়া হয়। এ ধরনের ঘরকে বনের ঘর বা ছনের ঘর বলে। শহরাঞ্চলে বৃত্তবানদের কেউ কেউ সব্বের বশে অথবা প্রয়োজন অনুভব করে প্রাসাদের ছাদের উপর বনেরঘর তৈরি করেন। কোনো কোনো স্থানে বিনোদনের জন্য পাটকাঠি ও বন দিয়ে বড় ছাতার মতো (চারিদিক খোলা) তৈরি করে রাখে।



পাট থেকে আঁশ ছড়ানো হচ্ছে, জাতিরা-শরীরতপুর সড়কে

চ) পল্লীগায়ে গরিব মানুষের অধিকাংশ বাড়ির ঘর-দূয়ার পাটখড়ির বেড়ায় ঘেরা। অনেক ঘরের বেড়া আবার গোবর-মাটির বা শুধু মাটির প্রলেপ দেয়া। গোবর-মাটির প্রলেপ টিকসই বেশি। এতে ফাটল ধরে খুবই কম। শুধু মাটির প্রলেপ ফেটে ফেটে যায় তাই মাটি ও গোবর মিশিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে মথে (বা ছেনে নিয়ে) মণ তৈরি করে পাটকাঠির বেড়ার দু'পাশ্চেই সমতলে লেপে দেয়া হয়। এ বেড়া খুবই মজবুত হয়। উই পোকার হাত থেকেও বেশি সময় রক্ষা করা যায়। শীতকালে এ ধরনের বেড়াও দরজা অনেকটা শীতের প্রকোপ রোধ করে। এ ছাড়া রাতে বাহির থেকে কেউ ভিতরের কিছু সহজে দেখতে পারে না। পাটকাঠির বেড়া, চাল, দরজা এবং বনের বা ছনের চাল তৈরি করে দেয়া যাদের পেশা তাদেরকে 'ছৈয়াল' (ছইয়াল) বলা হয়।

ছ) কোনো কোনো অঞ্চলে মাটির ঘরে বসবাস করতে দেখা যায়। মাটির ঘরে টিনের চাল, টালির চাল বা বনের চাল দেয়া থাকে। মাটির ঘরের দেয়াল তৈরিতেও অনেকে পাটকাঠি ব্যবহার করে থাকে। প্রথমে বাঁশের চট্টা, বাঁশের কঞ্চি, সুপারিগাছের চট্টা, শক্ত পাটকাঠিকে শক্ত দড়ি বা লোহার তার (গুণা) ফাঁকা ফাঁকা করে বেড়া তৈরি করা হয়। এতে মাঝে মাঝে ইট অথবা নিচের অংশেও কিছু উচু করে ইট সাজিয়ে দেয়া হয়। এরপর এঁটেল মাটি জল দিয়ে ভালোভাবে মেঝে দলা দলা করে বেড়ায় নিরেটভাবে লাগিয়ে দেয়া হয় দু'পাশ্চেই, এরপর ঘরের ভিতর ও বাহির দু'দিকেই সমতল করে লেপে



কাঠ দিয়ে তৈরি অথবা মজবুত করে পাটকাঠি দিয়েও তৈরি করা হয়। মাটির তৈরি এসব দেয়ালে মাঝে মাঝে সুন্দর করে জানালাও রাখা হয়। এসব মাটির ঘরে গরমের দিনে বসবাস করা অনেকটা আরামদায়ক।

জ) কাঠের খুঁটি, টিনের বা টালির চাল দেয়া ঘরেও অনেকে পাটকাঠির বেড়া ব্যবহার করে। আবার অসমাণ বিস্তিৎ এ অস্থায়ীভাবে বসবাস করার ক্ষেত্রে দরজা, জানালায় অনেকে পাটকাঠির ঝাঁপ ব্যবহার করে।

ঝ) আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেকে বাড়ির পর্দাপুরিদা রক্ষার্থে সুবিধাজনক হান ঘিরে হথাইলের (পাটকাঠির) বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে রাখে। বের হবার জন্য পথ (দুয়ার) রাখে এতেও পাটকাঠির ঝাপ রাখে।

ঝঃ) ধান্য পায়খানা ও পশ্চাবখানার বেড়াও পাটকাঠি দিয়ে তৈরি করা হয়। কোনো কোনো পর্দানশীল পরিবারের স্নানগার (গোসলখানা) বা পুকুর ঘাটে পাটকাঠির বেড়া (আউলি) দেয়া হয়।

ঠ) অনেক ক্ষেত্রে পাটকাঠির বেড়ায় চাপা বাঁধ দেয়া হয় না। কমপক্ষে তিনি চটা লম্বালম্বি রেখে একমুঠি পাটকাঠি পাশাপাশি রেখে চটার এপাশে ওপাশে ঢুকায়ে প্রয়োজন সংখ্যক মুঠি মুঠি পাটকাঠি একইভাবে আটকায়ে রাখা হয়। এভাবে পাটকাঠির বুনট বেড়াও টিকসই কর নয়। আবার অনেকে লম্বা-লম্বা পাটকাঠি ৫/৬ টা পাশাপাশি রেখে চটার পরিবর্তে ব্যবহার করে পাটকাঠির বেড়া বুনে নেয়। এছাড়া তির্যকভাবে পাটকাঠি রেখে সুন্দর সুন্দর বেড়া বুনা হয়। যা সাধারণত বসত ঘরেও শোভা পায়।

ঠ) অনেকের গরু ঘরে টিনের বা টালীর চাল আর পাটকাঠির বেড়া ব্যবহার করে থাকে।

#### (৫) কৃষিকাজে পাটকাঠির ব্যবহার:

পানের বরজ অনেক স্থানে পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা। কোথাও কোথাও অবশ্য সরুনলের বেড়া দেয়া থাকে। বরজের ছাউনিতে (চাল বা উপর দিকের ঢাকনি) পাটকাঠি ও কিছু কিছু লম্বানাড়া (শুকনো ধানগাছ) ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বরজে পানের চারা বা লতা মোজা ও খাড়া (লম্বভাবে) উপরে দিকে উঠার জন্য বাউনি হিসেবে শক্তশক্ত পাটকাঠি ব্যবহৃত হয়। সর্বোপরি বরজে পাটকাঠির ব্যবহার অধিক।

লতা-আকৃতির সজ্জিগাছ, ফলগাছের বাউনি (যাকে ভর করে লতাজাতীয় গাছ উপরের দিকে উঠতে পারে এমন ডাল, পাতা বা কাঠি) দিতে শক্ত পাটকাঠি ব্যবহৃত হয়। এসব লতাগাছ মাটির কমপক্ষে ৩/৪ ফুট উচুতে আনুভূমিকভাবে বিস্তার লাভ করাবার সুবিধার্থে ঝাঁকা (মাচা বিশেষ) তৈরি করতে হয়। কমপক্ষে ৪/৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে বর্গাকার বা আয়তাকার ঝাঁকা রেখেরেখে পাটকাঠির বেড়া তৈরি করা হয়। প্রয়োজনমতো খুঁটির সঙ্গে বিশেষত বাঁশ ইত্যাদি বেঁধে তার উপর উক্ত বেড়া আনুভূমিকভাবে বেঁধে দেয়া হয়। এতে লতানোগাছ নীচ-উপর, চারিদিক থেকেই আলো বাতাস পেতে পারে। এসব গাছে ফল, সবজি, ফুল ইত্যাদি বৃদ্ধিপেতে ও সংগ্রহ করতে বিশেষ সুবিধা হয়। সবজি গাছের মধ্যে লাউ, কুমড়ো, শশা, বিংঙ্গে, দুন্দল, রেখা (চিচিঙ্গা), পটল, চালকুমড়ো, উচ্ছে, করলা, পুঁশাক, সীম, মৌসীম, বরবড়ি ইত্যাদি এবং ফলের মধ্যে আঙুল ফল ও ফুলের মধ্যে নীলকষ্টীফুল, গেটফুল ইত্যাদি লতা জাতীয় গাছের জন্য ঝাঁকা অপরিহার্য। আর এসব ঝাঁকাতে পাটকাঠি বহুল ব্যবহৃত হয়।

ধনসিদ্ধ করে রোদে শুকাতে কাক-শালিক পাহাড়া দিতে অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা বৃক্ষব্যক্তি পাটকাঠি হাতে লয়ে ছায়ায় বসে বা ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকে। এভাবে সরিষা, ডাল, তিল, মরিচ ইত্যাদি রোদে শুকাবার ক্ষেত্রেও পাটখড়ি নিয়ে পাহাড়া চলে।

(৬) কাগজও প্লাইট তৈরিতে পাটকাঠির ব্যবহার অপরিসীম।

#### (৭) মাছ ধরার কাজে পাটকাঠির ব্যবহার:

- শক্ত পাটকাঠির মাথায় সুতা বেঁধে বড়শী গেঁথে পুরুরে, খালে, বিলে, নালায়, বা হাওড়-বাওড়ে ছোট ছোট মাছ ধরা হয়।
- স্রোত থাকা খালে বা নালায় ছোট খাটো গড়া (মাছ ধরার জন্য চালি দ্বারা তৈরি ফাঁদ) দিতে পাটকাঠি ব্যবহৃত হয়।
- বিলের মাঝে বিশেষত বর্ষাকালে বাঁশের খুঁটি গেড়ে তক্তা পেতে মাচা তৈরি করা হয়। এর উপর পাটকাঠি দিয়ে বেড়া দিয়ে অস্থায়ী বাচারি করে রাতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কোন মাচাতে তক্তার পরিবর্তে আটি আটি

পাটকাঠি বিছায়ে তার উপর হোগলা বা মাদুর পেতে শোয়াবসার ব্যবস্থা করা হয়। এসব বাচারির চালে টিন অথবা পাটকাঠি ও পলিথিন দিয়ে ছাউনি দেয়া হয়। যাতে বৃষ্টিতে ভিজতে না হয়।

- পাটকাঠি দিয়ে শুধু বঁড়শি ছিপ-ই তৈরি হয়, তা নয়। বড় -ছোট বিভিন্ন ধরনের বঁড়শিতে সাধারণত পাটকাঠির টুকরা দিয়ে ‘টুম’ (আধাৰ গাঁথা বঁড়শিতে মাছ ধৰল কিনা তা নির্দেশক) বানায়ে বঁড়শি বাওয়া হয়।

#### (৮) মাপজোখের কাজে পাটকাঠি:

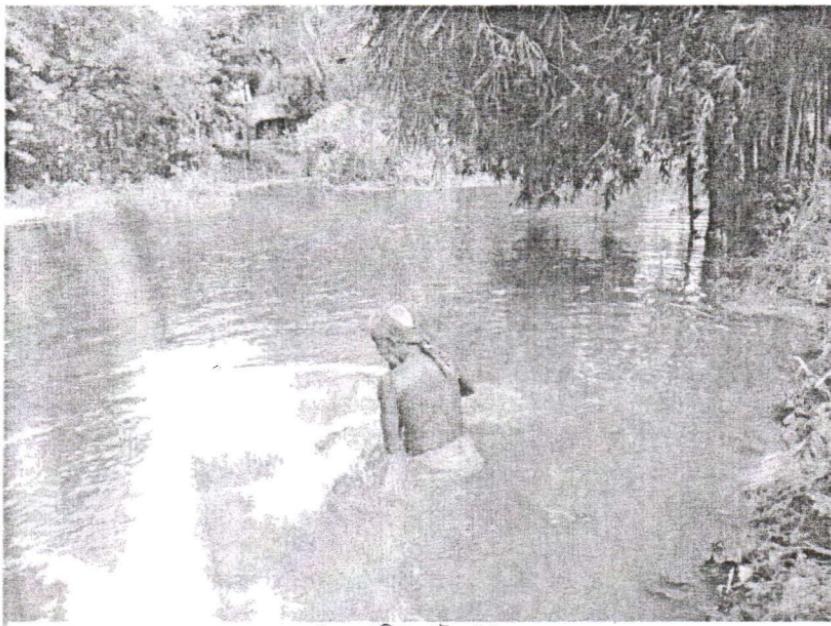
- মাপজোখের ক্ষেত্রে পাটকাঠির ব্যবহার একেবারে কম নয়। ছোটখাটো জায়গার সীমানা নির্ধারণ ও জমির পরিমাণ নির্ণয়ে ফুট বা হাত চিহ্নিত করে লম্ব-শুরু পাটকাঠি ব্যবহৃত হয়। আগেকার দিনে কাঠিদিয়ে জমি পরিমাণ করা হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামের নামে, যেমন- ধানকাঠি, বিন্দাই কাঠি, পৈতকাঠি, এরিকাঠি, প্রিয়কাঠি (শরীয়তপুর); ঝালকাঠি, সুখৰকাঠি (ঝালকাঠি); ওদনকাঠি (পিরোজপুর); চুলকাঠি (বাগেরহাট); ইসলামকাঠি (সাতক্ষীরা); মাদারকাঠি (বরিশাল); হরিদাসকাঠি (মশোর); শেয়ালকাঠি (রাজবাড়ি) কোদালকাঠি (কুড়িগ্রাম); খোলাকাঠি (দিনাজপুর); আশিকাঠি (চাঁদপুর) প্রভৃতি।
- মিঞ্চিরা ঘর-দুয়ার, আসবাবপত্রাদি তৈরি বা মেরামতের কাজে পাটকাঠি ব্যবহার করে থাকে।
- বিল, অগভীর পুকুর, চৌবাচ্চা এবং এ ধরনের অনেক জলাধারে জলের গভীরতা নির্ণয়ে পাটকাঠি ব্যবহৃত হয়।
- কবরখন কালে মাপজোখের সময় পাটকাঠি সহজলভ্য।

#### (৯) হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজাপূর্বকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে পাটকাঠির ব্যবহার অনুসীকার্য:

- মৃত ব্যক্তির সৎকার কার্যে (চিতায়) মুখাশির কাজটি পাটকাঠিতে আগুন ধরিবেই করানো হয়। চিতার আগুন ঠিকমতো না জুললে ধূপও প্রয়োজন মতো পাটকাঠি যোগ করা হয়।
- হিবিষ্যান্ন রাধাবার সময় শুকনো নারিকেল পাতা বা পাটকাঠি ব্যবহার করতে হয়।
- শ্রান্কাদি কর্মে, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় এবং বিয়ে উপলক্ষে যজ্ঞাদি করার স্থান পরিমাপ ও আগুন ধরাতে নারিকেল গাছের শুকনো পাতা অথবা সরাসরি পাটকাঠি ব্যবহার করা হয়।
- দেবদেবীর মূর্তি তৈরিতে পাটকাঠির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।
- লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে কলাগাছের বাকলা দিয়ে নোকা তৈরি করা হয়। এ নোকার মাস্তুলটি পাটকাঠি দিয়েই তৈরি করা হয়। এ সময় ‘কলাবউ’র হাত দেয়া জন্য কঞ্চিৎ অথবা শুক্র মোটা পাটকাঠির টুকরা ব্যবহার করা হয়।
- পুজোতে নিবেদন উদ্দেশে নৈবেদ্যের বাটা সহ অন্যান্য বাটা ইত্যাদি সাজিয়ে বসাতে বাটার নিচে অনেক সময় পাটকাঠির টুকরা দিয়ে ঠেকনা দেয়া হয়। এমন

কি পুরোহিত ঠাকুরের বসার আসন (পিংড়ি) ঠিকমতো পেতে রাখতেও প্রয়োজন হলে পাটকাঠির ঠেকনা দেয়া হয় ।

- দোল পূর্ণিমাতে পাটকাঠি, পাটের দড়ি বা সুতলি ও খড়কুটা দিয়ে বুড়ির ঘর তৈরি করা হয় । এতে অগ্নিসংযোগ করে আনন্দ উপভোগ এবং হাত পায়ে তাপ লাগানো হয় । এভাবে হাত পা ছেঁকে নিলে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বলে এদের বিশ্বাস ।



খালের পানিতে পাট ধোয়া হচ্ছে

(৯) গৃহকর্মে পাটকাঠির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে না থাকলেও খুঁটিনাটিতে কম নয় ।

- বর্তমানে বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় দালানে বা টিনের ঘরে লৃতা (লৃতা বা লৃতিকা) বা মাকড়শার জাল বেশি বেশি করে সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন । এ ছাড়া সনাতনী চূলাযুক্ত রান্নাঘর কাছাকাছি থাকলে রান্নাঘরেই শুধুনয়, অন্যান্য ঘরেও কালো কালো ‘বুল’ পড়ে সিলিং, দেয়াল বা বেড়ার কোণা এবং ঘর নোংড়া দেখায় । এসব ‘লৃতা’ ও ‘বুল’ অপসারণের জন্য প্রায় প্রতিদিনই পাটকাঠি ব্যবহৃত হচ্ছে । যদিও বর্তমানে লম্বা ডাটের ঝাড়ু কিনতে পাওয়া যায় । তারপরও পাটকাঠি অনেকটা সহজলভ্য ।
- পুরুর ঘাটে ধোয়ামোছা করার সময় হঠাৎ কোনো বাসন বা জামা-কাপড় ভেসে যেতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে পাওয়া পাটকাঠি দিয়ে সেটা কাছে আনা সহজ ।

- পাটকাঠির তৈরি সুন্দর সুন্দর ওয়ালমেট কিনতে পাওয়া যায় আবার অনেকে নিজেরাই ঘরে বসে তৈরি করে নেয়।
- পাটকাঠির তৈরি বিভিন্ন ধরনের খেলনা কিনতে পাওয়া যায়, যা কোনো কোনো বাড়ির শোকেসে শোভাপায়।
- বসত ঘরের চিপায় চাপায়, বা আশপাশে কোথায়ও ইঁদুর মরা, ব্যাঙ মরা (বা জ্যাঞ্চ) দূর করতে অনেক সময় পাটকাঠি ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া, দরজার আশপাশে যাতায়াতের পথে বিছে, কেঁচো, জঁক, কেড়া ইত্যাদি সরতেও পাটকাঠির প্রয়োজন হয়।
- বাড়িঘরের আশপাশ থেকে পলিথিন, নোংরা কাগজ ইত্যাদি দূর করতে পাটকাঠির প্রয়োগ যত্নত্বাই দেখা যায়।
- গ্রাম্য অনেক ছেলেমেয়ে পাটকাঠির মাথায় কাফুলাগাছের আঠা (লাশা) বা অন্য কোনো গাম জাতীয় পদর্থ সামান্য মেখে কৌশলে ফড়িং, প্রজাপতি ধরে ফেলে এবং মজা করে থাকে।
- বাঁশের চটা দিয়ে ধনুক তৈরি করে এবং পাটকাঠির টুকরা দিয়ে তীর বানিয়ে গ্রামাঞ্চলে তীরনিক্ষেপ খেলা চলে।
- গ্রামে গরীব ঘরে পাটকাঠি দিয়ে হ্যাঙ্গার তৈরি করে শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখে কেউ কেউ।
- গ্রামাঞ্চলে গরীব অথচ আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া গৃহিণী বা গৃহকন্যারা অনেকে ঘরের দু'খুঁটির মাঝে পাটকাঠি দিয়ে বিকল্প আলনা তৈরি করে কাপড়-জামা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখে। এক্ষেত্রে একাধিক মোটা পাটকাঠিকে একত্রে সুতলি দিয়ে বেঁধে নেয়া হয়। এরপর খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে আটকায়ে মইয়ের মতো আলনা করে রাখে।
- গ্রামাঞ্চলে অনেকে বাড়িতে বাহিরে বা ঘরেই পাটকাঠি টানিয়ে তার উপর ভিজে গামছা, লুঙ্গি, শাড়ি ইত্যাদি সুবিধামতো মেলে রাখে।
- দরজা ও জানালায় পর্দা ঝুলিয়ে রাখতে কেউ কেউ পাটকাঠি ব্যবহার করে থাকে।

(১০) বর্ষাকালে অথবা বন্যার সময় কেউ কেউ ঘরের ভিতর বা বাহিরে প্রয়োজন মতো মাচার জন্য খাচা তৈরি করে তার উপর আটি আটি পাটকাঠি সাজায়ে তার উপর হোগলা, মাদুর ও পাটি পেতে শোবার ব্যবস্থা করে থাকে।

### গ. পাটের আঁশের ব্যবহার

পাটের আঁশের ব্যবহার ব্যাপক এবং পাট আমাদের একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশ প্রতি বছরই পাটের আঁশ বা পাট বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ আয় করে থাকে। তাই পাটকে বাংলাদেশে ‘সোনালি আঁশ’ বলা হয়। এই পাট থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অপরিহার্য।

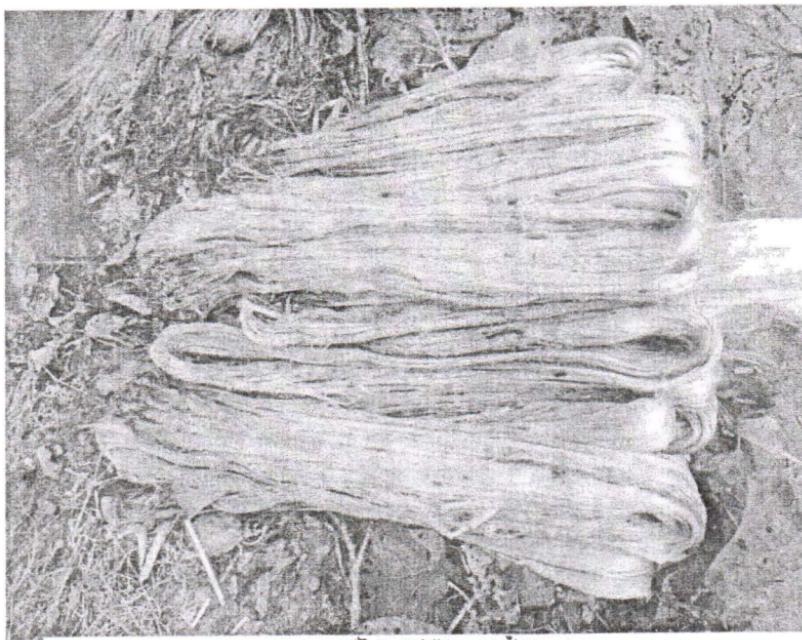
বাংলাদেশে ছোটবড় প্রায় ৭৬টি পাটকল বর্তমানে রয়েছে। এসব জুটমিলে সুতা, সুতলী, দড়ি, কাছি, ছালা (বস্তা), ম্যাট, কাপেট ইত্যাদি। বহুবিধ দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে।

### (১) পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি দড়ি, কাছি, রশি, সুতলী ইত্যাদির ব্যবহার:

- ঘর তৈরিতে রশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চৌচালা টিনের ঘরের চাল বা ত্যরিকভাবে খুঁটির উপর রাখতে দড়ি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দড়ি দিয়ে না বেঁধে সরাসরি রুক্যা বাগা খুঁটির একবারে উপর দিয়ে আসা পাইর বা প্যাঁচের সঙ্গে লোহার তৈরি গজালা বা বড়/লম্বা পেরেক দিয়ে আটকানো হয়। এখানে চালের খাঁচা তৈরি করে টিন খিলানো হয়। আবার নিচ থেকে চারদিকের জন্য চারটি চাল তৈরি করেও উপরে তোলে মোটা দড়ি বা কাছি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়। এভাবে দোচালা ঘরের চাল নিচ থেকে তৈরি করে ঘরের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এটা অবশ্য পুরনো পদ্ধতি। আধুনিক মিস্ট্রীরা এ পদ্ধতিতে চাল সেট করে না। তদুপরি ঘরের চাল খিলানো এবং উপর দিকে কাজ করতে বাঁশ বাঁধার জন্য মোটা দড়ি এরা ব্যবহার করে থাকে।
- প্রাসাদ তৈরি করতে বাঁশ, কাঠ ও দড়ি একান্ত প্রয়োজন। দেয়ালের উপরের অংশ তৈরি করতে বাঁশ পুতেও বাঁশ দড়ি দিয়ে আনন্দমিকভাবে বেঁধে তার উপর তক্তা (কাঠ) পেতে রাখা হয়। এই মাচার উপর দাঁড়িয়ে ইটের উপর ইট গেঁথে দেয়াল তোলা হয় এবং প্রাস্টারকরণ ও রং দেয়ার কাজ ও এভাবে মাচা বেঁধে করা হয়।
- পাটের তৈরি সুতলী দু'প্রকার। সুরু সুতলী দিয়ে মুদিদোকানে পোলটা (পটলা) বা ঠোঙা বাঁধা হয়। কাপড়ের দোকানেও আগে দু'চার খানা কাপড় (বিক্রীত) চিকন সুতলী দিয়ে বেঁধে খরিদ্দারের হাতে ধরিয়ে দিত। গুড়ের দোকান, ময়রার দোকান, পানের দোকানেও চিকন সুতলীর ব্যবহার এখনও হয়ে থাকে। মোটা সুতলী দিয়েও কোনো কোনো বেশি সংখ্যক কাপড় (লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি) পোশাক ইত্যাদি বাঁধা হয়। পাটকাঠির বেড়া, চাল, ঝাপ ইত্যাদি তৈরি করতে বাঁশ বা কাঠগুচ্ছ বেঁধে দিতে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঁধা বা গিট্টু (গিটি) দিতে ও মোটা সুতলীর ব্যবহার রয়েছে। লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি সহ অন্যান্য পোশাকাদি রোদে শুকাবার জন্য এবং ঘরের, ভিতর বুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেও পাটের তৈরি রশি ব্যবহৃত হয়।
- মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ফাঁদ (গড়া বা চালি ইত্যাদি) তৈরিতে পাটের তৈরি রশির ব্যবহার সুবিধাজনক।
- বড় বড় গাছ-গাছুরা ভূপাতিত করে ফেলতে এবং দাঁড়ানো গাছের মাথার দিক থেকে টুকরা টুকরা খও বুলিয়ে কপিকলের মতো নিচে ফেলতে ও পাটের মোটা কাছি (রশি) ব্যবহার করা হয়। আবার কোনো কোনো জিনিস উপরে তুলতেও পাটের দড়ি-কাছি ব্যবহার করা হয়।
- আগেকার দিনে জমি-জমার মাপজোখ করতে রশি (দড়ি) ব্যবহৃত হতো। এর প্রমাণ মেলে গ্রামের নামের সঙ্গে 'রশি বা দড়ি' যুক্ত রয়েছে-তা দেখে।

যেমন- আটরশি, চৌদরশি, বিশরশি, বাইশরশি (ফরিদপুর); দড়িহাওলা (শরীয়তপুর) প্রভৃতি।

- পাটকাঠির আটি বাঁধতে পাটের আঁশ বা পাটই যথেষ্ট সহজলভ্য ও সুবিধাজনক। এছাড়া লাকড়ি-খড়ি (জ্বালানি), আঁখ, বাঁশের আটি ইত্যাদি বাঁধতেও পাটের দড়ি ব্যবহৃত হয়।
- ঢিনের বেড়ার ঘরে দড়ি দিয়ে তক্তা টানিয়ে খাদ্য দ্রব্যাদি বিভিন্ন ধরনের বাসন কোশন, কোটা ইত্যাদি এবং শোবার ঘরে বিছানাপত্রাদি সুন্দর সাজিয়ে রাখতে পাটের দড়ির সাহায্যে তক্তা টানানো হয়। কোনো কোনো দোকানে ও বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি এ ধরনের বুলন্ত তক্তায় সাজিয়ে রাখা হয়।
- গ্রামাঞ্চলে পাটের তৈরি চিকন লম্বা দড়ির ফাঁদ (ফাঁস/ফাঁশ) ব্যবহৃত হয়। দড়িটির এক প্রান্তে বৃত্তাকার ফাঁকা রেখে গিট্টা (গিট/গিঠ/গাষ্ঠি) দেয়া হয় যাতে এই ফাঁকায় কোনো পাথির পা সহজে আটকে যেতে পারে। এই ফাঁদ সুবিধাজনক স্থানে সুযোগ মত ফেলে রাখা হয়। দড়িটির অপরপ্রান্ত শিকারির নিয়ন্ত্রণে রাখা



পাট ধূমে রাখা হচ্ছে ভাজ করে

হয়। ধান ইত্যাদি আধার খেতে এলে শালিক, ঘৃঘৃ, কবুতর, চড়ই ইত্যাদি পাথির পা কোনোমতে এ ফাঁদে আটকে গেলে শিকারি একে ধরে ফেলে।

(২) পাটের আঁশ থেকে বিভিন্ন ধরনের সুতা তৈরি হয়। এই সুতা দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরি হয়।

- পাটের সূক্ষ্ম সূতা দ্বারা হাজারো রকমের শাড়ি, লুঙ্গি, পোশাকের কাপড়, পর্দা ও কভারের কাপড় সহ বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রাদি তৈরি করা হয়।
- অপেক্ষাকৃত মোটা সূতা দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের ব্যাগ বা থলে ইত্যাদি তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের বই-পুস্তক ইত্যাদি বহন করার সুবিধার্থে বিভিন্ন ডিজাইনের পাটের ব্যাগ তৈরি করা হয়। কবি-সাহিত্যিকের কাঁধেও পাটের তৈরি ব্যাগ এ কালেও শোভা পাচ্ছে। যাত্রীসাধারণের পোশাকাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করার ক্ষেত্রে পাটের ব্যাগ ব্যবহৃত হচ্ছে।
- পাটের তৈরি একধরনের মোটা সূতা (বা সুতলী) দ্বারা চট, বস্তা বা ছালা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। পাটের বস্তাতে ধান, চাউল, ডাল এমনকি বিছানাপত্রও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহন করা হয়ে থাকে। স্যত্ত্বে সংরক্ষণ করা হয়। কাপড়ের গাঁইট, পোশাকের গাঁইট ইত্যাদি বাঁধতে পাটের তৈরি চট ও পাটের দড়ি (রশি) ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে ও বড় বড় চট পেতে লোকজনের বসার ব্যবহৃত করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা মূলক ‘বস্তাদৌড়’ খেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
- পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি কম্বল শীতকালে ব্যবহৃত হয়।

(৩) পাটের আঁশ দিয়ে সুন্দর সুন্দর কাপেটি তৈরি করা হয়। এসব কাপেটি ধর্মীয়, সামাজিক বা সাহিত্য আসরে লোকজনদের বসার জন্য পেতে দেয়া হয়। আবার অনেক কাপেটি রয়েছে যা, সার্বক্ষণিক ঘরের মেঝেতে, সিড়ির উপর (ঢাকনী হিসেবে) ব্যবহৃত হয়।

(৪) পাট দিয়ে বিভিন্ন সাইজের রকমারি পাপোষ তৈরি করা হয়। পাপোষ একেক স্থানের জন্য একেক রকমের হয়ে থাকে। ড্রয়িংরুমে, বেড রুমে, ডাইনিং রুমে, কিচেন রুমে, বাথরুমে ও টয়লেটের দরজায় এমনকি বাহির থেকে এসেই দুয়ারের সম্মুখে জুতা মোছার জন্য অথবা জুতা রেখেই প্রথমে পা রাখার স্থানে এবং বিছানায় পাতুলে শোয়ার পূর্বুহূর্তে পা-রাখার স্থানে পাপোষ পেতে রাখা হয়।

#### (৫) সরাসরি পাটের আঁশের ব্যবহার:

- পাটের লম্বা আঁশ দিয়ে গ্রামাঞ্চলে শিল্পীমনা বিশেষত মহিলারা ‘ছিকা’ তৈরি করে। এ ছিকাতে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য ভরে সিলিং এর সঙ্গে অথবা ঘরের আড়া বা কোনো সুবিধাজনক উঁচু স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়। যাতে বিড়াল ও ইন্দুরের নাগালের বাহিরে নিরাপদে ঐ খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায়। পৌরাণিক কাহিনিতে ছিকার কথা উল্লেখ আছে। যখন তখন বালক শ্রীকৃষ্ণ যাতে ননীখেতে না পারে, সেজন্য তাঁর মা যশোদা ‘ছিকা’-তে ননীর পাত্র রেখে উঁচু স্থানে ঝুলিয়ে রাখতো।
- পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়াবার পরেও আঁশের কিছুটা পাটকাঠির সঙ্গে শুকিয়ে জড়িয়ে থাকে কোনো কোনো অঞ্চলে ‘ফেউয়া’ বা ‘হ্যাশ্যা’ বলে। এই ফেউয়া বিভিন্ন পাটকাঠি থেকে সংগ্রহ করে একত্রে দলা করে ‘লুড়ি’ তৈরি করা হয়। যা দ্বারা মাটির ঘরের মেঝে, পিরা, উঠোন প্রভৃতি স্থান লেপা হয়। রান্নার উনুন

(মাটির তৈরি) বা চুলা, পইথনা ও আশকালের (হেঁশেল/হেঁসেল) লুড়ি দ্বারা লেপা-মোছা করা হয়।

- পাকা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করার জন্য দু'তিন হাত বাঁশের লাঠি বা কাঠিদণ্ডের মাথায় (একপাণ্ডে) পাটের আঁশ টুকরা করে (পরিমাণ মতো) লাঠি বা দণ্ডটির মাথার চেয়ে বাড়তি রেখে একধরনে সম্মার্জনী তৈরি করা হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হেঁটে হেঁটে এ বাড়ু দিয়ে মেঝে ইত্যাদি শুঙ্গে নিতে সুবিধা হয়।
- মশাল তৈরিতে লাঠির মাথায় পাটের আঁশ পেঁচিয়ে মোটা করা হয়। এরপর কেরোসিন তেলে ভিজিয়ে আগুন ধরায়ে মশাল তৈরি করা হয়।
- গেরস্ত ঘরের মহিলারা ঘরে বসে পাটের আঁশ দিয়ে ফুল দানী, সাজি ইত্যাদি প্রস্তুত করে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের খেলনা, ওয়াল ম্যাট ইত্যাদি পাটের আঁশ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়।
- উনানে (বা চুলার) আগুন ধরাবার জন্য অনেক সময় পাটের ফেউয়া (হ্যাশ্যা) ব্যবহৃত হয়।

#### (৬) ঝাঁড়-ফুক, টুক-টাকে পাটের আঁশের ব্যবহার:

- সাপকে ব্যথা দিলে আইচলা ভাঙানোর (সাপ বন্দকরণ) জন্য পাটদড়ির মতো করে অথবা সরাসরি গিট দিয়ে মন্ত্রসিদ্ধ করে ব্যথাদানকারীর কোমরে ৩/৭ দিনের জন্য বেঁধে রাখা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস-সাপকে ব্যথা দিলে রাতে এসে ব্যথাদানকারীকে কামড় দিতে পারে, আইচলা ভাঙালে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- গ্রামে অনেকে পেটব্যথা, মাথা ব্যথা, কথা কমবলা, পাগলমো করা, পাতলা পায়খানা, শিশুদের বাতাইশ্যা হাগা (পায়খানা) মহিলাদের গর্ভাস্থায় ও প্রসবকালীন অসুবিধা দূরীকরণ, বন্ধাতৃ, ভূতে ধরা, পরীধরা, জীনেধরা, বানমারা, তাবিজ-করা, নষ্ট-করা, ভয়-পাওয়া প্রভৃতি (রোগী) ওরা ফকির-দরবেশ বা তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে গেলে অনেকক্ষেত্রে পাটপড়া দিয়ে দেয়। এটা কোমরে (মাজায়) বাহর উপরের দিকটায় বা গলায় বাইট্টার মতো ধারন করে। গ্রামে লোকজনের মধ্যে এমনকি শহরে লোকদের মধ্যেও দেখা যায়, ওরা-ফকিরের শরণাপন্ন হতে। এদের বিশ্বাস এতে সকল রোগ ভাল হয় এবং আপদ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

#### (৭) হিন্দু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে পাটের আঁশ বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

- দেবদেবীর প্রতিমা গড়তে পাট বা পাটের রশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধান গাছের শুকনো নাড়া (খড়) দিয়ে প্রতিমার প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করতে পাট বা পাটের সূতলী প্রয়োজন হয়। প্রতিমাকে খাড়া (সোজা) ও লম্বাভাবে অথবা প্রয়োজনমতো সেট করতে মূল বেদীর সঙ্গে বাঁশ বা কাঠখণ্ড সংযুক্ত করা হয়। এতে পাটের রশি দিয়ে দরকার মতো বেঁধে নিতে হয়। এর উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে শুকায়ে নিতে হয়। পরবর্তীকালে রঙতুলির কাজের মাধ্যমে যথাযথ প্রতিমা রূপায়িত করা হয়।

- পাটের আঁশ ভালো দেখে প্রয়োজন মতো কেটে রং লাগিয়ে প্রতিমার চুল, দাঢ়ি, গৌঁফ ও জট তৈরি করে নেয়া হয়।
- প্রদীপের সলতা (সলিতা) হিসেবেও পাটের আঁশ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।
- জগন্নাথদেবের রথ টানতে পাটের তৈরি মোটা দড়ি (বা কাছি) ব্যবহৃত হয়। এই রথের দড়ি অনেক লম্বা ও দু'মাথাই রথের সঙ্গে বেঁধে নেয়া হয়। হিন্দুদের বিশ্বাস—এই রথের দড়ি টানতে পারলে বা স্পর্শ করলে আপদ-বিপদ দূর হয়, মঙ্গল সাধিত হয়।
- ঝুলন পূর্ণিমাতে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি একটি সুন্দর মন্দিরে বসিয়ে নেয়া হয় এবং পাটের মোটা রশির সাহায্যে মন্দিরটি উপরের দিকে সিলিং এর সঙ্গে বা আড়ার বা সুবিধাজনক স্থানের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়। পুরোহিত বা সেবাইত মহাশয় চিকন একটি সুতলীর সাহায্যে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত মন্দিরকে ধীরে ধীরে টেনে দোল খাওয়ায়।
- নাম সংকীর্তনে যেছানে কীর্তনীয় দল কীর্তন পরিবেশন করে, তার চারিদিক ঘিরে বেলপাতা, আমপাতা ইত্যাদি সুতলীতে গেঁথে মন্ত্রপাঠ ও সংগীতের মাধ্যমে টানিয়ে রাখা হয়।
- বিয়ের পরদিন বাসী বিয়েতে বর্গাকার স্থান নির্ধারণ করে তার চার কোণায় চারটি কলাগাছ পুঁতে রাখা হয়। আমপাতা, বেলপাতা ও মাটির মুছি ছিদ্র করে পাটের সুতলির সাহায্যে মালার মতো করে উক্ত স্থানের চারিদিক বেষ্টন করে কলাগাছের সঙ্গে আটকায়ে রাখা হয়।
- গ্রামাঞ্চলে পূজা-অর্চনা শেষে প্রতিমা পুকুর, দীঘি বা ঝিলে বিসর্জন বা নিরঞ্জন বা ডুবিয়ে রাখতে বাঁশের বা সুপারিগাছের লম্বা চট্টা (বা গচা) গেঁড়ে সুতলী দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।
- পূজা বা বিয়েসাদি উপলক্ষে মণ্ডপ বা বিয়ের আসরে আলপনাদি চিত্রিত করতে অনেক সময় ব্যঞ্জাকৃতে সুতলী ব্যবহার করা হয়।

### (৮) গৃহপালিত গরু-ছাগল-মহিষের গলায় দড়ি বেঁধে রাখা হয়।

(৯) বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কাঠখও বা তজা বা পিঁড়ি (কাষ্টাসন) দড়ির সাহায্যে গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে দোলনা তৈরি করা হয়। এতে ছেলে মেয়েরা দোল খেয়ে মজা করে। এছাড়া প্রায় সর্বত্রই বিশেষ করে অর্ধিক স্বচ্ছল পরিবারে শিশু সন্তানদের জন্য সুন্দর সুন্দর বেতের, প্লাষ্টিকের বা বাঁশের তৈরি দোলনা কিনে এনে টিনের ঘরের আড়ার সঙ্গে বা দালানের সিলিং এর সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে। এবং প্রয়োজনমতো শিশু সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে রাখে। বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে পাটের দড়ির পরিবর্তে নাইলনের দড়িও ব্যবহার হচ্ছে।

### যুগপৎ ত্রৈধ ব্যবহার

একই অনুষ্ঠানে পাটপাতা, পাটকাঠি ও পাটের আঁশের ব্যবহার দেখা যায় কোনো কোনো এলাকায় লোকজ পর্বানুষ্ঠান ‘গাশ্শি’-তে ‘গাশ্শি অনুষ্ঠান’ বিশেষত কৃষ্ণিয়া

অপ্তগ্লে আশ্বিনী সংক্রান্তিতে উদযাপিত হয়ে থাকে ব্যাপক আয়োজনে। হিন্দু-মুসলিম সকলেই এ অনুষ্ঠান একসময়ে করত। বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন এ অনুষ্ঠান করে না বললেই চলে। পূর্বদিবসে গেরস্তের বাড়ির আঙিনা ও ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও লেপেমুছে রাখে। সংক্রান্তির ভোরে গৃহপালিত গরুকে স্নানাদি করায়ে উঠনে নির্ধারিত একটি স্থানে সাজায়ে রাখে। একটি কলাপাতায় (আগভায়া) চাল কুমড়োর টুকরো, পাটপাতা (শুকনো), পুটিমাছভাজি, পিঠা ইত্যাদি এনে গরুকে খাওয়ানো হয়। প্রচলিত ধারণা-এতে গরু রোগমুক্ত থাকবে।

বাড়ির লোকজন কাচাহলুদ ও নিম্পাতা বাটা গায়ে মেখে কোথাও সিদ্ধ তেঁতুল ও লবন হাতপায়ের আঙুলের চিপায় জল দিয়ে স্নানাদি সেরে আসে। এরপর উঠানে একস্থানে পাটকাঠি দিয়ে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে বাড়ির লোকজন হাতপা- অগ্নিতাপে ছেঁকে নেয় যথাসাধ্য। বিশ্বাস- চর্মরোগ হয় না। উচু বাঁশের মাথায় সরাসরি কয়েক মুঠি পাটের অগ্নিভাগ বেঁধে নিম্নভাগ ঝুলায়ে রেখে উঠানের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশটির গোঁড়া ফুটখানেক গেঁড়ে (প্রোথিত করে) সোজা দাঁড় করিয়ে ৭/৮ দিন রেখে দেয়। এদের বন্ধুমূল ধারণা-এর ফলে বাড়িতে কোনো অশুভশক্তির (ডাকিনী-মোগিনী, ভূতপ্রেত ইত্যাদির) কৃপ্তভাব পড়বে না।

## ঘ. পাটের বীজ-এর ব্যবহার

(১) পাটের বীজ থেকে কীটনাশক তৈরি করা হয়।

পাটের অপব্যবহার: মানুষের অপরাধবোধ, হতাশাহস্ত্র, মানসিকতা ও অভিভাবকদের অসচেতনতার ফলে মাঝে মাঝে পাটজাত পণ্য ও পাটকাঠির অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে:

- (১) জ্যাত মানুষ পাটের বস্তায় ভরে মুখ বেঁধে জলে ফেলে মারা।
- (২) মানুষ মেরে পাটের বস্তা বন্দী লাশ ফেলে দেয়া
- (৩) গলায় দড়ি বা রশি দিয়ে আত্ম হত্যা করা।
- (৪) মানুষ মেরে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা অথবা গলায় রশি পেঁচিয়ে মেরে ফেলা
- (৫) পাটকাঠি বা এর টুকরা ছোট শিশুর হাতে দিলে মাঝে মধ্যে চোখ, নাক বা মুখে ঢুকে ক্ষতিসাধন।
- (৬) পাটকাঠি দিয়ে শিশু-সন্তানদেরকে আঘাত বা প্রহার করা।
- (৭) কাউকে হাত-পা অথবা পুরো শরীরটা পাটের রশি দিয়ে বেঁধে নির্যাতন করা।
- (৮) শিশু-সন্তানদেরকে মাঝে মাঝে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়-যা খুবই বেদনাদায়ক।

(৯) পৌরাণিক কাহিনিতে মা যশোদাকৃত্ক শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনের (রশি দিয়ে) কথা উল্লেখ আছে। যদিও যশোদা ব্যর্থ হয়েছিলেন বারবার রজ্জু ছোট হয়ে যেত বলে।

(১০) রজ্জুতে সর্পভ্রম। যত্রত্র দড়ি ফেলে রাখলে অনেক সময় কেউ কেউ হঠাতে দেখা মাত্র সাপ মনে করে ভীত হয়ে পড়ে।

(১১) আগে দেখেছি, আসামিদের (চোর, ডাকাত প্রভৃতি) কোমরে অথবা পিঠ়মোড়া (হাতে হাতকড়া তো থাকতোই) দড়ি বেঁধে (পাটের শক্ত মোটা দড়ি) থানায় বা জেলখানায় নিয়ে যেত। কোনো কোনো আসামিকে দড়ি বেঁধে উল্টোভাবে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হত। আসামি থেকে স্থীকারোক্তি আদায়ে এখন অবশ্য দড়ির (রশির) ব্যবহার অনেক কমে গিয়েছে।

## অপকারিতা

পাটগাছ থেকে আঁশ ছাড়াবার লক্ষ্যে পাটকে কিছুদিন পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। একে জাগদেয়া বলে। এ কাজে পানি দূষিত হয়; এ পানিতে মশা জন্মে। মশার কামড় ও পাট পচা পানি গাঁয়ের লোকেরা ব্যবহার করে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

## অপবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ

(১) পাটপাতা (একজনের দলিলপত্র বা দস্তাবেজ আরেকজনের নিকট তুচ্ছ কাগজ)- তোর ঐ পাটপাতা কবে দেইখ্যা থুইছি। যা, যা, সিন্দুকের বিতর বইয়া থো গিয়া।

(২) পাটখড়ি/ হস্বাইল ( হালকা বা রোগাটে বা কৃশকায় ) - (র) না, না, ঐ হস্বাইলের মতন মাইয়্যাডারে বউ করুম নিকি! (রৱ) আমার মেয়েটার সঙ্গে পাটখড়ির মতো ঐ ছেলেটা মানাবে না।

(৩) পাটের ফেউয়া/পাটের আঁশ (জালের মতো হালকা বুননের গামছা/ লুঙ্গি বা কাপড়)- কী অ্যাকড়া লুঙ্গি দিলো তোমার আববায়, একেবারে পাটের ফেউয়া, সদরঘাট দেহা যায়। ফিন্দুম ক্যামনে!

(৪) দ্যাখছত, এই কাপড়ও মাইনষে মাইনষেরে দ্যায়। হৃদা পাটের আঁশ না রাখলেও তো দোষ।

## উপসংহার

পাটগাছ কাৰ্বনডাই অক্সাইড শোষণ করে বায়ুশোধন করে অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে। এতে প্রাণিকুল টিকে থাকার সহায়ক হচ্ছে। পাটগাছ হিনহাউস প্রতিক্রিয়া রোধ করতে সহায়তা করে। পাটজাত পণ্য পরিবেশ বান্ধব। পলিথিন, প্লাষ্টিকের তৈরী দ্রব্য ও অপচনশীল পণ্যাদি আমাদের পরিবেশ যেভাবে দূষিত করছে তা থেকে পরিআণের জন্য

পাটগাছের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের প্রযুক্তি নির্ভর করে আধুনিক মানের পণ্য উৎপাদনমূখী করার লক্ষ্যে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। পক্ষান্তরে বেশি করে পাট উৎপাদনের জন্য পাটচার্ষীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। এদের এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দিয়ে, এদের আর্থিক অবস্থান উন্নতি, সম্মানদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা প্রদান করে সচ্ছল ও স্বচ্ছ জীবনযাপনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার ও সচেতন মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

[মিবঙ্গটি প্রস্তুত করেছেন খর্ণঘোষের পাদংয়ের বাসিন্দা কবি শ্যামসুন্দর দেবনাথ।]

### তথ্যনির্দেশ

- ১। শ্রীমতি গীতা রাণী দেবনাথ- চর আবাবিল, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
- ২। কবি মফিজুল ইসলাম- সভাপতি, শরীয়তপুর সাহিত্য একাডেমি।
- ৩। শ্রীমতি ডলিরামী দাস- ঘৃনুদহ, মনিরামপুর, যশোর।
- ৪। কবি ফরীদনাথ রায় (ভাস্কর শিল্পী)- সাবেক অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
- ৫। অনিলকুমার সিকদার- কুমারখালি, কুষ্টিয়া।
- ৬। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান-ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- ৭। বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান- বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
- ৮। মো. মুঢ়ফুর রহমান (টিটু)- আচুড়া, নড়িয়া, শরীয়তপুর।
- ৯। কামরুল হাসান (লিমন)- দাসার্তা, পালং, শরীয়তপুর।

## লোকভাষা

শরীয়তপুর জেলার জনগণের সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা সমগ্র বাংলাদেশের অন্যান্য জনগণের সঙ্গে কমবেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে যোগাযোগ ব্যবহাৰ, কৃষি-আচার-আচরণ প্রভৃতি ক্ষেত্ৰে মুসীগঞ্জ, চাঁদপুৰ, বরিশাল, মাদারীপুৰ ও ফরিদপুৰের প্রভাব সবচে বেশি। এ সত্ত্বেও এখানকার মানুষের ভাষার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আমরা জানি, পৃথিবীৰ অধিকাংশ ভাষারই দুটি রূপ রয়েছে। একটি কথ্যরূপ, অপৰটি লেখ্যরূপ। আঞ্চলিক কথ্যরূপই হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা। অর্থাৎ একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষ মৌখিকভাবে কথাবার্তার মাধ্যমে যে ভাষায় মনের অনুভূতি বিনিময় করে তাকে আঞ্চলিক ভাষা বলে। আমাদের বাংলা ভাষা আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র অঞ্চলে যখন বিচ্ছিন্নপৰে ব্যবহৃত হয়, তখন সেগুলোৱ মধ্যে নানান পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, কিন্তু পরম্পৰ বোধগম্য, তা-ই আমাদের আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষার নির্দিষ্ট কোনও ব্যাকরণ নেই। এৱ পরিবৰ্তন বা পরিবৰ্ধন কোনও ব্যাকরণসম্বন্ধ বিনিময়ও নয়। তাই একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন রূপ থাকে, থাকতে পারে। শরীয়তপুরও এৱ থেকে ব্যতিক্রম নয়।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্ৰে এ জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও গ্রাম ভেদে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য পৱিলক্ষিত হয়। যেমন সদর উপজেলার জনগণের ভাষার সঙ্গে ডাম্বুড়া উপজেলার মানুষের বাচনভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য আছে। এমনকি ভেদেরগঞ্জ উপজেলার চৰাখণ্ডের মানুষের বাচনভঙ্গির সঙ্গে একই উপজেলার বিল অঞ্চলের মানুষের বাচনভঙ্গির কিছু কিছু পার্থক্য আছে। আবার পদ্মাৰ তীৰবৰ্তী অঞ্চলের মানুষের ভাষার সাথেও নগর অঞ্চলের মানুষের বাচনভঙ্গির পার্থক্য দেখা যায়।

ভাষা মাত্ৰই চলমান ও গতিশীল। যুগে যুগে নানা রকম রূপ রূপান্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মুখে মুখে এৱ পরিবৰ্তন ও ভিন্নতা লক্ষ্য কৰা যায়। সমগ্র বাংলাদেশে ১০-১২ কিলোমিটাৰ ব্যবধানে এই পরিবৰ্তন সাধাৰণত চোখে পড়ে। অর্থাৎ আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলের যে লোকজ ভাষা তা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে প্রত্যেকটিতে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় সাধাৰণত ১০-১২ কিলোমিটাৰ কিংবা ১৫ কিলোমিটাৰ ব্যবধানে এ পার্থক্য স্পষ্ট ধৰা পড়ে। এতদসত্ত্বেও শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার জনসাধাৰনের আঞ্চলিক ভাষাবীৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰে বেশ সামুজ্য রয়েছে। এ জেলার আঞ্চলিক ভাষায় যে সব ধৰনি উচ্চারিত হয় সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা কৰা হল।

### ধ্বনিৰ পরিবৰ্তন

\*ব্যঞ্জন ধ্বনিৰ পরিবৰ্তন: ক এৱ স্থলে হ এৱ ব্যবহাৰ:

যেমন: চাকা→ চাহা, টাকা → টাহা, টাকি → টাহি, কৰ → হৰ।

\* শব্দের মধ্যবর্তী বা শেষের খ এর স্থলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হ এর ব্যবহার:

যেমন: আখড়া → আকরা, দখল→দহল, রাখা →রাহা, দেখা →দেহা, লেখা→লেহা, চাখা → চাকা

মাখা →মাকা, লাখ → লাক।

\* ট, ঠ ও ঢ এর স্থলে ড এর ব্যবহার:

যেমন: কটা →কাডা, ছেট → ছেড, মাটি → মাডি, ওঠা → ওডা, কাঠ → কাড, পাঠা → পাডা,

ঢাকা → ডাহা, ঢাল → ডাল, ঢোল → ডোল, ঢং → ডং।

\* শ, ষ ও স এর স্থলে হ এর ব্যবহার (যুক্তবর্ণ ব্যতিত):

শাক → হাক, শালিক → হালিক, ষাড় → হার, ষোল →হোল, সাপ → হাপ, সুতা → হৃতা,

\* ড ও ঢ এর স্থলে র এর ব্যবহার:

যেমন: কড়া → করা, বড়ো → বরো, পোড়া → পোরা, গাঢ় → গার, দৃঢ় →দ্র, আষাঢ় → আহার।

\* ই এর পরিবর্তনের ফল:

যেমন: হাত → আত, হাতি → আতি, হাসা→আসা/আহা, হতাশ →উতাশ।

\* অঙ্গপ্রাণ ধ্বনির পরিবর্তনের ফল:

যেমন: ডাল → ঠাল, আপা →আফা, চাঁচা → ছাঁচা, এপার →এফার, পড়ার → ফড়ার, পাড়ে → ফাড়ে।

\* স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে শব্দের বিকৃতরূপ লাভ:

যেমন: তাড়াতাড়ি → তরতরি, কলা→ ক্যালা।

\* মহাপ্রাণ ধ্বনির পরিবর্তনের ফল:

যেমন: ঘাম → গাম, ঝাল → জাল, কথা → কতা, ধান → দান, ভাত → বাত।

\* নিম্ন স্বরধ্বনিকে উচ্চ স্বরধ্বনিতে পরিণত করার ঘোক, যেমন: একটু > ইট্টু (এ>ই)

\* ব্যঙ্গনধ্বনির পরিবর্তন ও শব্দদৈর্ঘ্য কমানোর ঘোক:

যেমন: শামুক → হায়ু, শালুক → হালু, মাকড়শা →মাহর।

\* স্বরধ্বনির পরিবর্তন ও শব্দদৈর্ঘ্য বাড়ানোর প্রবণতা (ই যুক্ত করে):

যেমন: আজান → আইজন, বেগুন → বাইগোন, বেহায়া →ব্যাহাইয়া, কাল →কাইল।

\* স্বরধ্বনির পরিবর্তন করে ব্যঙ্গনধ্বনি মিশিয়ে শব্দদৈর্ঘ্য বাড়ানোর ঘোক:

যেমন: বানর → বান্দর, মাঞ্চর → মজঞ্চর, কখন → কুনসুম।

\* শব্দদৈর্ঘ্য কমানোর ঘোক:

যেমন: হ্যাঁ → হ', কেন →ক্যা।

### অপিনিহিতিজনিত কারণ:

সাধুবৰীতি	চলিতবৰীতি	অপিনিহিতি
আসিয়া	এসে (অভিশ্রূতি)	আইস্যা
ভাসিয়া	ভেসে	ভাইস্যা

\* অপিনিহিতির পরিবর্তনের ফল:

যেমন: আইস্যা → আইয়া, ভাইস্যা → বাইয়া।

\* সমাসবদ্ধ পদের সহজ প্রয়োগের কারণে শব্দের বিকৃতি:

যেমন: মন চায় → মন লয় → মোল্লায়।

\* শব্দকে বিকৃত করে উচ্চারণ:

যেমন: মশারি → মোহের, বিকাল → বিয়াল।

\* মূল শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে:

যেমন: ময়লা → ছাতা → কোহোরি, ভর্তা → কউর্যা, কুয়াশা → খুয়া, সাহস বা তেজ → কুন্দি।

সবুজ → কউচ্যা, ছোট ননদ → ছোড়বি, বড় জা → বড়োরস, ছেট জা → ছোড়োরস, পেপে → কমফা।

\* বিদেশী শব্দ অপভ্রংশ-বিকৃত হয়ে:

যেমন: আন্দাজ (ফারসী) → আস্তাছ, খামোখা (ফারসী) → খামাহা, কোন্টে (হিন্দি) → কুন্ডে,

উধার (হিন্দি) → উদার, বয়ঃ (আরবি) → বয়ায়া, মাগ (ইংরেজি) → মগ/মগি, রুড (ইংরেজি) → রুড়া।

\* প্রথম পুরুষ এক বচন, বহু বচন উভয়ের ক্ষেত্রে: ক্রিয়াপদ (বর্তমান রূপ) এর সংগে ব/বো এর স্থলে ‘মু’ যুক্ত করে ভবিষ্যৎ কালের কাজকে বুঝানোর প্রবন্ধনতা:

যেমন: আনব → আনমু, খাইব → খাইমু, যাইব → যাইমু, করব → করমু, নাচব → নাচমু।

বাংলা পৃথিবীর এগন একটি ভাষা যার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য এবং আমরা সেই রাষ্ট্রের অধিবাসী, বাঙালি জাতি। মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের গৌরবময় অর্জন। মহান ভাষা আন্দোলনের অতুঙ্গজ্ঞ ঐতিহ্যের সক্রিয় অংশীদার এ শরীয়তপূর্ণ। ভাষা সৈনিক ভাস্তার গোলাম মাওলা (১৯২১-১৯৬৭) এ জেলার নড়িয়া উপজেলার অধিবাসী। তিনি ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দান করে ভাষার প্রতি গভীর মগভুবেধের যে পরাকার্ষা প্রদর্শন করেছেন জাতি কথনো তা বিস্মৃত হবে না। একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মাতৃভাষা বাংলা আজ মর্যাদার সুউচ্চ স্থানে। ভাষা যেন বহুমান নদী। উৎসবার থেকে নদীর বিপুলকায় জলধারা বেরিয়ে সর্পিল গতিতে কতো বাঁকে কতো মোড় নিয়ে এগিয়ে চলে মোহনার দিকে। অনুরূপভাবে বিবর্তন, রূপান্তর ও ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ভাষারও অগ্রগতি ঘটে। আমাদের আঞ্চলিক ভাষা সে অগ্রগতিরই ফসল সম্ভার, মূলত বাংলা ভাষারই ভৌগোলিক রূপভেদ। আঞ্চলিক ভাষা বাংলা ভাষাকে বিচ্ছিন্ন রূপ দান করে একে সৌন্দর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। ভাষার মূল

উপকরণ বাক্য। বাক্যের মূল উপাদান পদ (শব্দ)। প্রতিটি ভাষার শব্দ দিয়ে বাক্য গঠনের একটা নিয়ম বা বিধান থাকে। শরীয়তপুরের আঞ্চলিক ভাষাও তেমনি নিয়মের অধীন। বাক্য গঠনের সে নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা না করে এখানে শরীয়তপুরের আঞ্চলিক ভাষার বাক্য ও বাংলা ভাষার আদর্শ বাক্যের কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরছি। এতে বাক্যের গঠন প্রকৃতি ও সৌকর্যসহ এখানকার আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করা যাবে। উদ্ভৃত বাক্যগুলো নির্বাচনে কোনো নীতি অনুসরণ করা হয়নি। এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বাক্য অনুসরণ করা হয়েছে।

শরীয়তপুরের আঞ্চলিক ভাষার বাক্য	বাংলা ভাষার আদর্শ বাক্য
আউ! আউ! কী মিত্যা কতা!	ছিঃ! ছিঃ! কী মিথ্যে কথা!
অগো লগে কী কতা কছু?	ওদের সঙ্গে কী কথা বলছিস?
অর কতা হইন্যা মুই অটাশ অইয়া গেছি!	ওর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি!
আইন্না বাত খাইতারি না।	লবণ ছাড়া ভাত খেতে পারি না।
হুৰ, আইতনায় কুণ্ডা ভোকছে।	ফুফু, বারান্দায় কুকুর চুকেছে।
আৱা'র মইদেয়ে হিং মাছ রাহিছু।	মেটে হাঁড়ির মধ্যে শিং মাছ রাখিস।
আবাইত্যাভায় ব্যাক দুধ খাইয়া হালাইছে!	পেটুকটায় সবটুকু দুধ খেয়ে ফেলেছে।
আবাতি ক্যালা জাক দিলে হৃত দিয়া থাকে।	অপরিণত কলা জাক দিলে শুকিয়ে যায়।
ইংকার করা বালো না।	অহংকার করা ভালো নয়।
উত্তর ইশ্যায় কুড়ি দুদু থাকে।	উত্তর ঘরে ছেট কাকা থাকেন।
ইহিরে কী কয়!	ছিঃ ছিঃ কী বলে!
উআশ ছারার সময় নাই এতো কাম!	নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় নেই এতো কাজ!
উগৈরে বিছৰাইয়া দ্যাক জ্যার আছে।	মাচায় খুঁজে দেখ টিনের পাত্র আছে।
অলঙ্কী ছেমৰার কতা হোনলে উটকি আছে।	অলঙ্কী ছেলেটার কথা শুনলে বমি আসে।
উস্মী কত কইর্যা কেনছাও?	শিম কত করে কিনেছ?
এইভারি পৰা রাইল।	এ পর্যন্ত পড়া রল।
এউক্কা গৈয়া দিবি বাই!	একটা পেয়ারা দেবে ভাই!
ঝ্যালা মুই যাই গা।	এখন আমি চলে যাই।
ঐহানে ওশের মইদেয়ে খারাইছু না	ঐখানে শিশিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকিস না।
আমে ঐলদা রং দরছে।	আমে হলুদ রং ধরেছে।
ওড়ু তেলে রানতে পারমু না।	অতটুকু তেলে রাঁধতে পারব না।
ওদা দান বানা ঠিক অইব না!	কম শুকনা ধান ভান ঠিক হবে না।
মিডাইর হইদেয়ে ওল্যা বোজাই!	ওড়ের মধ্যে বড়ো কালো পিপড়া ভরা!
হ্বা, ওগ্যা আফনের কি অয়?	ফুফা, উনি আপনার কি হন?
ক' কোনহানে কলম আরাইছোত?	বল, কোথায় কলম হারিয়েছিস?
পেরতেক রাইতে কড়ায় নাইকল কাড়ে।	প্রতি রাতেই গেছে ইদুর নারকেল কাটে।

হে কুড়ে গ্যাছে?	সে কোথায় গেছে?
ক্যাওর দইয়া খারাইলা ক্যা, বিতৰ আহো!	দৰজা ধৰে দাঁড়িয়েছ কেন, ভিতৰে এসো।
কুইন্যা ডৱে টিকেৰ দিছে।	শিশুটি ভয়ে চিংকার কৰছে।
তকোম খাইয়া গ্যাছে হিন্দা লই।	জুঙি খুলে গিয়েছে পৱে নিই।
আমি কোমৰ খ্ৰখৰাইছি, আপনে কি ৱানছেন?	আমি কুমড়া ভাজি কৱেছি, আপনি কি ৱেঁধেছেন?
খাইছৱে, ঐ বাইন্তে আগুন লাগজে!	সৰ্বনাশ, ঐ বাড়িতে আগুন লেগেছে!
খ্যাকাইল দিলে থাবোৰ খাবি!	চিংকার কৱলে থাপ্পৰ খাবি!
গদৈৰ মইদ্যে হাপ ডোকছে!	গৰ্তেৰ ভিতৰ সাপ চুকেছে!
পৱেৱে আতেৰ মাকা কিছু খাইতে গিন কৱে!	অন্যেৰ হাতেৰ মাখা কিছু খেতে ঘৃণা লাগে!
পোলাডা গু-মুত মাইক্যা গতৰ তলাইছে!	ছেলেটি পায়খানা প্ৰস্তাৱ মেখে শৱীৰ নোংৱা কৱেছে!
চঙ্গ বাইয়া নাইম্যা আয়।	মই বেয়ে নেমে এসো।
চাঙ্গা বাঙ্গতে অইব মুগৈৰ লইয়া চকে যা।	চিলা ভাঙ্গতে হবে মুগুৰ নিয়ে ক্ষেতে যাও।
উই চাসোৱডায় চিমৰি দিছে।	ঐ দৃষ্টটায় চিমটি দিয়েছে।
চিকেৰ হইন্যা পৱান স্যাত কইয়া ওটছে!	চিংকার শুনে পাণ আঁতকে উঠেছে।
এই ছেমৰি, ওহোনে বয়!	এই মেঘে ওখানে বসো!
ছাইছে ব্যাবাকতে কিয়াৱো?	ঘৱেৱে পেছনে সবাই কি কৱেছো?
ছিবৈতে ছারা পান খাইতাৰমু না?	চুন ছাড়া পান খেতে পাৰবো না।
জিগাইয়া দ্যাহেন হে যাইব নি?	জিজেস কৱলন, তিনি যাবেন কিনা?
জ্যাবেৰ মইদ্যে উৱম লইছু না!	পকেটে শুড়ি নিস না!
দুয়োৱে ঝাপ দিছাও?	দৰজায় দৱোজা (আচাদন) লাগিয়েছে?
তোৱে ঘোলায় দৱকক!	তোৱে কলেৱায় আক্ৰমণ কৰক!
আম পাইক্যা টকটক্যা রাঙ্গা আইছে।	আম পেকে টুকটুকে লাল হয়েছে।
হে টাপ্পিতে গ্যাছে।	তিনি পায়খানায় গিয়েছেন।
বাও ঠ্যাংগেৰ ওৱমুইয়া টাডায়!	বাঁ পায়েৱ গোড়ালি ব্যথা কৱে!
টালিবালি খুইয়া আসল কতা ক।	টালিবাহানা বাদ দিয়ে আসল কথা বল?
ট্যালার লাহান খারাইয়া খাকিছ না।	বেথেয়ালেৰ মতো দাঁড়িয়ে থেকো না।
ঠডিবডি খাইয়া বাইচ্যা আছে।	অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বেঁচে আছে।
উডান ঠন্ঠইন্যা হুগনা।	উঠান যতেষ্ট শুকনা।
ছেমৰি এ্যাকালে টুইড্যা।	মেয়েটি একেবাৰে মুখৰা।
বাহুজেৰ শাৱিভাতো বৱো ডকেৰ!	ভাৱীৰ শাড়িটাতো খুব সুন্দৰ।
ডাংগৰ কাড়োল্ডা কাইল পাকপো	বড় কাঁঠালটি কোল পাকবে।
প্যাকনা কৱাই না, তৱতৱি খাইয়া হালা?	ন্যাকামি কৱিস নে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল?
বৱই হবায় ডাকৱা আইছে!	বড়ই সবে আধপাকা হয়েছে!
মা, ড্যাপেৰ মোয়া খাইতে মোঢ়ায়?	মা, ঢ্যাপেৰ মোয়া খেতে ইচ্ছে কৱে।

ডক্বরান্দ দেইক্যা তো খাডে না ।	সাজসজ্জা দেখে তো পছন্দ হয় না ।
ডাহিতে হউর্যা থুইয়া পাইলাভা খাইল্যা কর!	ঢাকিতে সরিয়া রেখে পাতিলটা খালি কর ।
মুরাই হরমাইলের পোজা লইয়া হাঙ্গোর তোন পেইর্যা গ্যাছে!	মুরাই পাটখাড়ির বোঝা নিয়ে সাঁকো থেকে পড়ে গেছে!
হাউজজালা গ্যাছে, অহনতির আইলো না!	সন্ধ্যায় গেছে এখনো এলো না ।
হাঁগা করতে মানা করে কেড়া!	দ্বিতীয় বিয়ে করতে নিষেধ করে কে!
ফ্যাত কইর্যা হিংগৈল হালা ।	নাক বেড়ে শ্লেষ্মা পরিষ্কার কর ।
হৃদা বাত সবজি মরিচ দিয়া খাওন যায় ।	খলি ভাত পিয়াজ মরিচ দিয়ে খাওয়া যায় ।
হে আইজ্যো আইবো ।	তিনি আজ আসবেন ।
ওমিহি যাইছ না, কতা হোন হবিবে আয় ।	ঐদিকে যাসনে, কথা শোন্ তাড়াতাড়ি আয় ।
মুই কি হ্যার লগে যাইতারতাম না?	আমি কি তার সঙ্গে যেতে পারতাম না?
ছোডেরস হ্যাগো তোন খাড়ো কিয়ে?	ছোট জা তাদের চেয়ে কম কোথায়?
তোর বাহে কি টাহা দিতারবো না?	তোমার বাবা কি টাকা দিতে পারবে না?
ছেৰ্ডবি, দেইক্যা যাও কী সোল্পৰ রাওয়া!	ছোট ননদ, দেখে যাও কী সুন্দর মোরগ!
অপ্ফুলাইয়া থকিছ না, হক্কালে ল’ ।	অভিযান করে থকিস্ন নে, তাড়াতাড়ি চল্ল ।
অপ্পৰান্তি গাইল্যাইতেছে হেইয়া হোনো না?	অনবরত গালিগালাজ করছে তা শোন না?
এফির আগে মোরে দেও হ্যাশে তুমি নেও!	এইবার প্রথমে আমাকে দাও তারপর তুমি নাও!

### ভাষারীতি পরিবর্তনে শরীয়তপুরের আঞ্চলিকতা

সাধুরীতি	চলিতরীতি	আঞ্চলিক ভাষারীতি
ওহে বহিন! কথা শুনিয়া যান।	হে বোন! কথা শুনে যান	অ্যাহান বু! কতা হইন্যা যান।
তুমি ইক্ষুটি খাইয়াছ?	তুমি আখটি খেয়েছ?	তুই আউক্টা খাইছোত?
তিনি কাজটি করিয়া আসিয়াছেন।	তিনি কাজটি করে এসেছেন	হে কামডা কইর্যা আইছে।
আমি হাটে যাইব	আমি হাটে যাব	মুই আডে যাইমু।
তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?	তুমি কোথা থেকে এসেছ?	তুই কইত্তোন আইছোত?
উহাকে আমার নিকট লইয়া আইসো।	ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো।	অরে আমার দারে লইয়ায়।
কী উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে গমন করিয়াছ?	কি জন্য ঐ ঘরে গিয়েছ?	কিয়ের লেইগ্যা ঐ কোণায় গ্যাছোত?
আগামী কল্য কোন্ সময় আসিবেন	কাল কখন আসবেন?	কাইল কুনসুম আইবেন?
হস্তপদে গাঢ় ময়লা জমিয়াছে!	হাতেপায়ে গভীর ময়লা জমেছে!	আতপায় কোহোরি পরছে!

ঐ স্থানে গমন পূর্বক দর্শন কৰ	ওখানে গিয়ে দেখ ।	ওহোনে (ওট্টে) যাইয়া দ্যাক্
তোমার পিতা বাড়ি আছেন?	তোমার বাবা বাড়ি আছেন?	তোর বাহে বাইস্টে?
ডঁটা দিয়া মাঞ্চর রাঁধিবেন ।	ডঁটা দিয়ে মাঞ্চর রান্না করবেন ।	লইড্যা দিয়া মজগুর রানবেন ।
তাহার স্তৰী আসিতে পারিবেন না ।	তার বউ আসতে পারবে না ।	হ্যার জননায় আইতারবো না ।
পাটাপুতা ঘরে লইয়া আইসো ।	পাটাপুতা ঘরে নিয়ে এসো ।	হাড়াহৃতা গরত লইয়া আয় ।
আমার মা গত পরশু ঢাকা হইতে আসিয়াছেন ।	আমার মা পরশু ঢাকা থেকে এসেছেন ।	আমার মা পরঞ্চা ঢাহার তোন আইছে ।
অদ্য দিতে পারিব না ।	আজ দিতে পারব না ।	আইজ্যো দিতারমু না ।
অহংকারের দর্পে চক্ষে দেখে না ।	অহংকারের ভাবে চোখে দেখে না ।	গুমানের চোড়ে চোকে দ্যাহে না ।
আমাদিগের ললাটে কি লেখাপড়া নাই?	আমাদের ভাগ্যে কি লেখাপড়া নেই?	মোগো কফালে কি লেহাপরা নাই?
হায় সর্বনাশ, কতো বড় সর্প!	হায় সর্বনাশ কতো বড় সাপ!	খাইছেরে কতো বরো হাপ!
তাহার শুণরের নিকট জিজ্ঞাসা কর	তার শুণরের কাছে জিজ্ঞেস কর	হ্যার হউরের তোন জিগাও
তোমাকে তাহারা ভৃত্যও রাখে না!	তোমাকে তারা চাকরও রাখে না!	তোমারে হ্যারা মাইনদারও রাহে না!
বড় ভাসুর পত্নী আড়ালে দণ্ডায়মান ছিলেন ।	বড় জা আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন ।	বড়োরস আঠিলে খারাইয়া আছিল ।

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বাহন । আমাদের মাত্তভাষা বাংলাতে রয়েছে শব্দের সমৃদ্ধ ভাস্তব । এ ভাস্তবের অগণিত মান শব্দ পরিবর্তিত হয়ে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে । পরিবর্তিত এসব শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য ভাষাকে বিচ্ছিন্ন মণিত করেছে, সম্পদশালী করেছে । শরীয়তপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষার জুপটি সুললিত ও মাধুর্যমণিত । এখানে কতিপয় আঞ্চলিক শব্দ ও তার মান শব্দ উন্নত হল-

আঞ্চলিক শব্দ	মান শব্দ	আঞ্চলিক শব্দ	মান শব্দ
অইলো	(১) হলো, (২) আচ্ছা	কেতুর	লাইন বা সারি, দল
অইবো	হবে	কোন্দাইয়া	একেবারে পূর্ণ করে

অয়	হয়	খরচি	কাঠি
অটোশ	অবাক	খাইছেরে	হায় সর্বনাশ
অডেনডে	যেখানে সেখানে	খামাহা	অকারণে
অহন	এখন	খুয়া	কুয়াশা
আইজইর্য	অকাজে	গদা	বড় লাঠি
আংগো	আমাদের	গাঙু	নদী
আইজেয়া	আজ	গাইদর	নোংরা
আগান	খারাপ নজর	গাত্তি	পুটলি
আছিল	ছিল	গুমান	অহংকার
আবাইত্যা	পেটুক, সর্বভুক	ঘ্যাচর	অবাধ্য
ইংকার	হিংসা	চাড়ি	বাঁশের ফালি
ইসাপ	হিসাব	চ্যাংরামি	ফাজলামি
উকাশ	অবসর	চিমা দেওয়া	চিকন হওয়া
উদ্দিশ	টের, অনুভূতি	চাইতে	দেখতে
উমাইন্যা	পরাশ্রয়ী	চৈক্যা যাওয়া	কিঞ্চিত ফাটল ধরা
এহেনে	এখানে	ছোড়বি	ছোট ননদ
এ্যাংলা	রোগা	ছই	সীম (কলাই বা মটরের)
এ্যাকচের	একদম	ছোড়রস	ছোট জা
এ্যারা	অকর্মণ্য	জননা	স্ত্রী
ঐমিহি	ঐদিকে	জরিপ্যানা	জরিমানা
ওট্টে	ঐখানে	জাল	জা
ওষ্টেত	ওষ্টধ	জিংগাই	জিজ্ঞেস করি
ওগ্যা	উনি, তিনি	জিনাই	বিনুক
কউর্যা	ভর্তা	জিয়া	ফুফু
কাইছা	শলার ঝাড়ু	ঝাপ	আচ্ছাদন (দরজা)
কুদি	তেজ, সাহস	টৎ	উচু মাচান
কুয়ারা	আমোদ	টনক	শক্ত
ঠাড়া	বজ্জপাত	টইন্যা	কষিণি
ঠাওর	উপলক্ষি	টোহা	ছোট হাঁড়ি
ঠিল্যা	কলস	পাহি	মোটা দড়ি (গরু-মহিষ বাধার)
ঠোয়া	ফোক্ষা	পিছা	ঝাটা
ডকের	বাহারি	পুইড়া	পেরেক
ডাইয়া	বড়পিপড়া (লাল রঙের)	পৈরান	বাটখারা

ডুমা	রূমাল	পোজা	বোঝা
চ্যামনা	শয়তান	ফইরুকায়	বিদ্যুৎ চমকায়
তহিত	খেয়াল	ফড়োফড়ো	তাড়াহুড়া
তকোম	লুপ্তি	ফিরি	পিঁড়ি
তমো	তবু	ফুডানি করা	বড়ো বড়ো কথা বলা
তুরতুর	তিড়িবিড়ি	ফেউয়া	পাটের আঁশ
ত্যারা	একগুয়ে	ফোকা	ছিদ্র
তৈজ্যা	কষ্ট	ফোপৱা	নারকেল/তালেরশাস
থকথইক্যা	গাঢ়	বলকে	নৌকায়
থুরথুরি	ফুঁক	বককিল	কৃপণ
দহিন	দক্ষিণ	বাইগ্না	ভাগ্নে
দগ্দাইগ্যা	দগদগে	বাইচ্লামি	ফাজলামি
দপ্পোরাইয়া	ধপশদ্দে	বাডুল	বেটে
দামান	বর (ননদের স্বামী)	বৈতাল	ছিনাল
দাবরি	ধমক	ব্যাক	সব
দুগ্যা	অল্প	ব্যাবাইজ্যা	বেদে
দোরমাইল	টাকার থলি	ভাতার	স্বামী
ধরনি	দাই	মোগরামি	একগুয়েমি, জেদ
ধলা	সাদা	মাগ্না	বিনামূল্যে
ধানাইপানাই	ছলচাতুরি	মাতারি	বয়ঙ্কা মহিলা
নটখৈড্যা	অশাস্ত্র	মুইর্যা	ক্ষয়প্রাপ্ত
নশা	বর	মশকারি	ঠাট্টা
নাগা	বঙ্ক	মাইন্দার	চাকর
নাদান	নির্বোধ	যুয়ান	যুবক
নাম্ভত	কষ্ট	যেহান	প্রতিভা
নিত্তি	প্রতিদিন	যোমইক্কা	যমজ
নুমাল	রূমাল	যোবা	সুবিধা, মজা
নেন্হ্যত	নসিহত	ঝঁগেত্যা	রোগা
নকুস্যুল	নপংসুক	রুড়া	রহচ্ছ
পাইলা	পাতিল	লাউক	নাগাল
হোমনদি	স্ত্রীর বড় ভাই	লাগারি	সর্বদা
হিরি	পিঁড়ি	লাঞ্চুর	নাগাল
আইন্যা	(১) আনিয়া (২) লবণ ছাড়া	লুরমা	খাওয়ার জন্য নির্ণজ্জ লোভী
আইয়া	এসে	লুন্দি	ভুড়ি
আউ	ছিঃ	লেংডা	উলঙ্গ

আহি	আসি	ল্যাডা	ঝামেলা, ডেজাল
উইড্যা	উর্চ্ছা	লেতুর	ময়লা
এইয়া	এটা	লৈড্যা	ডঁটা
ওশ্শী-পশ্শী	প্রতিবেশী	লোদ	কাদা
কইছ	বলিস	লোরা	কুড়ানো
কইয়া	বলে, বলিয়া	শরা	বিয়ে
কুর্রাল/কুরাল	ঈগল জাতীয় মাছ খেকো পাখি	সরদো	শেষ
চইয়া	চাষকরে	সিন দরজা	প্রধান গেট
ছস্পিল	তাড়াতাড়ি, জরুরী ভিত্তিতে	স্যাবলা	মিথ্যাবাদী
ছ্যালাইগ্যা করা	আমলে নেওয়া, গুরুত্ব দেওয়া	সোরতা	সুপারি কাটার যন্ত্র
জিগানো	জিজাসা করা	হুদা	কেবল, খালি
জিগাও	জিজাসা কর	হিদলা	শেওলা
তোগো	তোদের	হারে	সাড়ে, সার্ধ (যেমন ৩.৫০) সাড়েতিন
তোন্	থেকে, চেয়ে, কাছে	হিগানো	শিক্ষা দেওয়া
থুইমু	থোব, রাখব	হেগে	শিক্ষা করে
দেইক্যা	দেখে	হেলে	তাহলে
ফাইড্যা	ফাটিয়া, ফেটে	হ্যাগো	তাদের
বাইয়া	বসে	কানডামি	একগুয়েমি
বাগরা	লোভ, অধিক পাবার আশা	নাডা	দুষ্ট, খল
রাইক্যা	রেখে	নাইকানি	অনাবশ্যক কথাবলা বা কাজ করা
লগে/নগে	সঙ্গে, সাথে	বাগী	দুধ/তরকারী রান্না করার ইঠিং
সোন্দর	সুন্দর	রারী	বিধবা

বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ সকল স্তরের পাঠক-পাঠিকার জন্য ছড়া, কবিতা, গান  
প্রভৃতির প্রত্যেকটিই সাহিত্য পাঠের এক অন্যতম উপকরণ। ছড়া-কবিতা এবং গানের  
কথা ও সুর-মূর্ছনা আমাদের স্বদেশ প্রেমে উন্মুক্ত করে। সৃজনশীলতায় উৎসাহিত করে।  
জীবনকে ভালোবাসতে অনুপ্রাণনা প্রদান করে। কখনো হাসি-আনন্দ ঘোগায়। কখনো  
বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখায়। কিংবা কখনো শোকগ্রস্ত করে। আবার  
কখনো বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত করে। কখনো  
শিশুদের ঘুম পাড়ায়। ছড়া, কবিতা, গান প্রকৃতই আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অম্বুল্য

সম্পদ। শরীয়তপুরের আঘলিক ভাষার ছড়া, কবিতা ও গান (মেয়েলি গীত) অতি চমৎকার। এগুলো বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এখানকার আঘলিক ভাষার বিপুল সংখ্যক ছড়া ও মেয়েলি গান সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে। এখানে শরীয়তপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার আঘলিক ভাষায় রচিত কয়েকটি ছড়া-কবিতা ও মেয়েলি গান উদ্ধৃত হলো:

১

আয় চান লইৱৱা  
নাইকল গাছে পইৱৱা  
বাত দিমু বাইৱৱা ।  
মনায় বোলায়  
তরতরি আয়,  
গুমা গলা দইৱৱা! টুকুকুকুত!

(সংগ্রহ: মফিজুল ইসলাম)

২

### ছুট খবৰ

হা গো বুয়া কুড়ে যাও পাহাল গরো বইয়া যাও,  
অহোন তক রান্দি নাই, বহো দুইটা খই খাও !  
গাওত পিৱান পাওত জোতা বগল তলে পুটলি,  
হিৱিত বও খবৰ কও জিংগাই কুড়ে ছুটলি ?  
গাঙ্গো খাইছে দুলারচৰ হেঞ্চে চাইতে যাবিনি,  
হেইহানো যাই জিয়াগো বাইত, বুয়া লগে আবিনি !  
হুনছি উট্টে ক্ষেত ভাঙছে বড়ো গাঙ্গের জোয়ানি  
লৌৰ ফাইয়া চাইয়া যাইও ছুট খবৰ হাচানি !

(রচনা: সাজেদা আক্তার সাজু)

৩

### আমাৰ সোনা লক্কী গো

গ্যাদারে গ্যাদা কান্দোছ ক্যা?  
হোয়াইয়া পুইয়া রান্দোছ ক্যা?  
আড়া না রান্লে খাবি কি?  
মুই মল্লে আৱ পাবি কি?  
আমাৰ সোনা লক্কী গো,  
খেলাও দৈয়ল পক্কী গো !  
আন্দৌৰ পাৱেৱ ডাউগেৱ ছাও

ক্যাত্ক্যাতাইয়া আদার খাও !

হবুর পোলায় দিছে লর

মনায় খাইবো দুদের হর !

(রচনা: মফিজুল ইসলাম)

৮

## চরের মাইনবের কাইজ্জা

পদ্মা গান্দের দহিন পারে মন্ত্র বালির চর  
 হেই চরে বসতি আছে আজার হানি গর  
 কান্দি বরা বাঙ্গাচুরা ছনের বনের বারি  
 বেকের বাইস্টে আছে হৃদা কেলাগাছের সারি ।  
 তুহান আইলে গর গাছালি বাইসা চুইর্যা ছোড়ে  
 বাইয্যা গেলে কমফা কদু ফনফনাইয়া ওড়ে  
 চৈত মাসের দুফার অক্ষে আগুন বরা বেইল  
 আউল্যা চাখির মাতার উপুর আজরাইলের খেইল  
 কখনও বা পাক বাতাসে বানাডুলি ওরে  
 হেইয়ার মইদ্যে শয়তান আইয়া চরকির মতন গোরে  
 আগুন ছেকা গুন্ধি বাতাস ফরফরাইয়া আসে  
 দোয়া ইনুছ পইয়া আউল্যা মনরে লাগায় চামে ।  
 তবু হেরো সুকেই থাকে পাইয়া আউসের দান  
 খন্দ পাইয়া শুরু করে আমির সাদুর গান ।  
 একবার এক আউশের খন্দে দান কাড়োন লইয়া  
 মুসী এবং ডালীগো লগে জগরা গেল অইয়া  
 কেরমে কেরমে দুই দলে লাইগ্যা গেল কাইজ্জা  
 চকের আইলে সবাই আইলো ডাল-কাতরায় হাইজ্জা  
 মনাই মুসী বিশাই ডালীর লাইগ্যা গেল চারি  
 আইজ্জো মোরা যাইয়া মাইরে বাচি কিংবা মরি  
 কোবা-কোবি রঙা-রঙি অইলো বিষম তর  
 এমুন সমায় ওডলো আওয়াজ দর হালারে দর ।

মুসী মিয়া হকুম দিল মনাইরে ঠাইস্যা দর  
 হকুম হইন্যা মনাই ডালী কাপে থরথর  
 কাঁপতে কাঁপতে পইয়া গেল বাঙ্গনের বিতর  
 বাতাস আইয়া উন্ডাইয়া দিল হিন্দনের কাপুর  
 হেইয়া দেইক্যা জুয়ান-বুরা আসলো বীষণ-খুব  
 দারোগা পুলিশ আইলো মতন গেরাম অইলো চুপ ।

(রচনা: মির্জা হজরত সাইজী)

৫

## পাইছিলো কোন্ পাপে

কাইল্লার মা'র খাইল্লা জা'গা  
 পইর্য থাকে জঙ্গলে  
 পোলাহান লইয়া বসত করব  
 গর উডায় তাই মঙ্গলে ।  
 মঙ্গলের বউ বিয়াইল্লাসুম  
 পিছা লইয়া আতে  
 পুরা উডান হইর্যা আহে  
 হগলে বিছ্নাতে ।  
 কাইল্লার মায় উইড্ডা দ্যাহে  
 উডান গাড়া ফস্সা,  
 বালো মানুষ জা'গা দিছি  
 পাইতাছি তো বস্সা !  
 দ্যাকনা দ্যাক আতের কায়  
 কাইর্যা করে বউডায়  
 নিজের গরের মাইন্মের লাহান  
 দইর্যা ও কইর্যা খায় !  
 আচুককা তো কাইল্লায় ডাইক্যা  
 হ্যার মায়রে কয়,  
 'অতো পিরীত বালো না মা  
 হ্যাশে কানতে অয়' !  
 তলে তলে মঙ্গলে তো  
 মালিক অইতে চায়  
 ফাও খাওনের লেইগ্যা হে  
 জাল কাগজ বানায় ।  
 অহোন হায় কাইল্লার মায়  
 গাইল্লায় আৱ শাপে  
 পোলাডারে কয়, 'আহা!  
 পাইছিলো কোন্ পাপে ।

(রচনা: শ্যামসুন্দর দেবনাথ)

৬

## হরিণা ঘাটে ওৱা কঁজন

পাৰি, হাজেৱা, আলামিন, তয়মন  
 হরিণা ঘাটে ওৱা ঘুৱছিল কঁজন ।

কী ফড় কী হর জানতাম ছাইলে  
 পাখি কয়, টু-তের আনন্দ ইশকুলে ।  
 শরীয়তপুর সীমান্ত ইব্রাহিম ফুরে  
 এইহানে ফড়ার ইশকুল ১০ মাইল দূরে ।  
 অন্যরা কয়, দুফুরে ঘাস নিতাম আইছি  
 ছাঁতফুরের গাঙ্গুতে ডুবাইয়া নাইছি ।  
 আংগো গোরুত এই ঘাস বাঢ়িত নিয়া খাওয়াইতাম  
 আমরার টেহা অইলে ইশকুলেত ফইড়তাম ।  
 হাজেরা কয়, বাবা গাঙ্গুত বলকে থাহে  
 মাছ বেইছা টেহা লইয়া কয়দিন ফর আহে ।  
 বাবা গ্যাছে মাছ ধইরতাম নৌকাত গাঙ্গু  
 নৌকা জাল-জমি-জোত নাই কিছু আংশ  
 আজানোক্ত মোর বাবা জাল বাইত গাঙ্গু যায়  
 মাছ দরে ব্যাছে আডে, হ্যানেই রান্দে থায় ।  
 কাশেম নজরুল রফিক শহিদ ছন্দর গাজী গং  
 মাছ ধইরবার নদী ফাড়ে ফাতে ছোড় ঘর-টং ।  
 দাদনের টেহা লইয়া হারা রাইত দরে মাছ  
 ফাড়ে আনলে মহাজন লয় কয়ডা বাছ বাছ ।  
 গাঙ্গু ভেঙ্গে বড় বানে ঘর বাড়ী নষ্ট  
 মাছ দরা নাগা গ্যালে বাঁইছা থাহা কষ্ট ।  
 সামবাদিগ বাইরা মোগো কতা লেইক্কেন  
 ফেফার ফইড়া সরকার সাব আংগো দেইক্কেন ।

(রচনা: খান মেহেদী মিজান)

## ৭

### অভাবীর প্রশ়াপ

হারাদিন কাম কাইজ কইরা যা পাই  
 হেতেতো কিছুই অয় না ।  
 মাইয়্যাডা এইবার বিয়ার লাইক  
 পোলা ঝুঁজ্যা পাইনা ।  
 সামনে কদর হেরপর স্বদ  
 কাম কাইজ নাই যাইয়ু কোন দিক ।  
 উত্তর দিক চাইলে দহিন দিক দেহি  
 পোড়া কপাল আমার মরলেই বাচি ।

(রচনা: গেরিলা আজাদ)

৮

## চাচা ও ভাতিজা

হেই পুরৈরের জানে তো মুই পাত্ছি এ্যাট্টা বইচনা,  
 দেইক্যা থাকলে চুপ কইর্যা র' কেঁকের তোনে কইছ না,  
 পাও হালাইয়া তরতরি যা এক জা'গাতে রইছ না,  
 হিগদার বাবির রঙ্গির লাহান তুইও টুইড্যা অইছ না,  
 নিজের বুদ্ধি গোপাল জানিছ পরের বুদ্ধি লইছ না,  
 ব্যাবাক মাইন্মের হগল কামে আউগ্যাইয়া আল্ চইছ না !  
 হেইদিন কারে আবাল কইছোত্ তুইও কোলোম যইষ না,  
 আবোর বাপু হগলহানে মেউন্নার মতোন সইছ না !

(রচনা: মফিজুল ইসলাম)

৯

## মেরেলি গীত

এমতে-ওমতে যাওরে বিয়াই ছাবরে !  
 আমার এ্যাট্টা কতা ওকি উঁহুঁ, আমার এ্যাট্টা কতা নারে !  
 আমার লেইগ্যা আনবা বিয়াই ছাবরে-  
 জারা পানের গাদি ওকি উঁহুঁ, জারা পানের গাদি নারে !  
 হেইয়া যদি না আনো বিয়াই ছাবরে-  
 খাইবা পুতার গুতা ওকি উঁহুঁ, খাইবা পুতার গুতা নারে !  
 পুতার গুতা খাইলে বিয়াই ছাবরে-  
 গালে অইবো টাউয়া ওকি উঁহুঁ, গালে অইবো টাউয়া নারে,  
 হেইয়ার ওয়েত আছে বিয়াই ছাবরে-  
 গউর্যা ব্যাসের মাতা ওকি উঁহুঁ, গউর্যা ব্যাসের মাতা নারে !

এমতে-ওমতে যাওরে বিয়াই ছাবরে!  
 আমার এ্যাট্টা কতা ওকি উঁহুঁ, আমার এ্যাট্টা কতা নারে !  
 আমার লেইগ্যা আনবা বিয়াই ছাবরে-  
 মগাই খরের দলা ওকি উঁহুঁ, মগাই খরের দলা নারে !  
 হেইয়া যদি না আনো বিয়াই ছাবরে-  
 খাইবা ডালার বাবি ওকি উঁহুঁ, খাইবা ডালার বাবি নারে !  
 ডালার বাবি খাইলে বিয়াই ছাবরে-  
 মাজায় অইবো ব্যাতা ওকি উঁহুঁ, মাজায় অইবো ব্যাতা নারে,  
 হেইয়ার ওয়েত আছে বিয়াই ছাবরে-  
 কালা দুত্তরার পাতা ওকি উঁহুঁ, কালা দুত্তরার পাতা নারে !

এমতে-ওমতে যাওরে বিয়াই ছাবরে-

আমার এ্যাট্টা কতা ওকি উহুহুঁ, আমার এ্যাট্টা কতা নারে !

আমার লেইগ্যা আনবা বিয়াই ছাবরে-

জারা হাদার পাতা ওকি উহুহুঁ, জারা হাদার পাতা নারে !

হেইয়া যদি না আনো বিয়াই ছাবরে-

খাইবা কেনুর গুতা ওকি উহুহুঁ, খাইবা কেনুর গুতা নারে !

কেনুর গুতা খাইলে বিয়াই ছাবরে-

পিডে অইবো গুঁজা ওকি উহুহুঁ, পিডে অইবো গুঁজা নারে !

হেইয়ার ওমেত আছে বিয়াই ছাবরে-

চিনা জোকের মাতা ওকি উহুহুঁ, চিনা জোকের মাতা নারে !

(সংগ্রহ: মফিজুল ইসলাম)

শিক্ষা আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে উন্নয়নের গতি সম্ভব করছে। শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে আমাদের যেমন অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন তেমনি সকলের এ-ও খেয়াল রাখা দরকার, শিক্ষার উন্নয়নের ফলে আমাদের আঞ্চলিক ভাষা যেন ঠাঁই হারিয়ে না ফেলে। আর তাই আঞ্চলিক ভাষার প্রতি সকলের যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে যথাসম্ভব আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের এ বিষয়ে আগ্রহী হওয়া।

[নিবন্ধটি প্রস্তুত করেছেন কবি মফিজুল ইমলাম ।]

## তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (১ম খণ্ড) এ প্রধান সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভূমিকা (২য় অংশ)।
২. এ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক শিকদার, সভাপতি, সমিলিত সাংস্কৃতিক জোট, শরীয়তপুর জেলা শাখা।
৩. মোঃ খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী অফিসার (উপ সচিব), জেলা পরিষদ, শরীয়তপুর।
৪. মাস্টার শ্যামসুন্দর দেবনাথ, সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, শরীয়তপুর।
৫. মো. মনোয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, শরীয়তপুর সরকারি কলেজ।
৬. মো. শওকত হোসেন বান, প্রধান শিক্ষক, মাহমুদপুর মডার্ণ হাইস্কুল, শরীয়তপুর।
৭. মো. সালাহ উদ্দিন, সিনিয়র শিক্ষক, কাঞ্জিয়ারচর ছমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, জাঞ্জিরা, শরীয়তপুর।
৮. হাচিনা আক্তার, নয়ান মাদরের কান্দি, নড়িয়া, শরীয়তপুর।
৯. সাজেদা আক্তার, সহকারী শিক্ষক, চরভাগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর।

